1948 - 1949
(Jan)

Φ·926

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

13272

পৌষ, ১৩৫৪ ঃঃ উনত্রিংশ বর্ষ ঃঃ জানুয়ারি, ১৯৪৮

সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত

সূচী	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
কলেজ-প্রসংগ	৭
প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ভারতের স্বাধীনতা	১৫
ভারতের মুক্তি-সাধনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অবদান	২৭
ইতিহাস	৩৬
উন্নতি-দর্শন ও ভবিষ্য-সমাজ	৪৫
আধুনিক বাংলা কবিতা	৫০
পদাবলী-প্রসংগ—গোষ্ঠ	৫৫
পাঁকের কমল	৬৩
ভুল	৭০
জীবন ও যৌবন	৭৩
সিন্ধুর প্রতি	৭৩
উজ্জীবন	৭৫
পুস্তক-সমালোচনা	৭৬
আমাদের কথা	৮২
আবেদন	৯২

FOR OUR NON-BENGALI READERS	1
ARE WE	2
INDIA AND THE MACHINE AGE	4
THE WAY TO THE GOOD SOCIETY	8
RECENT DEVELOPMENTS IN THE THEORY OF VALUE	13
IS THE UNIVERSE FINITE?	19
BURMA—INDIA'S LITTLE NEIGHBOUR	21
A STUDY OF THE NAGA HILLS	24
STRAY THOUGHTS ON RELIGION AND MANKIND	26
A GLIMPSE INTO STATISTICS	28
A LETTER FROM U. S. A.	32
KURUVILA ZACHARIAH	35
BOOK REVIEW	38
MISCELLANEOUS	44

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
Bought
3 AUG 1948
CALCUTTA.

চিত্র-সূচী

রবীন্দ্রনাথ, অদ্রি, বংকিমচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ, ছাত্রাবস্থায় চিত্তরঞ্জন, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীউল্লাসকর দত্ত, সন্তোষকুমার মিত্র, ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্র, ছাত্রাবস্থা অন্তে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ছাত্রাবস্থায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রীর কলেজ পরিদর্শন উপলক্ষে গৃহীত ছবি, কলেজ য়ুনিয়ন কাউন্সিল ১৯৪৬-৪৭—অফিস বেয়ারার্স, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম অভিমুখে আমাদের সমাজ-সেবা-দল

Mr. Kuruvila Zachariah
On their way to the market-place
Nature Study
Farewell to Dr. Srikumar Banerjee
Alma-mater 1894 Presidency College

বিজ্ঞাপন

প্রতি সংখ্যার জন্য চাঁদার হার :—

ভারতের মধ্যে (ডাকমাশুল সহ)	২॥০ টাকা
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের জন্য—	১॥০ „
ভারতের বাহিরে	৪ শিলিং

প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক বা কলেজ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে রচনা আহ্বান করা হচ্ছে সাদরে। সাধারণের কৌতূহলোদীপক হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী এবং এই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত পত্রাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। উপযুক্ত ডাক-টিকিট-যুক্ত শিরোনামা-লিখিত লেপাফা সংগে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

রচনা কাগজের একপিঠে লিখে 'এডিটরে'র নামে পাঠাতে হবে। রচনার সংগে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা পাঠাতে হবে।

পত্রিকা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে পাব্লিকেশন সেকশনের সেক্রেটারির সংগে পত্রালাপ চলবে।

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN

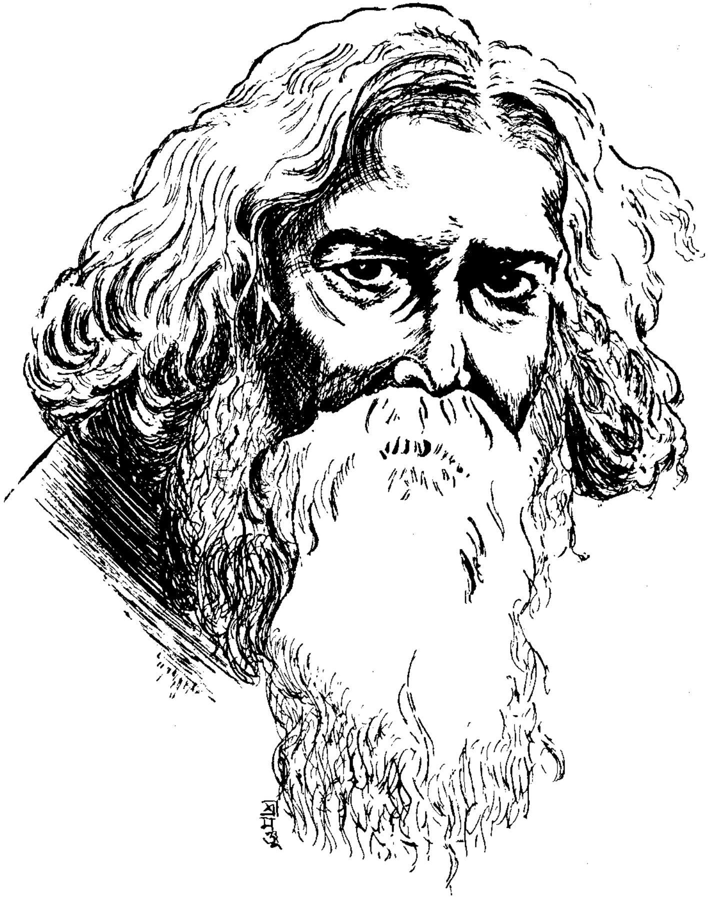

শিল্পী—মঞ্জুবিকাশ বসু
চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্

অস্তরবির আলো-শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
শ্রান্তিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ ভাদ্র
১৩৪৪

[১৯৩৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় প্রদত্ত বাণীর পুনর্মুদ্রণ

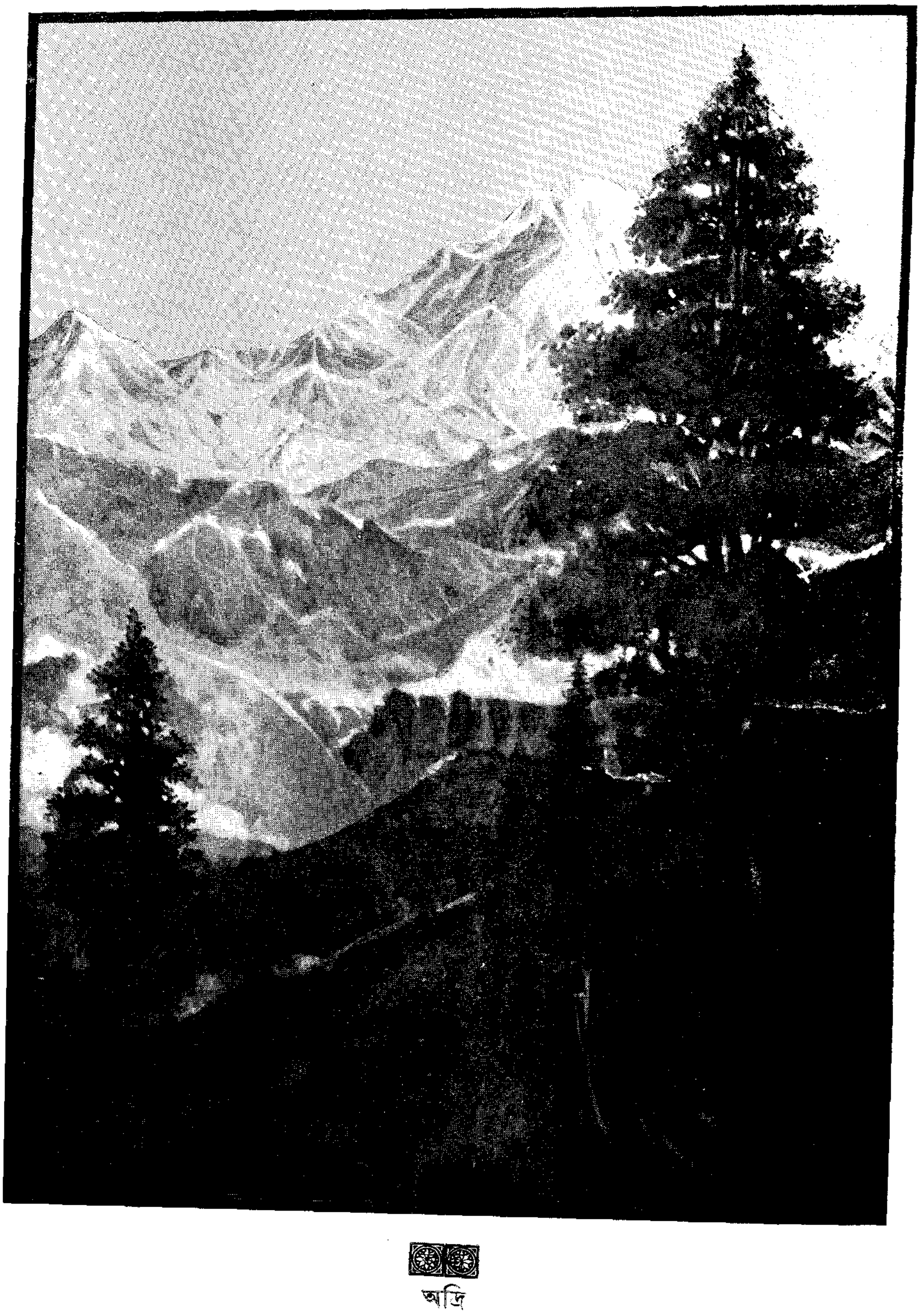

অদ্রি

শিল্পী—সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত
ষষ্ঠ বর্ষ, ইংরেজি

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

পৌষ, ১৩৫৪ ঃঃ ঊনত্রিংশ বর্ষ ঃঃ জানুয়ারি, ১৯৪৮

সম্পাদকীয়

শিক্ষা-ব্যবস্থা ও নতুন পরিবেশ

যে পরিবেশের প্রয়োজনে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল তার পরিবর্তনের সংগে সংগে আমাদের শিক্ষার রূপান্তর সাধন যে একান্ত দরকার এ কথা অনুভব করছেন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে ভ্রান্তি এবং ত্রুটীর মূর্ত প্রতীক—এ সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি আগে থেকেই। যখন স্বাধীনতার মণি-কোঠা থেকে আমাদের দূরত্ব ছিল অপরিমেয়, তখনও আমাদের দেশের অনেকেই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেই থেকে এ পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু সত্যিকারের কাজ হয়েছে সামান্য। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণানুসন্ধান করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, রাজনৈতিক পরাধীনতাই এই ব্যর্থতার প্রধান এবং সক্রিয় কারণ। সুতরাং আজ যখন সেই পংগুত্বের কারণ দূরীভূত হয়েছে তখন সেই কারণ-প্রসূত ব্যর্থতার বোঝা ভবিষ্যতের দ্বারে নিয়ে যাওয়া নিরর্থক। আজ দেশের প্রত্যেকটি দায়িত্ব দেশবাসীদের। এ নিয়ে বিদেশী শাসককে আর দোষারোপ করা যাবে না। তাই দেশের কল্যাণের পক্ষে সব আগে যে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং যার গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী সে হল আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা।

এখন প্রশ্ন এই, শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার কি ধরণের হওয়া উচিত—বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে যে শিক্ষার কাঠামো আমরা উত্তরাধিকারসত্বে পেয়েছি তাকেই সংস্কৃত করে নেওয়া, অথবা শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন? দু'এক কথায় এ প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়। একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো, বিদেশী শাসকশ্রেণী-প্রবর্তিত শিক্ষায় আধুনিক বিজ্ঞানের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটেছে এবং এরই মধ্যবর্তিতায় আমরা দুনিয়ার সংগে আমাদের সংযোগ রাখার সুযোগ পেয়েছি।

কিন্তু এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে বিদেশী শাসন আমাদের জন্যে শিক্ষার যে ছাঁচ গড়েছিল সে তার নিজের প্রয়োজনে। এ শিক্ষা মুষ্টিমেয় চাকুরীজীবীর গণ্ডী পেরিয়ে জাতীয় জীবনের সংগে ওতপ্রোত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নি ; শতাব্দী প্রাচীন এ শিক্ষার আলোক তাই পৌছতে পারেনি শতকরা দশজনের বেশী দেশবাসীর কাছে ; শিক্ষিত এবং সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে এ শিক্ষা গড়ে তুলেছে দুর্লংঘ প্রাচীর। প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষারীতি আমাদের জাতীয় জীবনের সংগে অংগাংগী সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল, যে রীতি ছিল লোকশিক্ষার বাহন—একদিকে তাকে যেমন আমরা হারিয়েছি, অন্যদিকে তেমনি অগ্রসর হয়েছে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় জীবনের সংগে যথাশক্তি ব্যবধান রক্ষা করে, অধুনাপূর্ব শাসকশ্রেণীর মত। অবশ্য যে উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তার সবটুকু সার্থক হয়েছে। সুতরাং আজ অবিলম্বে শিক্ষা-ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন হওয়া দরকার যাতে সে শিক্ষা জাতীয় জীবনে ঠিক পরগাছার মত গজিয়ে উঠবে না, পরন্তু জাতীয় শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সংহত করে অশিক্ষা-জর্জরিত দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে—যার আলোক জাতীয় জীবনের আনাচে-কানাচে প্রবেশ করে উদ্ভাসিত করে তুলবে সমগ্র দেশকে।

শিক্ষা-সমস্যা বিষয়ক সদ্য-প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সর্বাংগে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথা"। কিন্তু সর্বাংগে ব্যথা থাকলেও এ রোগের বিশল্যাকরণী আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে এবং তা করতে হবে অতি শীঘ্র। বর্তমান শিক্ষার দৌলতে বছরের পর বছর যে শক্তি ও উৎসাহের অপচয় হয়েছে, তার অবসান ঘটাতেই হবে। এ শিক্ষার দাক্ষিণ্যে যে নিরাশা, অনিশ্চয়তা ও ব্যর্থতা ছায়ার মত আমরণ আমাদের অনুসরণ করে তার মূলোৎপাটন যেমন করে হোক করতেই হবে। আর গড়ে তুলতে হবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সংগে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখে শিক্ষার নতুন আদর্শ। দরিদ্র এ দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসী যাতে নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তার দিকে নজর রেখে প্রবর্তন করতে হবে এই নতুন ব্যবস্থার। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সবটুকু দায়িত্ব নব-গঠিত রাষ্ট্রের। এই প্রচেষ্টা ফলবতী করতে হলে একান্ত প্রয়োজন অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও দূরদৃষ্টির। এক্ষেত্রে সমগ্র জাতির সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করতে হলে প্রচার-কার্যের কিছু প্রয়োজন আছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-ভীত অজ্ঞ দেশবাসীর সামনে এমন আশা-প্রোজ্জ্বল ছবি তুলে ধরতে হবে যাতে করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সকলেই সচেতন হয়ে ওঠে। শিক্ষা-ব্যবস্থা যাতে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী লোকের হাতে যন্ত্র মাত্র না হয়ে ওঠে সেদিকে সর্বাগ্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই আদর্শকে কার্যকরী করতে হলে বর্তমান প্রথার আমূল সংস্কার দরকার। এ ভার একান্তভাবে আমাদের রাষ্ট্রের। যে দুর্দিনের মধ্য দিয়ে আমরা এসে পৌছেছি স্বাধীনতার দ্বারে তার অবসান ঘটে নি সত্য। কিন্তু তার জন্যে বসে থাকলে চলবে না।

মনে রাখতে হবে আমরা আর গো-যানের যুগে বসে নেই—দ্রুতগতি ও কর্মঠ 'জীপ' এসেছে তার যায়গায়। তাই জগৎ থেকে পিছিয়ে-পড়া দেশের উন্নতির জন্যে শিক্ষার সংস্কারে হাত লাগাতে বিলম্ব করার অবকাশ নেই।

এই ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় ছাত্র-সমাজের মনোভাব জ্ঞাপন করা আমাদের কর্তব্যের অংগ। কারণ এই সমস্যার সংগে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক আমাদের,—ছাত্রদেরই। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর একান্ত মনোযোগের অভাব হয়েছে আজকাল—এ অভিযোগ আজ বিরল নয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, এর মূলেও রয়েছে শিক্ষার গলদ। শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর এই ঔদাসীন্যের লক্ষণ তখনই দেখা যায় যখন শিক্ষার্থী শিশুকালের উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বিদ্যাভ্যাস করার পর ক্রমে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখে। শিক্ষার্থী যখনই বুঝতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ছাপ তাকে মাত্র অনিশ্চয়তার দ্বারেই পৌঁছে দেবে—তার ভবিষ্যৎ জীবন-যাপনের কোনোই সুরাহা তার দ্বারা হবে না—তখনই তার মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটতে থাকে; তখন শুধু লক্ষ্য হয় কোনও প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ছাপটি লাভ করা।

তাই আজ শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে বিদ্যার্থীর শক্তি ও উৎসাহের কোন প্রকার অপচয় না হয়।

এজন্য জাতীয় প্রয়োজনের সংগে সমতা রেখে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য মত উচ্চ-শিক্ষা কিংবা পেশাদারী শিক্ষার জন্যে বাছাই করতে হবে। এর পর প্রবেশিকা পরীক্ষার পর এই ধরণের শ্রেণী-বিভাগ আর একবার করতে হবে, যতে শাণিতবুদ্ধি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষার জন্যে মনোনীত হতে পারে এবং অন্যান্য ছাত্র উচ্চশ্রেণীর পেশাদারী শিক্ষার সুযোগ পায়। এতে মোটামুটি প্রত্যেক ছাত্রই তার রুচি ও সামর্থ্যের পূর্ণ প্রয়োগ করতে পারবে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাও আর 'মাথায় ভারী' থাকবে না।

শিক্ষার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সর্ব-প্রথম মনে রাখতে হবে যে আমরা জন্মেছি এবং বাস করছি বিজ্ঞানের যুগে। তাই শিক্ষা-তালিকায় সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে বিজ্ঞানকে। যথাযথভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সংগে নিকট সম্পর্ক না থাকলে জীবনের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য জাতির অনেক পেছনে যে আমরা পড়ে থাকব এ কথা নিশ্চিত। তাই বিজ্ঞানের আধুনিকতম চর্চার সংগে আমাদের দেশের পরিচয় রাখতে হলে একদিকে যেমন এদেশের শিক্ষার্থীকে বাইরে পাঠানো প্রয়োজন, তেমনি বিদেশ থেকে বিজ্ঞ বিজ্ঞানীদেরও আনা দরকার এদেশে।

শিক্ষার প্রত্যেক শাখাই আজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। যে কোনো ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা লাভ করতে হলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। তাই, পল্লব-গ্রাহী বিদ্যার প্রয়োজন হয়েছে শেষ। সুতরাং শিক্ষার্থীদেরও গড়ে তুলতে হবে অনুরূপভাবে।

শিক্ষা যাতে শিক্ষার্থীর মনে জাতীয় ভাবোন্মেষের সহায়ক হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে, বস্তুতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার কু-ফলের মধ্যে প্রধান ছিল এই জাতীয় ভাবের প্রতি অবহেলা। এর বিষময় পরিণতির কথা আর বিশেষ করে বলার প্রয়োজন নেই।

বনিয়াদী শিক্ষার উল্লেখ এখানে অ-প্রাসংগিক হবে না। বর্তমানে যখন আমাদের দেশে গণ-শিক্ষার কোনো বনিয়াদই নেই, তখন এ পরিকল্পনা যে অবশ্যই প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য, দেশ-জোড়া অজ্ঞতার দূরীকরণ। আমাদের মনে হয়, এ শিক্ষাকেও সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সরকারী সাহায্য অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ শিক্ষকদের কেবল আদর্শে অনুপ্রাণিত করে এ ব্যবস্থা ষোল-আনা পূর্ণ হবে না। এ কথা আজ স্বীকার করতেই হবে, শিক্ষকমণ্ডলীর আর্থিক অবস্থার সম্যক উন্নতিবিধান না করলে তাদের কাছ থেকে সত্যিকারের কিছু প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। শিক্ষাদানের কর্তা হবেন যাঁরা, অন্ন-সংস্থানের চিন্তাই যদি জুড়ে থাকে তাঁদের মন, তবে শিক্ষার্থীরা বলিষ্ঠভাবে অনুপ্রাণিত হবে কেমন করে?

শিক্ষার মাধ্যম এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার পাঠক্রমে ইংরেজির স্থান নিয়ে ইদানিং যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। মাতৃভাষা প্রত্যেক দেশেই শিক্ষার মাধ্যম এবং আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হবার কারণ নেই—বিশেষ করে বাংলা ভাষার মত সমৃদ্ধিশালী ভাষা থাকতে, এ সহজ কথাটা মেনে নিতে বিতর্কের অন্ত নেই। তাছাড়া একশ বছরের ওপর ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেও ইংরেজিতে সত্যিকারের দখল হয়েছে মাত্র কয়েকজনের। বস্তুতঃ কোনো বিদেশী ভাষাই অন্যের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করলে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে একটি কৃত্রিম যবনিকা টেনে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে এ হল বাংগালী ছেলে ও তার আহার্যের মধ্যে কাঁটা-ছুরির দৌত্যের মত। সম্পূর্ণ সহজ ভাবে একে গ্রহণ করা সম্ভব নয় কখনই। এখানে আপত্তি উঠতে পারে, মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক নিতান্তই কম। এ আপত্তি তুচ্ছ। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে এতদিন শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে, তাই দেশী ভাষায় পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ছিল না মোটেই। সুতরাং প্রথমে কিছুদিন এ অভাব তীব্র ভাবে অনুভূত হলেও এ বাধা দুরতিক্রম্য নয়, বিশেষ করে আমাদের ভাষার মত সমৃদ্ধিশালী ভাষা থাকতে। বিজ্ঞানের যে সমস্ত সংজ্ঞা, চিহ্ন ও নামের অনুবাদ সহজ-বোধ্য নয় সেগুলির মূল-নাম গ্রহণ করলে কোন ক্ষতি নেই। বিজ্ঞানচর্চা যদি আমাদের দেশেও দ্রুতগতি অগ্রসর হতে থাকে তবে ভবিষ্যতে বিদেশীরা আমাদের দেশের সংজ্ঞা ও চিহ্ন প্রভৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না, বরং এর মধ্য দিয়ে পারস্পরিক উন্নতির সহায়তাই করা হবে।

এখানে আপত্তি হতে পারে, মাতৃভাষায় প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থায় তেমন সুফল দেখা যায় নি। কিন্তু সে অপরাধ মাতৃভাষার নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে যখন শিক্ষার ব্যবস্থা হল তখনও ইংরেজির ব্যবহারগত প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় নি। তাছাড়া প্রবেশিকার পর আর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থাও ছিল না। তাই মাতৃভাষার মারফৎ প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে পুনরায় বিদেশী ভাষায় শিক্ষার চাপে ছাত্রেরা বিভ্রান্ত হয়েছে।

ভারতের মত বৈষম্যমূলক দেশে কোনও একটি ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করার সার্থকতা খুবই কম। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের ভাব বিনিময়ের জন্যে, এবং দেশ-বিদেশের ঘটনা-পঞ্জীর সংগে পরিচিতি ঘনিষ্ঠ করতে এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানের আধুনিকতম পরিণতির সংগে তাল রেখে চলতে গেলে অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা আমাদের শিখতেই হবে। এই দিক থেকে ভেবে দেখলে দেখা যাবে ইংরেজিই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে সহজবোধ্য ভাষা। কারণ একশ বছরের উপর থেকে এর সংগে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে আমাদের। অবশ্য যে প্রণালীতে এ ভাষা শেখানো হয়েছে এতদিন তার পরিবর্তন করতে হবে। শেক্সপীয়রকে আমরা জানবো ইংরেজির মারফতেই, তবে তার সমালোচনা আমাদের নিজেদের ভাষায় করলে কোনো দোষ নেই—তাতে মাতৃভাষা সমৃদ্ধই হবে। তাছাড়া এতে সমালোচনাও হবে জোরালো। বস্তুতঃ ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস রচিত হয়েছে বিদেশী ভাষায় এবং শেক্সপীয়রের ওপর বিখ্যাত অনেক সমালোচনাই হয়েছে অন্য ভাষায়। তাই ভারতের মত দেশের পক্ষে ইংরেজিকে রাষ্ট্র-ভাষা করলে কোনো অসুবিধার কারণ নেই—বরং এতে আমরা বিশেষ ভাবে লাভবানই হবো। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আমরা তাদের দ্বৈত রূপের পরিচয় পেয়েছি, এক রূপ—তার শাসক হিসাবে, অন্য রূপ—তার ভাষার মধ্য দিয়ে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধি ব্যপকতর হয়েছে, আমাদের চিন্তারাজ্যের গণ্ডী দিগন্তস্পর্শী হয়েছে এবং আমাদের কল্পনাক্ষেত্রে এসেছে বৈচিত্র্য। বস্তুতঃ বিশ্ব-সংস্কৃতির সংগে আমাদের পরিচয় এই ইংরেজি মারফতেই। কিন্তু সে পরিচয় আজ অপরিচয়ের বিস্মৃতিতে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইংরেজকে 'ভারত ছাড়ো' বলার সংগে সংগে আমরা ইংরেজিকেও ভারত ছাড়া করতে উদ্যত হয়েছি। ক্ষণিকের উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে সত্যই যদি তা আমরা করি, তবে ক্ষতি হবে আমাদেরই। আজ এই ভাষা শিক্ষা করবার দৌলতেই আমাদের চোখ খুলেছে, এ কথাটা ভুললে চলবে না। তাই ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে গ্রহণ করলে অসুবিধা যদি কিছু হয়ও তাহলেও লাভের পরিমাণের দিকে দৃষ্টি দিলে সে অসুবিধা তুচ্ছ বলে মনে হবে। বস্তুতঃ কোনও একটি ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করলে অন্য ভাষা-ভাষী ভারতীয়দেরও সমান অসুবিধা স্বীকার করেই শিখতে হবে সেই ভাষা।

ইংরেজির পরিমাণ ও মান আমাদের পাঠক্রম থেকে কমে যাবে সত্য এবং যাওয়াও উচিত। ইংরেজি আমরা শিখব শুধু ইংরেজি ভাষার মণি-কোঠায় যে রত্ন সঞ্চিত হয়েছে তার সংগে যোগাযোগ রাখতে। তাই বলে ব্যবহারিক ভাবে এ ভাষা শিখবার বেশী কোন চেষ্টা আমরা করবো না। কারণ বিদেশী কোন ভাষাই সম্পূর্ণ আয়ত্তের চেষ্টা বাতুলতা—একথা আগেই বলেছি। এখন ইংরেজি আমাদের পাঠক্রম থেকে কমে গেলে সে শূন্যস্থান কি দিয়ে পূরণ করা হবে সে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের মনে হয় এখানে নতুন কিছুর অবতারণা না করে আমাদের বর্তমান শিক্ষার মান আরও কিছুটা উন্নত করা যেতে পারে। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের বয়সানুপাতিক শিক্ষার মান যথেষ্ট নীচে রয়েছে। তাই যে শক্তি আগে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করতে ব্যয়িত হত তাকে নিয়োজিত করতে হবে উন্নত মানের শিক্ষালাভের জন্য।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে শিক্ষাকে সব দিক দিয়ে সফল করতে হলে মনের শিক্ষার সংগে দেহের শিক্ষার সু-ব্যবস্থা সমান প্রয়োজনীয়। প্রাচীন গ্রীসে শরীর-গঠন দৈনন্দিন শিক্ষার একটি বিশিষ্ট অংগ ছিল। আজ জাতীয় জীবনের চরম দুর্গতির দিনে আমরা এক রকম ভুলেই গিয়েছি যে শরীর-গঠন এবং স্বাস্থ্য-রক্ষাও শিক্ষার অংগ। এ বিস্মৃতির কারণও আমাদের শিক্ষার গলদের দরুণ। আমাদের লক্ষ্য ছিল শিক্ষান্তে মসীজীবী কেরাণীর কাজে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া। আজ তাই মনে রাখতে হবে, মানসিক দৈন্য যেমন জাতির অবনতি ঘটায় দৈহিক দারিদ্র্যও তেমনি জাতীয় অধঃপতনের পথ সুগম করে। জাতিকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে হলে এদিকে অগৌণে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। দেশরক্ষা-বিষয়ক বৃহত্তর প্রশ্নও জাতীয় স্বাস্থ্যের সংগে জড়িত হয়ে আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। জাতির দৈহিক সুস্থতার ওপরেই নির্ভর করছে তার মানসিক উন্নতি। প্রাচীনযুগে মহামতি এ্যারিস্টট্‌ল্‌ও শিক্ষার যে পাঁতি দিয়েছেন তাতে বিশেষ জোর দিয়েছেন এই শারীরিক শিক্ষার ওপর।

এই সংগে একথা মনে রাখতে হবে, যে দূরত্ব আমরা এতদিন রক্ষা করে এসেছি দেশরক্ষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ব্যাপারে, প্রয়োজন ও পরিবেশের তাগিদে তার স্বরূপ বদলেছে। তাই পূর্বতন উদাসীন্য ও ব্যবধান আজ দূর করে জাতীয় পট-ভূমিকায় একে দেখতে হবে। এর জন্যে প্রস্তুতি দরকার ছাত্র-জীবন থেকেই। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদিকেও আমরা পিছিয়ে আছি অনেকখানি। তাই ছাত্র-জীবন থেকেই এ বিষয়ে আবশ্যিক শিক্ষা প্রচলিত হওয়া দরকার। সব শেষে যে সত্য আমাদের বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে হবে, তা হল এমন শিক্ষার প্রবর্তন যার ফলে পরিপূর্ণ অর্থে মানুষ গড়ে উঠবে—দেশের মাটির সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে।

কলেজ-প্রসংগ

কলেজ পত্রিকা

দীর্ঘ পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর আমাদের পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হল। বলা বাহুল্য, যুদ্ধকালীন কাগজ-নিয়ন্ত্রণাদেশের জন্যেই এর মধ্যে পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। পত্রিকার আয়তন একশ-চল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে—এই সর্তে মাত্র গত নভেম্বর মাসে এ আদেশ তুলে নেওয়া হয়েছে, আমাদের পত্রিকাকে 'বিশেষ ক্ষেত্র' বিবেচনা করে। দেড় মাস সময়ের মধ্যে বের করা হল এই সংখ্যা—তাই, ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি কিছু থেকে থাকে, নিশ্চয়ই তা অমার্জনীয় হবে না।

পত্রিকার ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে বিশেষ করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই আশা করি। যে পরিবর্তন এল দেশ জুড়ে, তা উপেক্ষা করে পুরানো রীতি বজায় রাখা শুধু দৃষ্টিকটুই হত না, অসংগতও হত। তাছাড়া, বাংলা ভাষাকে মাধ্যম করবার কাজে দেশবাসীকে সহায়তা করতে বলেছেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সেদিক থেকেও এই পরিবর্তনের উপযোগিতা আছে।

এই কাজে পরিভাষা-সংক্রান্ত অসুবিধা অনুভূত হয়েছে পদে পদে। তর্জমার কাজে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তীর উপদেশ অনেকাংশে সুগম করেছে কাজের জটিলতা। তবে যে-সব ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে, সে-সব জায়গায় কোন বাংলা প্রতিশব্দ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ না করে এবারকার মত ইংরেজি শব্দের অনুলিখন রাখা হল। কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাব—

College Union Council—ছাত্র-পরিষৎ; Junior Common Room—বিরাম-পীঠিকা (বিদ্যার্থি-বিভাগ); Social Service Section—সমাজ-সেবা সমিতি; Debate Section—বিতর্ক সমিতি; Junior Bursar—কোষরক্ষক (বিদ্যার্থি-বিভাগ); Seminar—পাঠ-গোষ্ঠী।

এই শব্দগুলি এবং এগুলি ছাড়াও যে সব ইংরেজি শব্দ এই সংখ্যায় ব্যবহার করা হল সেগুলি সম্বন্ধে অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রদের কাছ থেকে মতামত বা নতুন প্রস্তাব সাদরে আহ্বান করছি—যাতে এর পরের সংখ্যায় আর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করতে হয়। Magazine-এর বাংলা আপাততঃ 'পত্রিকা' করা হল। এর চেয়ে সুষ্ঠু অথচ প্রচলিত কোন নাম পাঠকদের জানা থাকলে জানাতে অনুরোধ করছি। তবে এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে, কতকগুলি ইংরেজি শব্দ বাংলায় এত বেশি প্রচলিত হয়ে পড়েছে যে সেগুলির তর্জমা একেবারে অচল। 'চেয়ার', 'টেবিল', 'স্কুল, 'কলেজ'—ইত্যাদি শব্দের মত 'লাইব্রেরি'কেও বাংলায় মেনে নেওয়া হয়েছে; রবীন্দ্রনাথও এই প্রয়োগ করে গিয়েছেন।

'Art'এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'কলা' বা 'সাহিত্য' কোনটাই পূর্ণাংগ নয়। তাছাড়া এই শব্দটি ইংরেজি ছাড়া আরও অনেক ভাষাতেই চলে। তাই 'প্রথম বর্ষ, কলা বা সাহিত্যের' পরিবর্তে 'প্রথম বর্ষ, আর্টস' লেখাটাই সমীচীন মনে হয়। Editor-এর প্রতিশব্দ 'সম্পাদক'; আবার Secretary-র প্রতিশব্দও 'সম্পাদক' বলেই চলে আসছে। কিন্তু যেখানে দু'জনেই বর্তমান, সেখানে Secretary-র বাংলা কি হবে ভেবে পাই নে। আশা করি অধ্যাপকবৃন্দের এবং ছাত্রদের মতামত ভবিষ্যতে এসব সমস্যার সমাধান করবে।

কলেজে স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ই আগস্ট সকাল সাতটায় কলেজে 'স্বাধীনতা-দিবস' পালন করা হয়। প্রবেশ-দ্বারটি পত্রপুষ্পে সুশোভিত করা হয়েছিল। একটি সুদৃশ্য সূচী-কার্য-করা রেশমের পতাকা উত্তোলন করেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ। ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসের একদল ছাত্র ছাত্রাবাসের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সামরিক প্রথায় পতাকা অভিবাদন করেন। 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা' গানটির পর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ বক্তৃতা-প্রসংগে বলেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের দান অকিঞ্চিৎকর নয়; এই পতাকাতলে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে সর্বপ্রথম স্মরণ করবো তাঁদের, যাঁদের আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে এদেশের ঘরে ঘরে আজ এই পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব হল। অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র বলেন, শুধু বাইরের প্রণতি নয়, অন্তরের নতি জানাতে হবে এই পতাকাকে; প্রেসিডেন্সি কলেজ এই পতাকার যথোচিত মর্যাদা দিতে পারবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। প্রাক্তন ছাত্রদের তরফ থেকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশোভনচন্দ্র সরকার বলেন, দেশের একতলার মানুষ যারা, তারা কোনদিন খুশি-মনে মেনে নেয় নি বিদেশী-শাসন; তাই আজকের এ পতাকা জনসাধারণেরই জয় সূচনা করছে। বর্তমান ছাত্রদের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন, সংগ্রামের শেষে এসেছে দায়িত্ব বহন করে এগিয়ে চলার দিন; প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা এ কাজেও যথোচিত সামর্থ্যের পরিচয় দেবে। ছাত্রাবাসের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুহ বলেন, লক্ষ লক্ষ নর-নারীর দুঃখ-দুর্দশা সার্থক হয়ে উঠল আজ এই পতাকার মধ্য দিয়ে। সমবেত কণ্ঠে 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানটির পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। রাত্রিতে যথোচিত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হয়েছিল।

প্রধান মন্ত্রীর কলেজ পরিদর্শন

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কলেজে আসেন। ক্লাস এবং লেবরেটারিগুলি দেখবার পর তিনি ফিজিক্স থিয়েটারে সমবেত অধ্যাপক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর ছাত্রদের সংগে তাঁর একটি ছবি নেওয়া হয়।

বক্তৃতা প্রসংগে ডাঃ ঘোষ অধ্যাপকরূপে এই কলেজের সংগে তার পরিচয়ের উল্লেখ

করে বলেন যে শতাব্দী-প্রাচীন এই কলেজ নিজের প্রাধান্য বজায় রেখেছে সব সময়ে। তিনি বলেন, বিদেশী শাসন শেষ হওয়ার সংগে সংগে শিক্ষার রীতিও বদলাতে হবে। তাই প্রেসিডেন্সি কলেজকে প্রগতিশীল এমন কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে যাতে এই পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্যেও তার পূর্বেকার গৌরব থাকে অক্ষুণ্ণ। বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের অপরিহার্য স্থানের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, 'দেশের সম্পদ' এই কলেজকে বিজ্ঞানচর্চার আদি পীঠে পরিণত করতে হবে। গবেষণার কাজে এর উন্নত পন্থায় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের জন্যে প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের আনতে হবে। মোটকথা, এই কলেজ যাতে সব দিক দিয়ে জাতীয় উন্নতির পথে ছাত্রদের পরিচালিত করতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

কলেজের মাইনের কথা উল্লেখ করে ডাঃ ঘোষ বলেন, অনেকের পক্ষেই এত বেশি মাইনে দিয়ে এ কলেজে বিদ্যাভ্যাস সম্ভব হয় না। তাই শীঘ্রই যাতে মাইনে কমান হয় সেদিকে তিনি নজর দেবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেন, মানসিক বিদ্যাতেই নয়, শারীরিক স্বাস্থ্যেও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাধান্য বজায় রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আবশ্যিক শরীর-চর্চার উল্লেখ করেন তিনি।

শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেন, এই আদর্শানুযায়ী কাজ করতে হলে কলেজের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। প্রেসিডেন্সি কলেজ এখন যেখানে অবস্থিত, সেখানে তা সম্ভব নয়। কোলাহলমুখর এবং ঘনবসতিপূর্ণ নগরী ত্যাগ করে তাই অপেক্ষাকৃত নির্জন কোন জায়গায় এই কলেজ স্থাপন করতে হবে। কলেজের সংলগ্ন থাকবে ছাত্রাবাস। এতে একদিকে যেমন ছাত্রদের মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটবে না, অন্যদিকে তেমনি সহরের বাসস্থান-সমস্যার সমাধান হবে কিছুটা। ডাঃ ঘোষ আরও বলেন, জাতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত করতে হলে এদেশে একাধিক প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপন করা দরকার।

পরিশেষে তিনি বলেন, এ কাজের দায়িত্ব শুধু সরকারেরই নয়, এতে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপকবৃন্দ কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রেখে কলেজের সুনাম ও প্রাধান্য বজায় রাখবেন।

আমাদের অভাব-অভিযোগ

কলেজ পত্রিকা মারফৎ আমরা অভাব-অভিযোগ জানিয়েছি অনেক, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার প্রতিকার করেছেন সামান্য। যদি বিদেশী শাসনই এই ঔদাসীন্যের কারণ হয়ে থাকে, তবে এখন সে শাসনের অন্তে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি আমাদের অভাব অভিযোগগুলির প্রতিকার করা হবে অবিলম্বে—বিশেষতঃ জাতীয় জীবনের এই

সন্ধিক্ষণে, যখন শিক্ষাবিভাগে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে দেশের সর্বত্র। একে একে আমরা আমাদের অভাব-অভিযোগগুলি উল্লেখ করছি।

আমাদের লাইব্রেরি এদেশের সব-সেরা লাইব্রেরিগুলির মধ্যে একটি। বর্তমানে লাইব্রেরিতে বই আছে ৬২০০০ খানার কাছাকাছি। ১৯৪৬-এর জুন মাসের পর নতুন বই কেনা হয়েছে ৭৫৬ খানা এবং এ বছর বিভিন্ন সাময়িকী নেওয়া হচ্ছে ১৬৬ খানা। কিন্তু দুঃখের কথা, লাইব্রেরি সংক্রান্ত যে সব অসুবিধা ছাত্ররা দশ বছর আগেও অনুভব করেছেন[১], তার প্রতিকার তো হয়ই নি, বরংচ অসুবিধা আরো বেড়েছে। ছাত্রদের সব চেয়ে বেশী অসুবিধা ভোগ করতে হয় বই নেওয়ার সময়। এই অসুবিধার মূলে লাইব্রেরির কর্মচারীদের কোন ঔদাসীন্য বা অক্ষমতা নেই, এর একমাত্র কারণ কর্মচারীদের সংখ্যাল্পতা। আর্টস্ লাইব্রেরিতে সহকারী লাইব্রেরিয়ান আছেন দু'জন, এবং সায়েন্স লাইব্রেরিতে মাত্র একজন। নিম্ন-কর্মচারীর সংখ্যা সব সমেত নয় জন। ১৯৩৩-এর ছাঁটাই-এর আগে এদের সংখ্যা ছিল বারো জন। লাইব্রেরির আয়তন দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং কাজও বাড়ছে, অথচ কর্মচারী-সংখ্যা বাড়ানো তো দূরের কথা, পূর্ব সংখ্যা পর্যন্ত বহাল করা হয়নি। লাইব্রেরির কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে, আর্টস লাইব্রেরিতে অন্ততঃ তিনজন এবং সায়েন্স লাইব্রেরিতে দু'জন সহকারী লাইব্রেরিয়ান এবং অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা অন্ততঃ ১৯৩৩ এর পূর্বে যা ছিল, অর্থাৎ বারোজন, করা অবিলম্বে দরকার।

কোন প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরিই 'কার্ড-ইনডেক্স' ছাড়া চলতে পারে না। অথচ আমাদের লাইব্রেরিতে এর কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হল না। প্রত্যেক বই-এর জন্যে অন্ততঃ দু'খানা করে কার্ড লিখলে প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কার্ড লেখা দরকার। মাত্র দু-তিন মাসের জন্যে কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত করলেই এ অসুবিধা দূর করা যেতে পারে। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ এই কাজের জন্যে একজন মাত্র লোক দিয়েছেন।

একখানি পূর্ণাংগ ছাপানো তালিকার অভাবও আর একটি অসুবিধার কারণ। বর্তমান তালিকাগুলি ছাপানো হয়েছে কয়েক বছর আগে। তারপর বই এসেছে প্রচুর। সেগুলির নাম এবং নম্বর তালিকার মধ্যেকার শাদা পৃষ্ঠায় লিখে রাখা হয়। ফল দাঁড়িয়েছে এই, এখন আপাতঃ দৃষ্টিতে তালিকার ছাপানো অংশের চেয়ে হাতে-লেখা অংশটাই বড় বলে মনে হয়। পূর্ণাংগ ছাপানো তালিকার কাজও হতে পারে 'ইন্‌ডেক্স-কার্ড' তৈরী করবার সময়।

আর্টস্ লাইব্রেরিতে ছাত্রদের সংগে বই-এর পরিচয় শুধু তালিকা মারফৎই। বইটি নেবার আগে পর্যন্ত বইটির স্বরূপ বা উপযোগিতা সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞানই থাকে ছাত্রদের। আমাদের প্রস্তাব, এমনভাবে লাইব্রেরি তৈরী করা হোক যাতে

১। ১৯৩৭ সালের কলেজ পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

আলমারীতে রাখা বইগুলো ছাত্রেরা দেখতে পায় নেবার আগেই। এতে বই আদান-প্রদানের সুবিধাও হবে। এই প্রসংগে অধ্যক্ষ জ্যাকেরিয়ার ইস্‌লামিয়া-কলেজ-লাইব্রেরি সংক্রান্ত প্রস্তাব ও খসড়াটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

লাইব্রেরিতে বই উত্তোরোত্তর বাড়ছেই। অথচ কর্তৃপক্ষ আসবাব বাড়ানোর কোনো ব্যবস্থাই করেন নি। এতে লাইব্রেরির স্থানে স্থানে বই স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। এভাবে বই বেশিদিন থাকলে উই আর ইঁদুরের কৃপায় সেগুলির কি দশা হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

সকাল ও সন্ধ্যায় ছাত্রদের লাইব্রেরি ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। এছাড়া ছুটীর দিনে তো কথাই নেই। অথচ এই সব সময়ই পড়বার সময়। এ অসুবিধা দূর করতে হলেও কিছু কর্মচারী নিয়োগ করা দরকার।

পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই প্রত্যেক বিষয়ে মূল্যবান বই প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ আমাদের লাইব্রেরির বরাদ্দ বাড়ানোর কোনো বন্দোবস্তই নেই। প্রেসিডেন্সি কলেজে দেশের সব-সেরা ছাত্ররা আসে পড়তে। তাদের শিক্ষা এবং গবেষণার সহায়তা করতে পারে এমন কোনো বই আমাদের লাইব্রেরিতে না থাকা শুধু লজ্জার কথাই নয়, অন্যায়ও বটে। অথচ বর্তমান আর্থিক বরাদ্দ (বার্ষিক ছয় হাজার থেকে আট হাজার টাকা মাত্র) অত্যন্ত দরকারী নতুন বই কিনবার পক্ষেই অপ্রতুল। এই বরাদ্দের কমপক্ষে অন্ততঃ দ্বিগুণ বরাদ্দ না হলে, বর্তমানের সেরা বইগুলি কেনবার কোন বন্দোবস্ত করা যাবে না।

এই গেল লাইব্রেরির কথা। অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে একটি হল আমাদের একটি 'কলেজ-হল্‌'-এর অভাব। এ বিষয় ১৯১০ সালে অধ্যক্ষ জেমসের উক্তি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত বিস্তর লেখালেখি হয়েছে; অথচ কাজ হয় নি এতটুকু। এ বিষয়ে কি পরিমাণ লেখালেখি হয়েছে, তার একটা নমুনার জন্যে আমরা পাঠকদের কলেজ পত্রিকার জুবিলি সংখ্যা (মার্চ, ১৯৩৯) দেখতে অনুরোধ করি। এমন কি কয়েকবার এই উদ্দেশ্যে চাঁদা তোলাও হয়েছে এবং সরকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন অবিলম্বে এই অসুবিধা দূর করতে। কিন্তু হল্‌-এর কোন ব্যবস্থা আজও হল না।

কলেজের পঠন-পাঠনের ঘরগুলির আসবাবপত্র অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। তাছাড়া এগুলি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত যুগে একেবারে অচল। ছোট টেবিল এবং চেয়ারের প্রবর্তন হয়েছে অনেক দেশে। আমাদের অতটা না হোক, হেলান দিয়ে বসবার উপযুক্ত ডেস্কের প্রচলন করা যেতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে যে ঘরগুলিতে 'জেনারেল ক্লাস' হয় সেগুলিকে 'আদর্শ ঘর' হিসাবে এই নতুন প্রথার প্রবর্তন করা যেতে পারে, যাতে ভবিষ্যতে ক্রমে অন্য সব ঘরেও ঐ প্রথায় আসবাবপত্র আনা যায়।

য়ুনিয়ন-সংক্রান্ত কাজ-কর্মের জন্যে একটি ঘরের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া

কলেজ-পত্রিকার কাজ-কর্ম এত বেশি যে এর জন্যে একটি স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থাও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

কলেজে ছাত্রসংখ্যা প্রায় বারো শ। কিন্তু 'কমন্‌রুমে' স্থান সংকুলান হতে পারে মাত্র ১৫।২০ জনের। এর ফলে অবসর-সময়ে ছাত্রদের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয়। অনেকে আশ্রয় নেয় লাইব্রেরিতে। এতে লাইব্রেরির কাজে ব্যাঘাত হয় যথেষ্ট। তাই একটি বড় কমনরুমের ব্যবস্থা করা অবিলম্বে দরকার। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কমনরুমের আসবাবপত্রেরও সংস্কার সাধন প্রয়োজন।

আর্টস-বাড়ি এবং বিজ্ঞান-বাড়ির মধ্যেকার দূরত্ব নেহাৎ কম নয়। মাঠ পেরিয়ে এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যাবার সময়ে ছাত্রদের অসুবিধার চূড়ান্ত হয়। বর্ষাকালে গ্রীষ্মের সময়েও রদ্দুরের তাপ সহ্য করতে হয়। এর জন্যে অনেকদিন থেকেই এবাড়ি-ওবাড়ির মধ্যে একটি আচ্ছাদন বা 'শেডে'র জন্যে আবেদন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যে তাও সম্ভব হয় নি।

প্রায় প্রত্যেকদিন ছ' ঘন্টা করে ছেলেদের থাকতে হয় কলেজে। এই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ কিছু লঘু আহার্য প্রত্যেককেই গ্রহণ করতে হয়। নইলে শারীরিক অবনতি অনিবার্য। এই উদ্দেশ্যে কলেজে একটি শস্তা আহার্য-গৃহ বা 'চীপ্ ক্যান্টিন' স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আধুনিক যে কোনও বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবস্থা আছে। বস্তুতঃ ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিক থেকে এ ব্যবস্থা অপরিহার্য।

এম্-এ ক্লাসের ছাত্রদের এই কলেজ মারফৎ পড়বার জন্যে সাত টাকা, (এম্-এস্‌সিতে আট টাকা) বেশি দিতে হয়। আগে এর পরিবর্তে কলেজে বিশেষ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এখন অধ্যাপকমণ্ডলীর সংখ্যাল্পতার দরুণ সে ব্যবস্থা আর নেই। আমাদের বক্তব্য, হয় আরও কয়েকজন অধ্যাপক নিযুক্ত করে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হোক, tf, নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে মাইনে দিতে হয়, এখানে তার চাইতে দু-এক টাকা বেশি নিয়ে এই কলেজের অনার্স উপাধি-ধারীদের অন্ততঃ এই কলেজের সংগে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-হিসাবে থাকতে সুযোগ দেওয়া হোক।

কলেজে শরীরচর্চার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নেই। ব্যায়ামাগার যা একটি আছে, তার প্রতিও যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় না। বর্তমান সময়ে জাতীয় শিক্ষার একটি বিশেষ অংগ যে শারীরিক শিক্ষা, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। তাই যদি আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা বা ঐ ধরণের কিছু আপাততঃ প্রবর্তিত করা সম্ভব না হয়, তবে ছাত্রদের অন্যদিক দিয়ে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, যুযুৎসু ইত্যাদি প্রবর্তিত হলে সকলেই সোৎসাহে যোগ দেবে তাতে।

আমাদের অভাব-অভিযোগের মধ্যে যেগুলির প্রতিকার অবিলম্বে দরকার, শুধু তাই জানানো হল; এবারে শুধু জানিয়েই এর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চেষ্ট থাকবো না, আমরা

আশা করবো দেশের জনপ্রিয়, সহানুভূতিশীল, জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী এর আশু প্রতিকারের দিকে নজর দেবেন।

অধ্যাপকমণ্ডলীতে পরিবর্তন

সম্প্রতি তিন জন অধ্যাপক অবসর গ্রহণ করেছেন—শরীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রমোহন বসু, পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা এবং আরবীভাষার অধ্যাপক মহম্মদ সানাউল্লা। অধ্যাপক বসুর সংগে এ কলেজের পরিচয় দীর্ঘ দিনের। তাঁর অধ্যাপনা-নৈপুণ্য এবং অমায়িক ব্যবহারে কি ছাত্র, কি অধ্যাপক—সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীযুক্ত সাহার পাণ্ডিত্য এবং অনাড়ম্বর জীবন সকলকেই আকৃষ্ট করেছে। অধ্যাপক সানাউল্লার মত আরবীভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন অধ্যাপক বিরল। এঁদের স্থান শীঘ্র পূরণ হবার নয়।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ আমেরিকায় রাশি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর স্থান পূরণ করেছেন অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ।

অধ্যাপকমণ্ডলীতে সম্প্রতি পরিবর্তন হয়েছে যথেষ্ট। এর অধিকাংশই বংগভংগের দরুণ। সাম্প্রতিক পরিবর্তনের একটি হিসাব—

আর্টস-বিভাগ: ইংরেজির অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণু দে বদলী হয়েছেন। তাঁর স্থানে এসেছেন অধ্যাপক শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী। শ্রীযুক্ত প্রিয়তোষ বাগচীও নিযুক্ত হয়েছেন এই বিভাগে। সংস্কৃত-বিভাগে এসেছেন অধ্যাপক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বদলী হওয়ায় তাঁর স্থানে এসেছেন শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য। বাংলায় শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার বদলী হয়েছেন এবং তাঁর স্থানে এসেছেন শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন। আরবীর অধ্যাপক আব্দুল হাই, অধ্যাপক নুরুল আলম, মৌঃ সা-আদ্ মনিরুদ্দিন, মৌঃ গোলাম সারোয়ার এবং মৌঃ সিরাজুল হক্ বদলী হয়েছেন। এসেছেন অধ্যাপক মহীউদ্দিন, মৌঃ মুজিবর রহমান এবং মৌঃ মামুদ হাসান। দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক আব্দুল বাকী বদলী হওয়ায় এসেছেন অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য। ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ খলিলুর রহমান বদলী হয়েছেন। অর্থনীতিতে এসেছেন অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান-বিভাগ: গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ আতাউল হাকিম এবং মৌঃ আবুল কাশিম বদলী হয়েছেন। তাঁদের স্থান পূরণ করেছেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুশারী। রসায়ন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ কুদরৎ-ই-খুদা পাকিস্তানের শিক্ষা-নির্দেশক নিযুক্ত হয়েছেন। তাছাড়া মহম্মদ রহমান্ চৌধুরীও বদলী হয়েছেন। এসেছেন শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় গুহ, শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার সিংহ এবং শ্রীযুক্ত সুবোধ চক্রবর্তী। পদার্থ-বিজ্ঞান-বিভাগে

এসেছেন অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন। উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান-বিভাগে এসেছেন শ্রীযুক্ত পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র। শরীরবিজ্ঞান বিভাগে এসেছেন শ্রীযুক্ত স্থভাষকুমার ধর। ভূ-বিজ্ঞান বিভাগে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েছেন ডাঃ ঝিন্‌গ্রাম।

সম্প্রতি খবর এল, ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বদলী হলেন কৃষ্ণনগর কলেজে। এই কলেজের সংগে শ্রীযুক্ত মজুমদারের পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ট। তাঁরই চেষ্টায় 'প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিস্টার' তৈরী এবং প্রকাশিত হয়। ছাত্র এবং অধ্যাপক সকলেরই তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কলেজের কোনও অনুষ্ঠানই তাঁকে ছাড়া সম্পন্ন হয় নি। তাঁর অভাব সকলেই অনুভব করবেন পদে পদে। পত্রিকার এই সংখ্যার সম্পাদনী সভার সভ্য হিসেবে তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান সাহায্য পাওয়া গেছে।

প্রাক্তন-ছাত্র-সংবাদ

সম্প্রতি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন, কিংবা উচ্চ সরকারী কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করা হল—

অমাদের কলেজের মেধাবী প্রাক্তন ছাত্রদের অন্যতম শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। ভারতীয় মন্ত্রীসভায় খাদ্য-সচিবের পদেও এঁর স্থনাম যথেষ্ট। সম্প্রতি ইনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গণপরিষদের সহঃ সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ও আমাদের কলেজের ছাত্র ছিলেন। ভারতীয় মন্ত্রীসভার আরও দু'জন সদস্য, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ভারত সরকারের লণ্ডনস্থ জন-সংযোগকর্তা শ্রীস্থধীর ঘোষ এবং ভারতের শিল্প ও সরাবরাহ বিভাগের প্রধান নির্দেশদাতা শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষও আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

বংলার অস্থায়ী গভর্ণর শ্রীব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এই কলেজেই পড়েছেন। বাংলা সরকারের মন্ত্রীসভায় আমাদের প্রাক্তন ছাত্র আছেন শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী। এ ছাড়া বাংলার পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বস্থ এবং সভ্য ডাঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী আমাদেরই প্রাক্তন ছাত্র।

ভারত-সরকার আণবিক শক্তির গবেষণার জন্যে সম্প্রতি যে সমিতি নিয়োগ করেছেন তার দু'জন সভ্য, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস, আমাদের কলেজের বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রদের অন্যতম।

বর্তমানে বাংলা সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় সেক্রেটারি যাঁরা আছেন তাঁদের প্রায় সকলেই আমাদের কলেজের ছাত্র ছিলেন। স্থানাভাবে তাঁদের নামোল্লেখ করা সম্ভব হল না। এ ছাড়া ভারতীয় সরকারের সেক্রেটারিদের মধ্যেও কয়েকজন আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

শোক-সংবাদ

গত ৯ই মার্চ ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসে ইতিহাসের ষষ্ঠ বার্ষিক এম্-এ ক্লাসের ছাত্র তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মহত্যা করে মারা যান। ছাত্র হিসাবে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। বি-এ ইতিহাস অনার্স পরীক্ষায় ইনি দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং আইনের প্রথম পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিতর্কে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং একাধিকবার বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৪৩-৪৪-এ ইনি আমাদের কলেজের বিতর্ক-সভার সম্পাদক ছিলেন। বন্ধু হিসাবে এঁর অমায়িক ব্যবহার সতীর্থরা মনে রাখবে চিরকাল। এঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর বংগবাসী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরলোক গমন করেন। বহুদিন থেকেই তিনি বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এই কলেজের ইংরেজি অনার্স এবং এম্-এ ক্লাসের তিনি একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন (১৯২১-২৫)। শুধু সুযোগ্য অধ্যাপক হিসাবেই নয়, সমাজকর্মী হিসাবে তাঁর নাম সুবিদিত। ছাত্রদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারে তিনি সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ছাত্র-সমাজ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হল। তাঁর পরিবারবর্গকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ভারতের স্বাধীনতা

অধ্যক্ষ যোগীশচন্দ্র সিংহ

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেসিডেন্সি কলেজের দান সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। কলিকাতা মহানগরীতে যে হিন্দু কলেজে প্রায় ১৩১ বছর আগে পূর্ব-ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়, যে শিক্ষার ফলে ভারতে নব যুগের সৃষ্টি, যে শিক্ষায় আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ, সেই বে-সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কলেজ-বিভাগটি পরবর্তীকালে (১৫ই জুন, ১৮৫৫) সরকারী প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। এই কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক হিসাবে আমি এই প্রবন্ধ লিখতে অগ্রসর হয়েছি।

১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে যখন হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার এক বৎসরের মধ্যেই তৎকালীন ভারতে ইংরেজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা-রাজশক্তিকে বিশেষভাবে খর্ব করা হয় এবং একটির পর একটি ক'রে ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশগুলি (শুধু পাঞ্জাব ছাড়া) ইংরেজের করতলগত হয়। ঠিক এই সময়েই ইউরোপে জাতীয়তাবাদ

বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দী ইউরোপের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের যুগ বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। এই মতবাদের ফলেই ইউরোপের নানাদেশে স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবর্গের ক্ষমতার হ্রাস হয় এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে।

ইউরোপের এই যুগের ভাবধারা ইংরেজি শিক্ষিত বাংগালী ও ইংরেজ-অধিকৃত অন্যান্য প্রদেশবাসীর কাছে ইংরেজি শিক্ষা বাহন হিসাবে নিয়ে আসে। প্রথমে কিছু দিন এই শিক্ষা নব্য দলের (ইয়ং বেংগলের) মধ্যে বিশেষ প্রকট ভাব সৃষ্টি করেছিল। ভারতের যা কিছু প্রাচীন সংস্কৃতি সবই খারাপ এবং ইংরেজদের সবই ভালো, এমনকি তাদের মদ খাওয়াটাও সভ্যতাব্যঞ্জক এমনি একটা ভাব তখনকার নব্য শিক্ষিত বাংগালীর আচার-ব্যবহারে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। দীনবন্ধু মিত্রের (ইনি হিন্দু-কলেজের শেষ যুগের ছাত্র) "নিমে দত্ত" একেবারে কবির নিছক কল্পনা নয়। হিন্দু-কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে এই রকম অনেক "নিমে দত্ত" দেখা যেতো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সব উচ্ছৃংখলতা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ইংরেজের আচার ব্যবহারের প্রতি এই অন্ধ ঝোঁক ক'মে যেতে সুরু হ'লো। তা'র বদলে দেখা দিল তীব্র জাতীয়তা-বোধ, যা ক্রমে সুসংবদ্ধ হ'য়ে জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রসারিত ক'রলো।

এই জাতীয় আন্দোলন ক্রমে "আবেদন নিবেদনের" যুগ কাটিয়ে সক্রিয় এবং ব্যাপক হ'য়ে ওঠে, যা'র ফলে এবং কতকটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাহায্যে আমরা আজ স্বাধীনতা-মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হ'তে পেরেছি। ভারতের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে হিন্দু-কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি-কলেজের যে সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষক বিশেষভাবে যোগ দিয়েছিলেন আজ শুধু তাঁদের কথাই ব'লব। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে এই সব দেশসেবক সৈনিক বে'র হ'য়েছিলেন, এ আমাদের পরম গর্ব।

এই প্রসংগে যাঁর নাম সর্ব-প্রথমে উল্লেখযোগ্য তিনি রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন হিন্দু-কলেজের ছাত্র, শিক্ষক বা কর্মকর্তা ছিলেন না, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তাঁর পূর্ণ সহযোগ ও সহানুভূতি ছিল। প্রতিষ্ঠাতারূপে দাঁড়ালে পাছে সনাতনী হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হ'ন এই ভেবে তিনি পেছন থেকে পরোক্ষভাবে হিন্দু-কলেজের সাফল্য কামনা ক'রতেন। কি সাংসারিক দুর্নীতি অপসারণ, কি ধর্মসংস্কার, কি প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান, কি স্বদেশপ্রীতি—সব বিষয়েই তিনি ছিলেন অগ্রণী। তাঁর স্বজাতি-প্রীতির একটি নিদর্শন ১৮২৭ সালের জুরী-আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আইনে খৃষ্টানেরা হিন্দুর বা মুসলমানের বিচারে জুরী হ'তে পারতেন কিন্তু খৃষ্টানের বিচারে হিন্দু বা মুসলমানকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।[১] ১৮২৮ সালের ১৮ই আগস্ট জে. ক্রফোর্ড নামে একজন ইংরেজকে তিনি যে চিঠি লেখেন তা'তে জানতে পারা যায় যে ঐ সাহেবটির মারফৎ

---

(১) কলেট—১৫৩ পৃষ্ঠা।

তিনি জুরী-আইনের বিরুদ্ধে বহু-স্বাক্ষর-সম্বলিত একখানি আবেদনপত্র পার্লামেন্টে দাখিল করেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা আর একটি ছোট ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়। বিলাত-যাত্রার পথে ফরাসী দেশের ১৮৩০ সালের "জুলাই রাষ্ট্র-বিপ্লবের" খবর পেয়ে তিনি বিশেষ আনন্দিত হন এবং এই রাষ্ট্র-বিপ্লবকে গণতন্ত্রের জয় ব'লে প্রচার ক'রতে তিনি কুণ্ঠিত হননি।[২]

রামমোহনের পরেই যাঁর নাম বিশেষ ক'রে মনে পড়ে তিনি হিন্দু কলেজের তরুণ-বয়স্ক শিক্ষক হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে তিনি এই কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। সুকবি ও ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব'লে তিনি এই বয়সেই খ্যাতি অর্জন ক'রেছিলেন। তাঁর জীবনী লেখকের মতে ডিরোজিওর পূর্বে বা পরবর্তীকালে ভারতের কোন দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই এমন কোনও শিক্ষক নিযুক্ত হন নি যিনি ছাত্রদের মধ্যে ডিরোজিওর মত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। সত্যই ডিরোজিওর স্বাধীন চিন্তাধারা, ধর্মান্ধতা ও ছুৎমার্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং স্বদেশপ্রীতি তাঁর ছাত্রবৃন্দকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। জাতিতে ফিরিংগি হলেও তিনি সর্ব-প্রথম (১৮২৭ সালে) স্বদেশী কবিতা লেখেন। কবিতাটি ইংরেজিতে লেখা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুবাদ থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হ'ল—

"স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাটে তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।" ৩

হিন্দু-কলেজের শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিওর প্রভাব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর ছাত্রবৃন্দের সে-যুগে প্রচলিত হিন্দু ধর্মে অনাস্থা, গোমাংস ও শূকরের মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপানে আসক্তি দেখে হিন্দু-কলেজের কর্মকর্তারা বিশেষ বিচলিত হন। এই সবগুলির জন্য তাঁরা ডিরোজিওর শিক্ষাকেই দায়ী করেন এবং ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিস্টারে আছে যে কলেজের কর্মাধ্যক্ষগণ এই সিদ্ধান্ত করায় ডিরোজিও নিজেই অবসর গ্রহণ করেন।

ডিরোজিওর অপসারণ তৎকালীন নব্য বাংগালীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

---

(২) কলেট—১৭৭ পৃষ্ঠা।
(৩) বাগল—২৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

করে। ১৮৩১ সালের ৫ই নভেম্বর 'সমাচার পত্রিকায়' এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়—

"পাঠকবর্গ অবগত আছেন মেং ড্রোজু নামক একজন এতদ্দেশজাত ফিরিঙ্গি হিন্দু-কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বালকদিগকে অসদুপদেশ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মপথে গমন রোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন—এ কথা রাষ্ট্র হওয়াতে কলেজ অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে তৎকর্ম্মচ্যুত করেন।"[৪]

কর্মত্যাগের কয়েক মাসের মধ্যেই, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ডিরোজিওর স্বাধীন চিন্তা ও স্বদেশপ্রীতি[৫] তাঁর মৃত্যুর সংগেই বিলুপ্ত হয়নি। তাঁর ভাবধারা তাঁর পূর্ববর্তীকালের হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এবং তাঁর নিজ ছাত্রবৃন্দের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসংগে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে রেভারেণ্ড কে, এম, বানার্জি নামে সুপরিচিত), কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই হিন্দু-কলেজের ছাত্র এবং ডিরোজিওর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর ছাত্র। ১৮২৪ সাল থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দু-কলেজে ছিলেন। খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরেও তাঁর স্বদেশপ্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। সুপণ্ডিত ও বহুভাষাবিৎ কৃষ্ণমোহন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট ছিলেন। 'ইণ্ডিয়া লীগ' নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংগে তাঁর যোগ ছিল। পরে তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে'র সভাপতি হন। তাঁর সময়ে এটি রাজনৈতিক সভা ছিল, পরে জমিদারদের স্বার্থরক্ষণের সভায় পর্যবসিত হয়।

কাশীপ্রসাদ হিন্দু-কলেজে ১৮২১ সাল থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ইনি সর্ব-প্রথম বাংগালী যিনি ইংরেজি খবরের কাগজ প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রখানির নাম "দি হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার" (The Hindu Intelligencer)। তারাচাঁদ ডিরোজিওর সময়েই হিন্দু-কলেজে পড়তেন কিন্তু তিনি তাঁর ছাত্র নন। তারাচাঁদ রাজা রামমোহনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে রামগোপাল ঘোষের সহযোগে তিনি 'বেংগল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি রাজনীতিমূলক সভা স্থাপন করেন। এই সভা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

দক্ষিণারঞ্জনও ডিরোজিওর ছাত্র। ডিরোজিওর আর এক ছাত্র রসিকলাল মল্লিকের সহযোগে তিনি "জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা" প্রকাশ করেন। ক্রমে ক্রমে এই কাগজ

---

(৪) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, [২য় খণ্ড], ৩২ পৃষ্ঠা।

(৫) ভারতবর্ষকেই তিনি নিজের দেশ ব'লে শ্রদ্ধা করতেন। তৎকালীন ও তৎপরবর্তীকালের অধিকাংশ ফিরিংগির মত তিনি "মোদের বিলাতের" পক্ষপাতী ছিলেন না।

নব্য দলের রাজনৈতিক মুখপত্র হ'য়ে দাঁড়ায়।[৬] দক্ষিণারঞ্জন যৌবনে উগ্র রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা তৎকালীন ইংরেজ খবরের কাগজওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রেছিল। কিন্তু সে যুগের উগ্রপন্থী রাজনীতিক ইংরেজের সংগে ভারতের সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রতে চাইতেন না। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে দক্ষিণারঞ্জনের রাজনৈতিক উগ্রতা কমে যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অযোধ্যা-প্রদেশে ইংরেজদের বিশেষ সাহায্য করায় তিনি ঐ প্রদেশের একজন তালুকদার হন এবং 'রাজা' উপাধি পান। তিনিই লক্ষ্ণৌএর ক্যানিং কলেজের (যাহা এখন লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে) প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ঐ-প্রদেশের জমিদারদের সংঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে তিনি "আউধ তালুকদার এ্যাসোসিয়েশন" স্থাপন করেন। এইটিই অযোধ্যা-প্রদেশের প্রথম রাজনীতিমূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল বর্তমান 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনেরই' অনুরূপ।

এই যুগের হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ডিরোজিও হিন্দু-কলেজ ছাড়বার এক বৎসরের মধ্যেই তিনিও ঐ কলেজ ত্যাগ করেন। কর্ম-জীবনে তিনি ক'লকাতার একজন বিশিষ্ট সওদাগর হ'য়ে ওঠেন। তিনি মেসার্স কেলসল ঘোষ এ্যাণ্ড কোম্পানীর (Messrs. Kelsall Ghose & Co.) অংশীদার ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতার জন্য ইংরাজেরা তাঁকে "ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস" ব'লতেন। স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য তাঁর এই বাগ্মিতার সদ্ব্যবহার করতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হননি।

হিন্দু-কলেজের পরবর্তী যুগের যে সব কৃতিছাত্র দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক ও জাতীয়তাবাদী। প্রথম যুগের ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে যে ইংরেজি আচার-ব্যবহারের দিকে ঝোঁক ও মদ্যপান প্রচলিত ছিল তা' নিবারণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৫১ হইতে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি মেদিনীপুরের সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সরকারী চাকুরেদের কোনও রকম গণ-আন্দোলনে যোগদান করা আমাদের যুগে যে নিষিদ্ধ হয়, রাজনারায়ণের সময়ে, এমন কি বংকিমচন্দ্রের সময়েও তা' ছিল না। রাজনারায়ণ ১৮৬১ সালে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান মেদিনীপুরে স্থাপন করেন। এই সভার সামান্য একটি নিয়ম থেকেই রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধের আভাস পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের কথা-বার্তায় যে ইংরেজি ও বাংলা কথার মিশ্রণ দেখতে পাই, রাজনারায়ণের সময়ে এটা অতিমাত্রায় ছিল। মাতৃভাষার সংগে বিদেশী ভাষার এই ব্যবহার তাঁর জাতীয়তাবোধকে ব্যথিত করত।

---

(৬) বাগল—৩৩ পৃষ্ঠা।

তাই তিনি নিয়ম করলেন যে তাঁর সভায় কোন সভ্য যদি বাংলা কথার মধ্যে ইংরেজি কথা ব্যবহার করেন তবে প্রত্যেকটি ইংরেজি কথার জন্য তাঁকে এক পয়সা ক'রে জরিমানা দিতে হবে।

রাজনারায়ণের 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভাকেই' প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলার সর্বপ্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। তারাচাঁদ চক্রবর্তীর 'বেংগল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' অল্পদিনের মধ্যেই লোপ পায়, কিন্তু রাজনারায়ণের সভাই চৈত্র-বা হিন্দু-মেলার পুষ্টি ক'রে আমাদের জাতীয় জীবনে এক নব যুগ এনে দেয়।

নবগোপাল মিত্র ছিলেন হিন্দু-মেলার প্রাণ ও প্রাধান কর্মী। খুব সম্ভবতঃ মিত্র মহাশয় হিন্দু-কলেজের ছাত্র নন, কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিস্টারে তাঁর নাম পাই নি। কিন্তু ঐ সভার প্রথম বৎসরের অধিবেশনের সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-কলেজের শেষ যুগের ছাত্র। সভার উদ্দেশ্য জানানোর জন্য তিনি বলেন, "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের' জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারত-ভূমির জন্য"[৭]। মেলায় আর একটি উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের মুখাপেক্ষী না থেকে—আমাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া। দেশের কুটীর-শিল্পের, চারু-কলার (চিত্রাংকন প্রভৃতির) ও কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতিসাধন এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য হিন্দু-মেলার চেষ্টা—এই আত্মনির্ভরশীলতা থেকেই আসে। হিন্দু-মেলার কর্তৃপক্ষের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, দিগম্বর মিত্র (পরে 'রাজা'), প্যারীচরণ সরকার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে "সার"), ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, গোপাললাল মিত্র প্রভৃতি হিন্দু-কলেজের বহু প্রাক্তন ছাত্রের নাম দেখতে পাই। প্রতি বৎসর—হিন্দু মেলার অধিবেশনের প্রারম্ভে যে জাতীয় সংগীত গাওয়া হ'ত, সেটি হিন্দু-কলেজের শেষ যুগের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচনা। গানটির প্রথম দুই ছত্র এই—

> "মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।
> ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান? কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?"

এই হিন্দু-মেলা যাঁর ভাবে প্রণোদিত, সেই রাজনারায়ণকে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় "ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক" (Father of Indian Nationalism) আখ্যা দিয়েছেন।

রাজনারায়ণের কথা-প্রসংগে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ও হিন্দু-কলেজের সহপাঠী, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মহাকবি মধুসূদন দত্তকে মনে পড়ে। খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের

(৭) বাগল—১০১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

পর তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়। তিনি আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদে সাহেবী ভাবাপন্ন হ'লেও, বংগ-ভাষা ও বংগ-ভূমির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। রাজা রামমোহনের ন্যায় তিনিও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। হিন্দু-কলেজ ছেড়ে তিনি যখন বিশপস্ কলেজে যান তখন সেখানে ইউরোপীয় ও এদেশীয় খৃষ্টান ছাত্রদের মধ্যে পরিচ্ছদ ও ব্যবহার বিষয়ে বৈষম্যমূলক আচরণের নিয়ম থাকায় তার বিরুদ্ধে কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ করেন। ফলে তিনি বিশপস্ কলেজ ত্যাগ কর'তে বাধ্য হন।

হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে যে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে ওঠে, সেই ভাব-ধারাই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের চেষ্টায় আরও ব্যাপক ও সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। এই আলোচনায় যাঁর নাম সর্বপ্রথমে মনে পড়ে তিনি আমাদের গদ্য-সাহিত্য-সম্রাট বংকিমচন্দ্র। ইনি ১৮৫৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের বি-এ পরীক্ষায় যে দুইজন ছাত্র পাশ করেন বংকিম তাঁদের মধ্যে একজন। ঐ বছরই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। এই চাকরীই ছিল সেই যুগে ভারতবাসীর পক্ষে সবচেয়ে বড় চাকরী। কিন্তু এই সরকারী চাকরী করা সত্ত্বেও তাঁর যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কি উপন্যাসে কি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে, কি ইতিহাসে, কি ধর্মতত্ত্বে, সমস্তই তিনি দেশকে দিয়ে গেছেন।

তাঁর সব চেয়ে বড় দান তাঁর 'আনন্দমঠ' আর 'বন্দেমাতরম্' গান। 'আনন্দমঠ' যখন লেখা হয় তখন আমরা হিন্দু-মেলার যুগ কাটিয়ে প্রায় ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসম্মেলনের (কংগ্রেসের) যুগে এসে পৌছেছি। এই সন্ধিক্ষণে 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হওয়ায় বাংগালীর মনে নূতন আশার উদ্দীপনা এনে দিল। 'আনন্দমঠে' এবং বংকিমের আরও কয়েকখানি উপন্যাসের যে অংশ মুসলমান বিদ্বেষের প্রমাণ ব'লে সাধারণতঃ ধরা হয় বস্তুতঃ তা' এক ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীর অন্য ধর্মাবলম্বী ভারতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ নয়—যে জাতি আমাদের স্বাধীনতা হরণ ক'রেছে এবং যারা আমাদের স্বাধীনতা লাভের অন্তরায় তাদের প্রতিই বিদ্বেষ। কবি দ্বিজেন্দ্রলালও (ইনি ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম-এ পাশ করেন) ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে বিচার-বৈষম্য তাঁর "ইরান দেশের কাজি" কবিতায় ঠিক এই ভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তাই, প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগেই 'আনন্দ-মঠ' বাংগালীর এত প্রিয় হ'য়ে ওঠে। আর সেই অমর সংগীত 'বন্দে মাতরম্' যা আমাদের দেশ-মাতৃকার পূজার মূলমন্ত্র, তা চিরদিনই বংকিমকে অমর ক'রে রাখবে।

যে-বছর বংকিম প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন তার ঠিক পরের বছরেই হেমচন্দ্র এই কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর কবিত্বশক্তি দিয়ে তিনি আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদের আরও বলশালী ক'রে যা'ন। তাঁর

'ভারত-সংগীত' কবিতাকে জাতীয় সংগীতের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশিত হওয়ার দশ বৎসর আগে কবিতাটি মাইকেলের বন্ধু ও হিন্দু-কলেজের সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশিত হয়। ভূদেববাবু সরকারী চাকুরে ছিলেন। এই কবিতাটি প্রকাশের জন্য গভর্মেন্টের কাছে তাঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল।[৮]

হেমচন্দ্র কলেজ ছাড়বার দশ বছরের মধ্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই কলেজে আসেন। তাঁর কথা আগেই একটু বলা হয়েছে। স্বদেশী-যুগে নাট্যকার হিসাবে ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। জাতীয় সংগ্রামে তাঁর প্রকৃষ্ট দান তাঁর সংগীত। তাঁর 'বংগ আমার, জননী আমার' ও 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' গান দুইটির স্থান আমাদের ছাত্র-জীবনে 'বন্দেমাতরম্'-এর ঠিক নীচেই ছিল।

বংকিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের আর একজন কৃতি ছাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত। ইনি ১৮৬৬ সালে এই কলেজ থেকে এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে বিলাত যাত্রা .করেন। সেখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন এবং এদেশে সিভিলিয়ান নিযুক্ত হন। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর দান ঔপন্যাসিক হিসাবে নয়, ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের জনক বলে। দাদাভাই নৌরোজী তাঁর 'দারিদ্র্য ও ভারতে ইংরেজের অযোগ্য শাসন' (Poverty and Un-British Rule in India) নামে পুস্তক রচনা করেন; সেই বইএর ভাবটি নিয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর 'ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাস' (Economic History of Early British India) ও 'ভিক্টোরিয়া যুগে ভারতবর্ষ' (India in the Victorian Age) নামক দুইখানি পুস্তকে ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণ প্রণালী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শেষ জীবনে তিনি একজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী বলে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতের জাতীয় মহাসম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তারই সভাপতিরূপে তিনিই সর্বপ্রথমে গনতন্ত্রমূলক শাসন (Government by the people) দাবী করেন।

এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের আর একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন আনন্দমোহন বসু। ইনি ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত এই কলেজ থেকে এফ-এ, বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৬৯ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। এই সময়ে অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারীং-বিভাগে অংক-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৭০ সালে বিলাতে যান। সেখানে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতবাসী র‍্যাংলার হন (1st class in Mathematics

(৮) বাগল—১১৩ পৃষ্ঠা।

Tripos)। পরে ব্যারিস্টারি পাশ ক'রে দেশে ফেরেন। বিলাতে থাকতেই তাঁর বক্তৃতা করবার ক্ষমতা বিশেষ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। মিস্টার ফসেট তাঁকে "ভারতবর্ষীয় গ্ল্যাডস্টোন" আখ্যা দিয়ে বলেন যে তাঁর মত ছয়জন সুবক্তা বিলেতের হাউস অফ্ কমন্সে পাওয়া কঠিন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার হন, কিন্তু তাঁর অর্থ ও শক্তি তিনি শিক্ষা বিস্তার (তিনি ক'লকাতার সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা) ও রাজনৈতিক উন্নতিকল্পে নিয়োগ করেন। ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজে ভারতীয় জাতীয় মহাসম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ও আরও দু'-এক জন ছাড়া যে সব বাংগালী ভারতীয় জাতীয় মহাসম্মেলনের সভাপতিত্ব ক'রেছেন তাঁরা সকলেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। সার রাসবিহারী ঘোষ তাঁদের মধ্যে একজন। ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই তিনি এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান, বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই কলেজ থেকেই তিনি বি-এল প্রথম বিভাগ প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর সময়ে এই কলেজেই একটি আইন বিভাগ ছিল। ইংরেজি সাহিত্যে ও আইনে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও বিপুল অর্থরাশি তিনি দেশ-মাতৃকার পূজায় নিবেদন করেন। তাঁর নির্ভীকতার একটি নিদর্শন ১৯০৫ সালে ১০ই মার্চে তাঁর টাউনহলের বক্তৃতায় পাওয়া যাবে। লর্ড কার্জন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার হিসাবে বাৎসরিক সমাবর্তন সভায় ১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র এশিয়াবাসীকে 'মিথ্যাবাদী ও কপটতাপ্রিয়' আখ্যা দেন। রাসবিহারীর বক্তৃতা তারই প্রত্যুত্তর। এরূপ বক্তার সাহস ও তেজস্বিতা আজকাল অনেকের কাছে হয়ত অতি সাধারণ জিনিষ ব'লে মনে হতে পারে কিন্তু ৪২ বছর আগে বড়লাট বাহাদুরের আচরণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় প্রতিবাদ করা অনেকের পক্ষেই দুঃস্বপ্ন ছিল। রাসবিহারী পর পর দুইবার ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে জাতীয় মহাসম্মেলনের সভাপতি হন। তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ—প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা—তিনি বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করেন। তন্মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষা ও অনুশীলনের জন্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে (National Coucil of Eduction, Bengal) ২০ লক্ষের ওপর টাকা দেন।[৯]

রাসবিহারী সমসাময়িক প্রেসিডেন্সি কলেজের আর একজন ছাত্র তারকনাথ পালিত (পরে 'সার')। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থিত তাঁহার সুবৃহৎ আবাসগৃহ ও বিস্তৃত জমিখণ্ড এবং নগদ বহু লক্ষ টাকা বিজ্ঞান শিক্ষা এবং উহা দেশের শিল্পে প্রয়োগের জন্য

(৯) এই অর্থেই যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। আজীবন সঞ্চিত অর্থ তিনি এইভাবে দেশ-মাতৃকার পূজায় নিবেদন করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের আর একজন সুবিখ্যাত ছাত্র সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৮৮১ সাল হইতে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং এফ-এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান, বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষায় নিজ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর প্রধান কীর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণার দ্বারা উচ্চ শিক্ষা বিস্তার এবং বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তার ন্যায্য অধিকারের ব্যবস্থা করা। সরকারী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কিরূপ স্বাধীনচেতা ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত পূর্ববাংলার লাট সার ব্যাম্‌ফাইল্ড ফুলারের শিক্ষাবিষয়ক একটি নির্দেশ অমান্য করা। ফুলার সাহেব স্বদেশিকতার অভিযোগে পূর্ববাংলার কোন একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের নাম কেটে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার চিরকালের জন্য বঞ্চিত ক'রতে চান। যদিও তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহেব ও তাঁর আশ্রিত অনেক সদস্য ছিলেন, আশুতোষ-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় সে আদেশ গ্রাহ্য করে নাই। ফুলার এর পর পদত্যাগ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে সব বাংগালী ছাত্রকে অন্তরীন অর্থাৎ বিনা বিচারে আটক রাখা হয় তাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছাত্রবৎসল আশুতোষের আর একটি বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ। একটা দৃষ্টান্ত না দিলে তাঁর এই কাজের গুরুত্ব আজকের দিনে কেউ কেউ হয়ত বুঝতে পারবে না। প্রেসিডেন্সি কলেজের যে সব ছাত্র বিনা বিচারে আটক হন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র সিংহ একজন। ইনি এই কলেজ থেকে ১৯১৩ সালে আই-এসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯১৫ সালে বি-এসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে অন্তরীন অবস্থা থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯১৯ সালে ইউনিভারসিটি কলেজ অফ্‌ সায়েন্স থেকে ফলিত অংকশাস্ত্রে এম-এসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরূপ কৃতী ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতো যদি আশুতোষ দৃঢ়ভাবে ন্যায় বিচারের দাবী করে তাঁকে পড়তে ও পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ না দিতেন।

এইরূপ ছাত্রদের প্রতি পুলিশ কর্তারা কিরূপ অন্যায় আচরণ করতেন তা ১৯১৬ সালের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় 'কনডেমড্‌ আনহার্ড' (Condemned Unheard) প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি একজন সর্বোচ্চ বিদ্বান এবং বিখ্যাত শিক্ষানেতার লেখা। ইনিও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলি পাশ করেন এবং এই কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন।

১৯০৫ সালে বংগব্যবচ্ছেদের সংগে সংগে সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা দেশ। সেখানে প্রবল দমননীতি ও পুলিশরাজের প্রবর্তন হ'লো এবং সংগে সংগেই দেখা দিল গুপ্ত-সমিতি ও বোমার ষড়যন্ত্র। এই রকম গুপ্ত-সমিতি প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন ছাত্রদের উপর কোন

প্রভাব বিস্তার করেনি এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই কলেজের একজন মেধাবী ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সেন। আলিপুরের বোমার মামলায় ছাড়া পেয়ে ইনি লেখাপড়ায় মন দেন এবং ১৯১৩ সালের আই-এসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজে পড়ে বি-এসসি পরীক্ষা পাশ করেন কিন্তু কলেজ ছাড়বার আগই তিনি গুপ্ত-সমিতিতে যোগ দেন। পরে গুপ্ত-সমিতিরই একজন সহকর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে জীবন হারান। গুপ্ত সমিতির আরও কয়েক জন ছাত্র আমাদের ছাত্রজীবনে এই কলেজেই পড়তেন। তাঁরা সকলেই জীবিত সুতরাং তাঁদের নামোল্লেখ আশোভন হবে।

এই কলেজের স্বদেশীযুগের যে সব ছাত্র পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকাশ্য-ভাবে যোগ দেন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। ইনি ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত এই কলেজে পড়ে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এফ-এ, বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সৌভাগ্যক্রমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দান এখনও শেষ হয়নি। তাঁর সম্বন্ধে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যান্য ছাত্র ও শিক্ষকগণ যাঁদের স্বদেশীব্রতের উদ্‌যাপন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি তাঁদের কথা এ প্রবন্ধে উল্লেখ ক'রলাম না। এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না। বাংলার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৯১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ঠিক এক বছর এই কলেজে রসায়ন বিভাগে শিক্ষক ছিলেন।

এই যুগের প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন শিক্ষক ও একজন ছাত্রের কথা ব'লেই আমার এই নামের তালিকা শেষ ক'রবো। যে শিক্ষকের কথা বলতে চাই তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ইনি ১৮৮৯ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এই কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। ডিরোজিওর পরে এই প্রতিষ্ঠানের আর কোন শিক্ষক নিজের ছাত্রদের এবং ছাত্রস্থানীয়দের উপরে এত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। যৌবনে যে স্বদেশিকতা-মন্ত্র তিনি গ্রহণ করেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা তিনি পালন করেন। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকাশ্য ভাবে যোগ দেন।

আর যে ছাত্রটির কথা বলতে চাই তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা প্রত্যেক ভারতবাসী জানেন। সে কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানের যে ছাত্রবৃন্দ ভারতের পরাধীনতা অপসারণের জন্য সময়োপযোগী ব্যবস্থা করেছেন তন্মধ্যে সুভাষচন্দ্রের দানই সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন ও তাদের কার্যকলাপ দেখে বিচক্ষণ ইংরেজ-জাতির এই ধারণা হ'ল যে আর ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখা চলবে না। এই কারণেই হো'ক বা ইংরেজের অর্থনৈতিক

দুর্গতির জন্যেই হোক বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলেই হোক, অথবা এই সমস্ত কারণের সমবেত ফলরূপেই হোক, ভারত আজ স্বাধীনতার দ্বারে উপস্থিত।

যতদিন আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকবে, যতদিন তারা সমাজের দুর্নীতির উৎপীড়নে ও কঠোর দারিদ্র্যে জর্জরিত হ'বে, ততদিন বুঝতে হ'বে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিনি। এই পূর্ণাংগ স্বাধীনতার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ তাঁদের জ্ঞান, নিষ্ঠা ও সমগ্র কর্মশক্তি নিয়োজিত করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ছাত্রবৃন্দ যেন তাদের প্রতিষ্ঠানের এই গৌরবময় ইতিহাসের কথা সর্বদা স্মরণ রাখে। শুধু বাক্‌চাতুরী অথবা সাময়িক উত্তেজনাবশে কাজ করলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। দেশের স্বাধীনতা পূর্ণাংগ ও অটুট রাখতে হলে চাই অসীম জ্ঞান, অবিচলিত নিষ্ঠা ও অক্লান্ত কর্মশক্তি। আমার স্থির বিশ্বাস যে এই তিনটির যাতে কখনও অভাব না হয়, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা নীরবে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে।*

---

* এই প্রবন্ধ লিখতে নিম্নলিখিত চারখানি বই থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি :—

(১) প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টার ;

(২) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ;

(৩) মিস্ কলেট—'লাইফ এ্যাণ্ড লেটারস্ অফ্ রাজা রামমোহন রায়' (Sophia Dobson Collet—'Life and Letters of Raja Rammohan Roy' edited by Hem Chandra Sarkar, 1913);

(৪) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫২)। শেষোক্ত গ্রন্থকারের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। তবে তাঁর এই পুস্তকের যে সব খবর আগেই আমার জানা ছিল সেগুলির জন্য তাঁর পুস্তকের উল্লেখ করিনি। তাঁর আরও কয়েকটি প্রবন্ধ পড়বার কথা তিনি আমাকে ব'লেছিলেন। সময়াভাবে এ সুযোগ নিতে পারিনি।

ভারতের মুক্তি-সাধনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অবদান

[প্রথম পর্যায়]

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে বাংলার দানই বোধহয় সব চেয়ে বেশি। মৃত্যুঞ্জয়ী অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বাংলার যে সব সন্তান স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ট। বস্তুতঃ জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্রের মধ্যেই সব-প্রথম দেখা দিয়েছিল। আমরা বংকিমচন্দ্র এবং তাঁর পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা জাতির মুক্তির কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং প্রতিকৃতি ধারাবাহিকভাবে বের করতে মনস্থ করেছি। যতদূর সম্ভব ছাত্রাবস্থার প্রতিকৃতি আমরা প্রকাশ করতে চেষ্টা করবো। বর্তমান সংখ্যায় দশ জনের প্রতিকৃতি ও পরিচয় দেওয়া হল।

আমরা বিশেষ করে স্মরণ করতে চাই সেই সব প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকদের যাঁরা দেশের জন্যে চরম নির্যাতন বরণ করেছেন, অথচ যাঁদের কথা আজ বিস্মৃতির পথে; লোকচক্ষুর অন্তরালে, বাহবা পাওয়ার মোহ ত্যাগ করে দেশের জন্য জীবনপাত করেছেন এরকম কর্মীর দৃষ্টান্তও কম নয়। এরকম কোনও নাম যদি আমাদের পাঠকদের জানা থাকে, অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বাধিত করবেন। —সম্পাদক।

বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—জুন ২৬, ১৮৩৮; মৃত্যু—এপ্রিল ৮, ১৮৯৪। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ সালে বি-এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হল। ১৮৫৭ সালে এপ্রিল মাসে বংকিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এর পর আইন পড়তে পড়তে ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন। সবশুদ্ধ দশ জন ছাত্র ঐ বছর পরীক্ষা দেয়। বংকিমচন্দ্র এবং যদুনাথ বসু মাত্র ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বংকিমচন্দ্রই প্রথম হন। এর পরও বংকিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়তে থাকেন এবং ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে আইন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি গুণানুসারে তৃতীয় হন।

ভারতের জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরমে'র স্রষ্টা বংকিমচন্দ্র। ভাবের গভীরতায় এবং কল্পনার ব্যাপকতায় তাঁর এই সংগীত 'ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে' ধ্বনিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধ'রে। দেশ-মাতৃকার যে উজ্জ্বল চিত্র তিনি তাঁর সাহিত্য মারফৎ দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করেছেন, তা তাঁকে শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিক হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

বংকিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ভারতের মুক্তি সংগ্রামের মহামন্ত্ররূপে কাজ করেছে। এই মন্ত্র মুখে নিয়ে গত

পঞ্চাশ বছর ধরে শত শত দেশকর্মী চরম নির্যাতন সহ্য করেছে হাসিমুখে, অকম্পিত হৃদয়ে অগ্রসর হয়েছে পুলিশের লাঠি এবং মিলিটারির গুলির সামনে, যাত্রা করেছে আন্দামানের পথে, নির্ভীক চিত্তে আরোহণ করেছে ফাঁসির মঞ্চে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের মন্ত্রদাতারূপে আমরা তাঁকে স্মরণ করছি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

জন্ম—নভেম্বর ৫, ১৮৭০ ; মৃত্যু—জুন ১৬, ১৯২৫। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিত্তরঞ্জন এই কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৮৮ সালে ও ১৮৯০ সালে যথাক্রমে এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলাত যাত্রা করেন।

কলেজ-জীবন থেকেই চিত্তরঞ্জনের বাগ্মিতার উন্মেষ, প্রতিভার বিকাশ এবং দেশপ্রেমের স্ফূর্তি দেখা দেয়। তাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েও তিনি চাকরী গ্রহণ করেন নি। বিলেতে থাকার সময় জন ম্যাকলীনের ভারতীয়দের প্রতি কটূক্তির তেজঃপূর্ণ প্রতিবাদ করেন তিনি ; ফলে ম্যাকলীনকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল। এর পর গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের সভাপতিত্বে ভারত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। ১৮৯৩ সালে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশে। ছাত্রাবস্থায় বিলাত-প্রবাসকালে দাদাভাই নৌরজীর পার্লামেন্টে সদস্য নির্বাচন আন্দোলন উপলক্ষে রাজনীতিতে প্রথম হাতে-খড়ি হয় চিত্তরঞ্জনের। এদেশে ১৯০৫-৬ সালে বংগ-ভংগ আন্দোলনের সময় তিনি প্রকাশ্য রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। মাণিকতলা বোমা-মামলায় অরবিন্দকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে দেশব্যাপী খ্যাতি এবং অরবিন্দের বন্ধুত্ব অর্জন করেন। ১৯১৭ সালে তিনি ভবানীপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং সেই বছরই মৈমনসিং-এ একটি বক্তৃতায় বলেন, "দেশের কাজ আমার ধর্মের অংগীভূত। দেশ-সেবা আমার জীবনের সকল আদর্শের একটা অংশ। আমার দেশই আমার ঈশ্বর। দেশের কাজ—জাতির কাজই আমার কাছে মনুষ্যত্ব। নর-নারায়ণের সেবাই আমার ভগবানের সেবা।" অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই দেশ-সেবার জন্যে লাভের ব্যারিষ্টারি-পেশা পর্যন্ত ছেড়ে দেন তিনি। ১৯২১ সালে আমেদাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯২৫ সালে ফরিদপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার অধিবেশনে বক্তৃতাই সাধারণের কাছে তাঁর শেষ বক্তৃতা।

একদিকে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্যদিকে দেশবাসীর জাতীয় উন্নতি সাধন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে তিনি বহুবার তাঁর ওজস্বিনী ভাষা ব্যবহার করেছেন। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পুরোধা ছিলেন তিনি। তিনিই সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন ভারতবর্ষে একটি ফেডারাল গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্যে। 'হোম-রুল' আন্দোলনের গোড়াতেও ছিলেন তিনি, তাই ১৯১৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত-সনদের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, '...ইহা ভারতবাসীকে ভুলাইবার একটি আশ্বাস মাত্র।...ব্যুরোক্রেসি দেশীই হউক আর বিদেশীই হউক, ব্যুরোক্রেসিই থাকে। আমরা চাই গণ-শাসন, ভারতের কোটী কোটী প্রজার ইচ্ছানুসারে দেশের কার্য নির্বাহ হইবে—এমন হোমরুল আমি চাই।' স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন চিত্তরঞ্জন এবং আজীবন ছিলেন তার সভাপতি।

অসহযোগ-আন্দোলনের আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন মনে-প্রাণে। তাই ব্যারিষ্টারিতে বিরাট পসার, অতুল ঐশ্বর্য, রাজকীয় ভোগ-বিলাস সব মুহূর্তের মধ্যে ত্যাগ করে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন পথে ; প্রাসাদোপম অট্টালিকা পরিণত হল সেবা-সদনে। দেশবাসী মুগ্ধ হল এই ত্যাগের মহিমায়, তাই আখ্যা দিল তাঁকে 'দেশবন্ধু'।

জেলে থাকতেই তাঁর স্বাস্থ্য-ভংগ হয়। কারামুক্ত হয়েও আর সুস্থ হলেন না তিনি ; দার্জিলিং-এর শৈলাবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃতদেহ তাঁর মৃত্যুর দু'দিন পরে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। সেদিন

বংকিমচন্দ্র

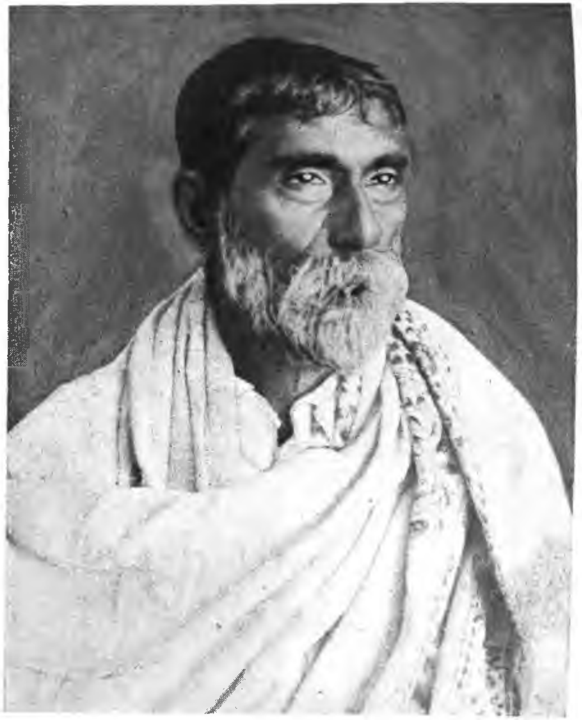

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ
(সতেরো বছর বয়সে)

[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

কলকাতায় একটি অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ নর-নারী যোগদান করে শ্মশান-যাত্রায়। জনতার এত বিশাল সমাবেশ পূর্বে আর কখন হয় নি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

জন্ম—আগষ্ট ২, ১৮৬১ ; মৃত্যু—জুন, ১৯৪৪। প্রথমে ছাত্র হিসাবে হেয়ার স্কুলে চার বৎসর ও এ কলেজে চার বৎসর এবং পরে দীর্ঘ তিরিশ বৎসর অধ্যাপকরূপে এই বিদ্যায়তনের সংগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ওতপ্রোত সম্বন্ধ ছিল।

"যে ব্যক্তির জীবনের অধিকাংশ সময় লেবরেটরি ও লাইব্রেরিতে কাটিয়াছে, এই বিশাল মহাদেশের সর্বত্র ঘুরিয়া সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ানো তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।"[১] প্রফুল্লচন্দ্রের শারীরিক অবস্থা এ ধরণের কাজের পক্ষে অনুকূল ছিল না। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সরকারী কর্মচারী। এ সব বাধা সত্ত্বেও দেশের জন্যে যতখানি কাজ তিনি করে গিয়েছেন, কোনও বিখ্যাত রাজনৈতিকের জীবনব্যাপী কাজের সংগে তুলনায় তা ম্লান হবে না।

ছাত্র-জীবন থেকেই তাঁর স্বদেশ-প্রীতি তাঁকে বিখ্যাত করে। বিলাতে ছাত্রাবস্থায় ১৮৮৫ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগ দেন তিনি। প্রবন্ধটি সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পরীক্ষকদের মন্তব্য ছিল, '……বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইহা শ্লেষপূর্ণ আক্রমণে পূর্ণ'। ১৯২১ হইতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বাংলার নানা স্থানে খদ্দরের প্রচলন এবং অস্পৃশ্যতা-বর্জন সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান এবং কয়েকটি জেলা-সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেন। কোকনদ-কংগ্রেসে (১৯২৫) তিনি প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৯ সালে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে তিনি এক বিশাল সভায় বক্তৃতা করেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদি সংকটে তিনি সর্বাগ্রে অগ্রসর হতেন আর্তদের ত্রাণ ও সাহায্যের কাজে।

প্রফুল্লচন্দ্রের দেশপ্রেমের প্রকৃত প্রকাশ হয়েছে তাঁর জীবনব্যাপী দেশোন্নতি সাধনায়। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন "যে সত্য কেবলমাত্র বাক্যে নিবদ্ধ, তদপেক্ষা যে সত্য জীবনে পালিত হয় তাহা ঢের বেশী শক্তিশালী"।[২] তাই দেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন তিনি জীবনের ব্রত বলে মেনে নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর খদ্দর-আন্দোলনকে তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু অপেক্ষা করতে পারেনা স্বরাজ'। তাই দেশের কাজকে সব সময়েই তিনি সর্বাগ্রে গ্রহণ করতেন। 'বাংলার জ্ঞান-রাজ্যে নব জাগরণের' মূলে তাঁর দান কম নয়। বস্তুতঃ দেশের বর্তমান বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী তাঁরই উত্তর-সাধকদল। বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাহায্য অপরিমিত ছিল। দেশের শিল্পোন্নতি সাধনায় তিনি স্থাপন করেন 'বেংগল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' এবং বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন 'কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্', 'বেংগল এনামেল ওয়ার্কস্' ইত্যাদি বহু দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সংগে। ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূর্ত প্রতীক 'সাধারণের সম্পত্তি' এই মনীষী দেশের সেবাতেই নিজের জীবন ক্ষয় করেছিলেন'।[৩] 'কঠোর ব্রহ্মচর্যপূত অনাড়ম্বর জীবনে' তাঁর 'দেশপ্রেমের ছিল না বাহ্য আড়ম্বর', তাঁর "'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থ ভারতীয় কীর্তিমালার এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে এবং তাহার ফলে নবীন বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন নাগার্জুনের ও চরকের সংগে জ্ঞান-রাজ্যে মৈত্রী স্থাপনের সুযোগ লাভ করিয়াছেন[৪]।"

(১) আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ২৩০; (২) ঐ, পৃঃ ১৩২।

(৩) নেচার, মার্চ ৬,১৯১৯। (৪) প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণোপলক্ষে প্রদত্ত বিদায় সম্বর্ধনাজ্ঞাপক অভিভাষণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম—মে ৬, ১৮৬১ ; মৃত্যু—আগষ্ট ৭, ১৯৪১। মাত্র একদিনের জন্যে হলেও এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথও এই বিদ্যায়তনের ছাত্র ছিলেন। অবশ্য তাঁর সংগে এ কলেজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় তাঁর পরবর্তী জীবনে। এ কলেজের ছোট-বড় অনেক অনুষ্ঠানেই তিনি যোগ দিয়েছেন এবং অনেক সময় নিজেই হতেন প্রধান উদ্যোক্তা।

'প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে।' তাই ভারতের ভাবধারার মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ ভারতের রাজনৈতিক গগনেও ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর দেশপ্রীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর অমূল্য সাহিত্যে—'রাজাপ্রজা', 'সমাজ', 'স্বদেশ', 'সমূহ' এবং স্বদেশী গানে। কংগ্রেসের জন্মের বহু পূর্বেই তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অহিংসার কথা বলেছেন দেশবাসীকে।

১৮৭৫ সালে 'হিন্দু মেলা'র অনুষ্ঠান হয় স্বদেশী ভাব প্রচারের উদ্দেশে। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লেখেন তাতেই পরাধীন ভারতের "ঘোর দুঃখ" তাঁকে কত দূর ব্যথিত করেছিল তার পরিচয় মেলে। তখন তাঁর বয়স মাত্র তের বৎসর। ১৮৮৯ সালে সর্বপ্রথম তিনি প্রকাশ্য রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেন। লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা দেন তিনি। ১৮৯১ সালে 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। 'সাধনা'র যুগ রবীন্দ্রনাথের জীবনে তীব্র স্বদেশ-প্রেমের যুগ। ১৮৯৩ সালে চৈতন্য লাইব্রেরিতে তিনি 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৯৯ সালে তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি প্রেস বিলের বিরুদ্ধে। এই সময়েই বুয়র যুদ্ধরত ঔদ্ধত্যপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সবল লেখনী ধরেন। ১৯০৫ সালে বংগ-ভংগের বিরুদ্ধে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে জানান প্রতিবাদ, দেশবাসীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করতে প্রচলিত করেন রাখীবন্ধন উৎসব, রচনা করেন একাধিক স্বদেশী সংগীত—যার একটিও যে কোনও সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে। ১৯০৬ সালে তিনি প্রচার করেন জাতীয় শিক্ষার আদর্শ। ১৯১৭ সালে এ্যানি বেশান্টের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তাঁর কণ্ঠ গর্জে ওঠে। ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথকে সন্দেহ করা হয় বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। ঐ বৎসরই ভারতীয় আদর্শে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিনিকেতনের। মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গ্রহণ করেন দেশ-প্রীতির এই নতুন আদর্শ। ১৯১৯ সালে ৩০শে মে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ তাঁর 'নাইট্' উপাধি ত্যাগ করে চিঠি লেখেন বড়লাটকে। ১৯২০ সালে লণ্ডনে ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি আলোচনা করেন তিনি। ১৯৩১ সালে হিজলী জেলের হত্যাকাণ্ডে তাঁর চিত্ত গভীরভাবে বিচলিত হয় এবং টাউনহলে ও ময়দানে এই নৃসংস কার্যের প্রতিবাদ জানান তিনি। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'প্রশ্ন' এই উপলক্ষেই লিখিত। ১৯৩৫ সালে টাউনহলে এক মহতী জনতায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৮ সালে রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করে এক বাণী দেন তিনি। অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে 'ইংরেজ-সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর' ভারতের বুকে চিরকাল চেপে থাকতে পারবে না—এই আশা প্রকাশ করেন তিনি এবং বলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হ'বে"। এর কিছুদিন পরে মিস্ র‍্যাথবেনের ভারতের প্রতি অশিষ্ট উক্তির সতেজ উত্তর দেন তিনি ; 'কল্যাণের অভিভাবকত্বের ছলে' ইংরেজ যে ভারতে 'চরম বিশ্বাসঘাতকতার নজীর' দেখিয়েছে, জগতের কাছে সেকথা তিনি জানান দৃপ্ত কণ্ঠে। তাঁর 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' গানটি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়-সংগীত।

বিপ্লবী বীর শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্ত

জন্ম—এপ্রিল, ১৮৮৫। শ্রীযুক্ত উল্লাসকর এই কলেজে ১৯০৪-৫ সালে এফ্-এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। আদালতের জবানবন্দী থেকে জানা যায়, এঁর বাড়ী ত্রিপুরার অন্তর্গত কালিকচ্ছ গ্রামে। পিতার নাম দ্বিজদাস

দত্ত; ইনি সরকারী বৃত্তি পেয়ে বিলাত থেকে কৃষি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে এদেশে সরকারী কর্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই এঁর তেজস্বিতার প্রকাশ দেখা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে ভারতীয়-বিদ্বেষী অধ্যাপক রাসেল সাহেবের এদেশীয়দের প্রতি অশিষ্ট উক্তির প্রতিবাদ করেন উল্লাসকর। ফলে তাঁকে এই কলেজ পরিত্যাগ করতে হয়। এমন কি পুত্রের অপরাধে তাঁর পিতাকেও সরকারী কর্ম থেকে বিদায় দেওয়া হয়।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা থেকেও এঁর তেজস্বিতা এবং স্বাজাত্যভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। ষ্টার থিয়েটারে এ্যানি বেশাণ্ট্ এক বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতা শুনবার জন্য অত্যধিক ভীড় হয়। শ্বেতাংগ অশ্বারোহী সৈনিকেরা লাঠির আঘাতে ভীড় দমনের চেষ্টা করে। উল্লাসকর তাই দেখে এগিয়ে যান এবং শ্বেতাংগ সৈনিকের সংগে তাঁর একচোট হাতাহাতি হয়। তখনকার দিনে এ ধরণের ব্যাপার বড় সাধারণ ছিল না।

কলেজে অধ্যয়নকালেই শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষের সংগে এঁর পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ তখন তাঁর বিখ্যাত 'যুগান্তর' দল গঠন করছেন। এই দলের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসকে (কানুনগো) গোপনে প্যারিসে পাঠানো হয় বোমা তৈরীর কাজ শিখবার জন্যে। এদিকে শ্রীযুক্ত উল্লাসকর নিজের বাড়ীতে অতি গোপনে—এমন কি বাড়ীর লোকজনেরও অজ্ঞাতে—একটি লেবরেটরি করে সেখানে বোমা তৈরীর গবেষণা চালাতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই ইনি সাফল্যলাভ করেন। এই দিক থেকে এদেশে ইনিই সব-আগে বোমা তৈরী করেন। হেমচন্দ্র তখনও প্যারিসে। নতুন আবিষ্কারের কথা ইনি শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষকে জানান। উল্লাসকরের বয়স তখন মাত্র ২১ বছর। এঁকে তখন বারীন ঘোষ তাঁর গুপ্ত সমিতির সভ্য করে নেন। এঁরা দু'জন ছাড়া এই সমিতিতে ছিলেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীইন্দ্রভূষণ রায়, শ্রীপ্রফুল্ল চাকী এবং শ্রীবিভূতি সরকার। বাহ্যতঃ এঁরা একটি আশ্রম খোলেন। সেখানে গীতাপাঠ এবং অন্যান্য ধর্মালোচনা হত। বহু লোক এই আশ্রমের প্রতি অনুরক্ত ছিল—এমন কি একজন পুলিশ-অফিসার পর্যন্ত। ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে বিস্ফোরক দ্রব্য এবং বোমা তৈরী। ১১ই এপ্রিল, ১৯০৭ সালে চন্দননগরের লাট সাহেবের ট্রেন্ উড়িয়ে দেবার জন্যে উল্লাসকর রওনা হন নিজের তৈরী একটি বোমা নিয়ে। কিন্তু ট্রেন্‌টি নির্দিষ্ট সময়ের আগে এসে পড়ায় বোমাটির বিস্ফোরণ ঠিকমত হয় না। ডিসেম্বর মাসে (১৯০৭) খড়্গপুরের কাছে নারায়ণগড়ে এঁরই তৈরী বোমা ব্যবহার করেন বারীন ঘোষ এবং প্রফুল্ল চাকী; মজঃফরপুরে প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু যে বোমা ব্যবহার করেন তাও এঁদের কারখানাতেই তৈরী হয় হেমচন্দ্রের দ্বারা।

১৯০৮ সালের ২রা মে এঁদের ৩২নং মুরারিপুকুর রোডস্থ বাড়ী খানাতল্লাস করা হয়। তল্লাসীর সময় পুলিশ অমানুষিক নির্যাতন করে নির্দোষ ব্যক্তিদের। তাতে বিচলিত হয়ে এঁদের পরামর্শমত বারীন ঘোষ সত্যিকারের দলপতিদের নাম জানান পুলিশকে। দায়রা বিচারে শ্রীযুক্ত ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত উল্লাসকরের দোষই সব-বেশি প্রমাণিত হয়। এঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে আপীলে এঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আন্দামানে দ্বীপান্তর-থাকাকালীন অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয় এঁদের। উৎপীড়নের কঠোরতায় শ্রীযুক্ত উল্লাসকর কিঞ্চিৎ বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে পড়েন, এমন কি একদিন উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করেন। ১৯১৯ সালে যুদ্ধের পর বন্দীমুক্তি আদেশে এঁরা অব্যাহতি পান।[১]

শ্রীযুক্ত উল্লাসকর এখন ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অত্যন্ত দুঃস্থ ভাবে জীবন যাপন করছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে নিজের হাতেই রান্না-খাওয়া সব কিছু করতে হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যিনি দেশের কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত করেছেন, দেশবাসীরা কি তাঁকে এখনও ভুলে থাকবে? সরকারেরও কি কোন কর্তব্য নেই এঁর প্রতি? আমাদের কলেজেরও নিশ্চয় এঁর প্রতি একটা কর্তব্য আছে। এ বিষয়ে অন্যত্র প্রকাশিত য়ুনিয়নের সহঃ সভাপতির আবেদন দ্রষ্টব্য।

---

(১) এই সব তথ্য-সংগ্রহের কাজ সাহায্য পেয়েছি শ্রীযুক্ত প্রভাত গংগোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।—সম্পাদক।

শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ

জন্ম— ১৮৮৪ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতি ছাত্রদের মধ্যে রাজেন্দ্র প্রসাদ একজন। ১৯০ হইতে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজে অধ্যয়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি উচ্চ স্থা অধিকার করেছেন। এফ্.-এ পরীক্ষাতে তিনি 'ডাফ্ স্কলারশিপ' এবং অন্যান্য কয়েকটি পুরস্কার পান ইংরেজি এবং ইতিহাসে বি-এ পরীক্ষায় তিনি 'ঈশান স্কলারশিপ' পান। ইংরেজিতে এম্.-এ উপা লাভের পর ইনি আইন অধ্যয়ন করেন এবং ১৯১৫ সালে এম্.-এল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

পাটনা হাইকোর্টে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ আইনজীবী হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। সেখানে তাঁ বিচারপতি করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু অর্থ এবং সম্মানের মোহ ত্যাগ করে তিনি আত্মনিয়োগ করেন দেশে কাজে এবং বহুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯১২ সাল থেকেই তিনি বিহারে কংগ্রেসের কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট হন অনেকবার তিনি বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রী সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন দু'বার। বিহার ছাত্র সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাও করেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ১৯ সালে বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপাতিত্ব করেন এবং ১৯৩৪ সালে বোম্বাই অধিবেশনে তিনি নির্বাচি হন রাষ্ট্রপতি। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলে তিনি আবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ভারতী গণপরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতের জাতীয় সরকারে ইনি খাদ্য ও কৃষি-সচিব। গত মাসে জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপানলী পদত্যাগ করলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচি হয়েছেন। কংগ্রেস-পরিচালকমণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট সভ্য তিনি।

রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই একনিষ্ঠ গান্ধীপন্থী হিসাবে ইনি বিখ্যাত। চম্পারণ সত্যাগ্রহ এঁর জীবনের এক গৌরবময় কীর্তি। বিহারে সদাকৎ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ইনি জনসেবার একটি পথ দেখিয়েছেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনন্যসাধারণ প্রতিভা, গভীর দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞান এবং সেবা ও মমতায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করেছেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

জন্ম—১৮৮৯ সাল। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কটক র‍্যাভেন শ কলেজ থেকে এই কলেজে যোগ দেন ১৯০ সালে এবং ১৯০৮ সালে এই কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম্-এ উপাধি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় ইনি ছাত্র মহলে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন এবং এক বৎসরের জন্যে এ কলেজের কমন-রুমের সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন।

১৯১৩ সালে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শরৎচন্দ্র আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। কালক্রমে তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবীদের অন্যতম বলে পরিগণিত হন। দেশের কাজে আত্মনিয়োগ না করলে শরৎচন্দ্র প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারতেন; কিন্তু অর্থের মোহ তাঁর দেশপ্রেমকে ম্লান করতে পারে নি। তখন থেকেই কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে দেশের কাজের সংগে তিনি সংশ্লিষ্ট। কলকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান (১৯২৪) এবং বংগীয় ও ভারতীয় আইনসভার প্রতিনিধি হিসাবে দীর্ঘকাল তিনি দেশসেবা করে এসেছেন। দেশের জন্য বহু নির্যাতন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। ১৯৩২ সালে ১৮১৮ সালের তিন-আইন অনুসারে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে মুক্তি লাভ করে পুনরায় তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এবং বহুবার কংগ্রেস-কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য মনোনীত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি বংগীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন এবং কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব করেন। তারপর ১৯৪১ সালে তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলায় গঠিত হল প্রগতি-পন্থী যুক্তমন্ত্রিসভা। মন্ত্রিদের শপথ গ্রহণের আগেই আবার আটক করা হয় তাঁকে। দীর্ঘ চার বৎসর-

ছাত্রাবস্থায় চিত্তরঞ্জন
(আঠারো বছর বয়সে)
[শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ রায়ের সৌজন্যে

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

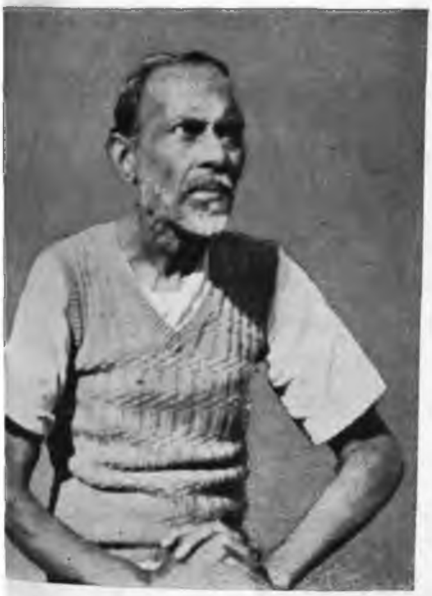

শ্রীউল্লাসকর দত্ত
[ফটো—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দে

সন্তোষকুমার মিত্র
[শ্রীযুক্ত পান্নালাল মিত্রের সৌজন্যে

বামে—

ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্র

(১৯১৯ সালে)

[শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সৌজন্যে]

দক্ষিণে—ছাত্রাবস্থা অন্তে

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

(তেইশ বছর বয়সে)

[শ্রীমান্ সুব্রত বসুর সৌজন্যে]

কাল কারাদণ্ড ভোগের পর ১৯৪৫ সালে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি হাওড়ায় এক বিশাল জনসভায় এক সতেজ বক্তৃতা করেন। বাংলা-দেশ পুনরায় তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলে বরণ করে নেয়। এর পরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়ে শরৎচন্দ্র সরকার বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। এই সময়ে প্রাক্তন আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক কাজ-কর্মের ভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। ভারতে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি খনি, বিদ্যুৎ এবং পূর্ত সচিব নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে উক্ত পদ পরিত্যাগ করে দুর্গত বংগবাসীদের নির্যাতন লাঘবের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই উপলক্ষেই কংগ্রেসের সংগে তাঁর মতবিরোধ ঘটে এবং কংগ্রেস-কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি একটি নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গঠনে ব্যাপৃত।

সুভাষচন্দ্র বসু

জন্ম—জানুয়ারি ২৩, ১৮৯৭। মৃত্যু—অনিশ্চিত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সুভাষচন্দ্র ১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সুভাষচন্দ্রের তেজস্বিতা, গঠনমূলক কার্যে দক্ষতা এবং দেশ-প্রীতির উন্মেষ দেখা দেয়। এই সময়ে তিনি মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যোগ দেন। কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন করে দেশসেবা ও ধর্ম-জীবন যাপন করাই ছিল এই দলের আদর্শ। এ আদর্শ তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করেছেন। এই সময় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসুর সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯১৫ সালে প্রথম বিভাগে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি এবং দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজেই বি-এ পড়তে থাকেন। তিনি কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটুটে আণ্ডার-সেক্রেটারি-রূপে এবং কলেজের বিভিন্ন বিভাগের (পূর্ণ বিবরণ তৎকালীন কলেজ-পত্রিকায় পাওয়া যাবে) ভার গ্রহণ করে তিনি ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট পরিচিত হন। এই সময়ে ভারতীয়-বিদ্বেষী অধ্যাপক ওটেন সাহেবের সংগে সুভাষচন্দ্রের দলের এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ফলে সুভাষচন্দ্রকে এই কলেজ পরিত্যাগ করতে হয়। কিছুদিন পরে তিনি 'য়ুনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে' যোগদান করেন। এদেশে শিক্ষাগ্রহণ শেষ করে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং মাত্র আট মাস পরে আই-সি-এস পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কথিত আছে অনুবাদ-পরীক্ষায় একটি বাক্য ছিল, "Indian sepoys are dishonest ··" ; এর তীব্র প্রতিবাদ করেন সুভাষচন্দ্র। এই সময়ে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলনের আহ্বানে সুভাষচন্দ্র সাড়া দেন তাঁর আই-সি-এস ডিপ্লোমা পরিত্যাগ করে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের কাছে স্বদেশ-সেবার মন্ত্র নেন। তখন অসহযোগ আন্দোলন চলেছে পূর্ণোদ্যমে। চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রকে ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই সময়ে কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রচারের কাজে সুভাষচন্দ্র অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর তিনি কলকাতায় একটি পূর্ণাংগ হরতাল পরিচালনা করেন। ফলে তাঁকে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। মুক্তি পেয়ে সুভাষচন্দ্র আর্তসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং উত্তরবংগ-প্লাবন-সাহায্য-সমিতির সম্পাদক হন। এর পর তিনি চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য-দলে যোগ দেন। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। কিন্তু ছ'মাস পরেই তিনি কারারুদ্ধ হন এবং মান্দালয়ে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য করে সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে রাজি হন—ভারত ত্যাগ করে তাঁকে অন্যত্র যেতে হবে, মাত্র এই সর্তে। সুভাষচন্দ্র ঘৃণার সংগে সরকারের এই করুণা প্রত্যাখ্যান করেন। দীর্ঘ আড়াই বছর পরে ১৯২৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯২৮ সালে তিনি মহারাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের স্বেচ্ছাসেবক দলের 'জি-ও-সি'র কার্য করেন। এই উপলক্ষে কংগ্রেসের সভাপতির শোভাযাত্রায় সুভাষচন্দ্র যখন সামরিক বেশে স্বেচ্ছাসেবক দল পরিচালনা করেন, তখন অনেকে তাঁকে উপহাস করেছিলেন। পরে যখন অনুরূপ

বেশে তিনি আজাদ হিন্দ দল পরিচালনা করেন তখন সেই উপহাস বিস্ময়ে পরিণত হয়। ১৯২৭-১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বংগীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক হন। ১৯২৯-১৯৩১ সালে তিনি ট্রেড্ য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি থাকেন। ১৯২৯ সালে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনার ফলে তাঁকে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কারাবাসে থাকাকালেই তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩১ সালে পুনরায় ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় তাঁকে। ১৯৩২ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৮১৮ সালের তিন-আইন অনুসারে। জেলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা যায় এবং রাজবন্দী হিসাবে তাঁকে ভিয়েনা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিঠলভাই প্যাটেলের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রাগ্‌ল্' রচনা করেন। ১৯৩৬ সালে আইন অমান্য করে তিনি ভারতে আসেন এবং কারারুদ্ধ হন। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯৩৮ সালে তিনি ইংলণ্ডে যান ভারতের রাজনৈতিক আলোচনা সম্পর্কে সেখানকার নেতাদের সংগে আলোচনার জন্যে। সেখানে ডি-ভ্যালেরার সংগে তাঁর পরিচয় হয়। এই সময়ে তিনি ঘোষণা করেন, "আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা"। ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর পর কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে প্রতিপক্ষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং কিছুদিন পরে পদত্যাগ করেন। কয়েক দিন পরে তিনি বিখ্যাত অন্ধকূপ-স্মৃতিস্তম্ভ-উৎপাটন আন্দোলন চালান এবং সাফল্য লাভ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। এই সময়ে "ফরোয়ার্ডে" একটি প্রবন্ধ এবং মহম্মদ আলি পার্কের জনসভায় বক্তৃতার জন্য তিনি স্বগৃহে বন্দী হন। ১৯৪১ সালের স্বাধীনতা দিবসে রহস্যজনকভাবে তিনি অন্তর্ধান করেন। পুস্তুভাষী মৌলভীর ছদ্মবেশে তিনি আফগানিস্তানে যান। সেখান হইতে বার্লিন হইয়া টোকিও যাত্রা করেন। এই সময়ে বেতার মারফৎ তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে থাকেন। ১৯৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারি তিনি 'ফ্রিস্ ইণ্ডিয়েন্' বাহিনীর ভিত্তি পত্তন করলেন। এই সময়ে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে পূর্ব এশিয়ায় গড়ে ওঠে আজাদ হিন্দ সেনাদল। সুভাষচন্দ্র সেখানে আসেন এবং চরম সংকটের সময়ে ঐ সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সুদূর মণিপুর পর্যন্ত এর আয়তন বিস্তৃত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নয়টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংগে এর কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রসদাভাবে এই স্বাধীন রাষ্ট্রের জীবনকাল দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির অধিবাসীকে তিনি তাঁর মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত করে একসূত্রে যেভাবে আবদ্ধ করেছিলেন, ভারতের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

ভারতের স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের কীর্তি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজীর পর বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ সংগ্রামে আর কেউ অবতীর্ণ হননি। ইংরেজের আশু ভারত ত্যাগের প্রধান কারণগুলির মূলে রয়েছে সুভাষচন্দ্রের সংগ্রাম। দিল্লীর ইতিহাস-বিখ্যাত লালকেল্লার শীর্ষে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করবার যে-স্বপ্ন তাঁকে এবং তাঁর সেনাদলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

শহীদ সন্তোষকুমার মিত্র

জন্ম—১৯০০ সাল; মৃত্যু—সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৩১। ১৯১৫ সালে হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সন্তোষকুমার এই কলেজে প্রবেশ করেন। ইনি সুভাষচন্দ্রের সতীর্থ ছিলেন। ১৯১৯ সালে ইনি এই কলেজ থকে দর্শনশাস্ত্রে বি-এ উপাধি লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থায় সন্তোষকুমার তাঁর মিশুক প্রকৃতির জন্য সবার প্রিয় ছিলেন। খেলা-ধূলাতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। ছাত্রদের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল প্রচুর। কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে তিনি সুভাষচন্দ্রের

ছাত্রাবস্থায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ

[ছবিখানি আমাদের কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র এবং ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ছবিখানি ১৯০৬-৭ সালে গৃহীত। মধ্যস্থলে তৎকালীন ইংরেজি সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেব উপবিষ্ট। তাঁর ঠিক পিছনেই শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ দণ্ডায়মান। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনকে ঐ সারির প্রথমেই (বাঁ দিক থেকে) দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য সমপাঠীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে নানাদিকে বিখ্যাত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রথম সারিতে দ্বিতীয় স্থানে উপবিষ্ট হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।]

প্রধান মন্ত্রীর কলেজ পরিদর্শন উপলক্ষে গৃহীত ছবি

সংগে 'আণ্ডার সেক্রেটারি' বা অধস্তন-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এম-এ পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্বে তিনি কলেজ ছেড়ে যোগ দেন আইন-অমান্য আন্দোলনে। চৌরি-চৌরা ব্যাপারে মহাত্মাজীর আন্দোলনের ব্যর্থতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে ভিন্ন উপায়ে দেশোদ্ধারের কার্যে। তাই তিনি গঠন করেন বিপ্লবী দল। কিন্তু কাজে বেশীদুর এগুনোর আগেই তিনি কারারুদ্ধ হন আলিপুর-ষড়যন্ত্রের মামলায়। অন্য সকলে মুক্তি পেলেও তাঁকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত আটকে রাখা হয় ১৮১৮ সালের তিন-আইন অনুযায়ী। জেল থেকে ইনি এম-এ এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মুক্তি লাভের পর সন্তোষকুমার কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে কংগ্রেস-সভাপতির সগে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। তাঁর পরিচালনাধীনে একলক্ষ মজুরের একটি শোভাযাত্রা তাদের দাবী জানায় কংগ্রেসের কাছে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৮ বৎসর। ঐ সময়েই তাঁর চেষ্টায় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রথম সভা হয়। বাংলার যুব আন্দোলনের প্রবর্তন করেন তিনিই। ১৯২৯ সালে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁরই চেষ্টায় কংগ্রেস সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করে। এর পর কয়েক বছর এই সংকল্পকে কাজে পরিণত করার জন্যে তিনি দেশের স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়ান। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংগে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন সন্দেহে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করে। কিছুদিন আত্মগোপন করবার পর তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং হিজলী বন্দী-শিবিরে নীত হন।

হিজলী বন্দী-শিবিরে কর্মকর্তাদের সংগে রাজনৈতিক বন্দীদের মতানৈক্যের ফলে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আক্রমণ করে বন্দীদের। সন্তোষকুমার অসুস্থ শরীরেও যান বাধা দিতে। ফলে পুলিশের গুলীতে তিনি নিহত হন। বাংলার শক্তিমান সন্তানদের মধ্যে যাঁরা দেশের কাজে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন, সন্তোষকুমার তাঁদেরই একজন। মাত্র ৩১ বৎসর বয়সেই তাঁর দেশসেবা তাঁকে বিখ্যাত করেছিল দেশবাসীর কাছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

জন্ম—১৮৯৫ সাল। ছাত্রাবস্থায় প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর মেধার জন্যে পরিচিত হন সকলের কাছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সংগে তাঁর সংযোগ শিক্ষক হিসাবে। ছাত্র-জীবন শেষ করে তিনি তাঁর কর্ম-জীবন আরম্ভ করেন এই কলেজেই। ১৯১৯ সালে তিনি রসায়নের অধ্যাপনার জন্যে নিযুক্ত হন এই কলেজে। এই কলেজে থাকবার সময়ই তিনি তাঁর গবেষণার জন্যে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। দেশের কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ না করলে তিনি একজন খ্যাতনামা রাসায়নিক হতে পারতেন। ১৯২০ সালে তিনি টাঁকশালে উচ্চবেতনে সহকারী 'অ্যাসে মাষ্টার' নিযুক্ত হন। কিন্তু সরকারী চাকরীর মোহ এবং অর্থের লোভ ত্যাগ করে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আবেদনে অসহযোগে আন্দোলনে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে দেশসেবার জন্যে তিনি বিখ্যাত 'অভয় আশ্রম' স্থাপন করেন। বংগীয় স্বেচ্ছাসেবকদল বে-আইনী ঘোষিত হলে ১৯২২ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পাবার পর তিনি বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারি হন। ১৯৩০ সালে তিনি কাঁথিতে লবণ-আন্দোলন চালান পূর্ণোদ্যমে। ফলে তাঁর জেল হয় আড়াই বছরের জন্যে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর তিনি মুক্তি পান কিন্তু ১৯৩২ সালে আবার কারারুদ্ধ হন এক বছরের জন্যে। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হওয়ার দরুণ তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় তাঁকে। আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যে তাঁকে কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ছিলেন শ্রীযুক্ত ঘোষ। তাই আচার্যের বাসস্থান খুলনাস্থ রাড়ুলি গ্রামে শ্রীযুক্ত ঘোষ খাদি ও চরকা প্রচলন এবং অন্যান্য প্রকারের দেশ সেবার কাজে অগ্রসর হন। ভারতীয় শিল্প সংঘের বাংলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভ্য হিসাবেও তিনি কাজ করেন।

১৯৩৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্র কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন এবং কয়েক মাসের বিরতি ছাড়া সেই থেকে তিনি ঐ পদে আছেন। ১৯৪০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন তিনি এক বছরের জন্য এবং ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের পর পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৫ সালের ১২ই জানুয়ারি তিনি মুক্তিলাভ করেন।

একনিষ্ঠ আদর্শবাদ ও অসামান্য চরিত্রবল্ গুণে এবং আত্মত্যাগী কর্মী হিসাবে শ্রীযুক্ত ঘোষের নাম প্রত্যেক কংগ্রেস-সেবীর কাছে সুপরিচিত। বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থায় পশ্চিম বংগের প্রধান মন্ত্রী হিসাসে শ্রীযুক্ত ঘোষ ইতি-মধ্যেই বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ একনিষ্ঠ গান্ধীপন্থী এবং গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্যসূচীকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন।

ইতিহাস

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ (পরীক্ষার্থী), ইতিহাস

ইতিহাসের সংজ্ঞা লইয়া এক সময় পণ্ডিত-মহলে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। বিতর্ক যে এখনও শেষ হইয়াছে তাহা নয়, তবে বিতর্কের ফলে ইতিহাসের পরিধি যে অনেক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাস বলিতে এখন শুধু রাজনৈতিক ইতিহাসই বুঝায় না, ইতিহাস বলিতে মানব-সমাজের সমগ্র জীবনের ইতিহাস বুঝায়। আদিম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যে সকল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া মানব-সমাজ অগ্রসর হইয়াছে সেই স্তরপরম্পরার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ, এক স্তর হইতে আর এক স্তরে অগ্রগতির কারণ আবিষ্কার, প্রত্যেক স্তরের উপযোগী ভাবধারা প্রভৃতি অনুধাবন—এই সমস্তই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আজকাল পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাস বলিতে সোজা কথায় *মানব-সমাজের বিবর্তনের কাহিনী* বুঝিতে হইবে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আর একটু প্রসারিত করা যায় কি? ইতিহাস যদি মানব-জাতির সমগ্র জীবনের কাহিনী হয় তবে বলিতে হয় যে সমাজ গঠনের পূর্ববর্তী যুগে মানবজাতির জীবন-ধারা কিরূপ ছিল তাহা অনুসন্ধান করাও ঐতিহাসিকের কর্তব্য। পৃথিবীতে মনুষ্য-জীবন কত বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু ইহা তো নিশ্চিত যে মানুষের সমাজ-গঠনের পূর্ববর্তী যুগ তাহার পরবর্তী যুগ অপেক্ষা দীর্ঘতর। সুতরাং এই বিরাট যুগ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা না থাকিলে মানব-জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিবে। প্রশ্ন হইতেছে যে এই জ্ঞান অর্জন করার দায়িত্ব কি ঐতিহাসিকের, না প্রত্নতাত্ত্বিকের, না জীবতাত্ত্বিকের। প্রত্নতত্ত্বকে ইতিহাসের অংগ হিসাবেই আমরা বিবেচনা করিব। বস্তুতঃ প্রাগৈতিহাসিক

যুগ (Pre-historic age সম্পর্কে গবেষণা করিয়া তাহাকে ঐতিহাসিক যুগের গণ্ডীর ভিতর আনার প্রচেষ্টা ঐতিহাসিকগণ করিতেছেন। এই প্রচেষ্টায় সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হইতেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের আলোচনা-পদ্ধতিতে যে যুগের জীবনধারার চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় না সেই যুগ সম্পর্কে কি করা যাইবে ? সেখানেই জীবতাত্ত্বিকের প্রয়োজন। প্রত্নতাত্ত্বিক-যুগেরও পূর্ববর্তী যুগে মানব-জীবন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিতে একমাত্র জীবতাত্ত্বিকই সমর্থ। কিন্তু এখানেও ঐতিহাসিকের কর্তব্য আছে। বস্তুতঃ এই যুগের ঐতিহাসিক হইবেন জীবতত্ত্ববিৎ। সমগ্র মানবজীবনের ইতিহাস যিনি রচনা করিবেন তাঁহাকে একাধারে জীবতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং প্রচলিত ধারণানুযায়ী ঐতিহাসিক হইতে হইবে।

এই প্রসংগে বিখ্যাত মনীষী হারবার্ট জর্জ ওয়েলসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ওয়েলস তাঁহার Outline of History গ্রন্থে ইতিহাসের এই ব্যাপ্তি মানিয়া লইয়াছেন এবং পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হইতে তাঁহার কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার Glimpses of World History পুস্তকের গোড়ার দিকে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি, মানুষের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভংগীকে আর একটু প্রসারিত করিলে মানব-জীবনকে সাধারণভাবে প্রাণের এক বিশেষ প্রকাশ হিসাবে দেখা যায় এবং পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি ও বিকাশধারার এক অধ্যায় হিসাবে মানব-জীবনকে কল্পনা করা প্রয়োজন হয়। পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টি কেমন করিয়া হইয়াছে বিজ্ঞান আজও তাহার সন্ধান দিতে পারে নাই, সুতরাং প্রাণসৃষ্টির অতীত যুগ সম্পর্কে কোন ধারণা করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা হউক, ইতিহাসের ক্রমিক পরিধি বিস্তারের যে আভাস আমরা দিয়াছি, তাহা হইতেই এই বিস্তারের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা করা যাইবে। প্রথমতঃ ইহার ফলে মানবজীবনের একত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়, আমরা মনে মনে জীবনের বিবর্তনের একটা চিত্র কল্পনা করিতে পারি এবং বিবর্তনের ধারার সহিত নিজেদের সম্পর্ক ও সংযোগ অনুভব করিতে পারি। 'সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জীবনস্রোত চলিয়া আসিতেছে আমি তাহারই এক অংশ' এইরূপ অনুভূতি হইলে সেই জীবনস্রোতকে সমৃদ্ধ করিবার বাসনা জাগে, জীবনে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিগত সাফল্য বা ব্যর্থতা অপেক্ষা সমগ্র সামাজিক জীবনের সমৃদ্ধি চিন্তার বিষয় হয়। অর্থাৎ এই প্রসারিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী আমাদিগকে এক নৈর্ব্যক্তিক আদর্শবাদের দিকে পরিচালিত করে। দ্বিতীয়তঃ এই দৃষ্টিভংগীর ফলে সমগ্র মানব-জীবনের অগ্রগতির বিরুদ্ধে যে সকল শক্তি কাজ করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামস্পৃহা জাগে, সামাজিক জীবনের সংস্কার ও পুনর্গঠন করিবার জন্য হৃদয়ে আবেগের সঞ্চার হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে বর্তমান যুগে এইরূপ দৃষ্টিভংগীর বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান যুগে দুইটি প্রধান

সমস্যা হইতেছে আন্তর্জাতিক শান্তি সংরক্ষণ এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন। এই দুইটি সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু বাস্তব জগতেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, ভাবজগতেও সংগ্রাম করা প্রয়োজন হইবে। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যে দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন, মানব-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব তাহার একটি অপরিহার্য অংগ। আমরা যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগীর কথা বলিয়াছি তাহাই মানব-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার করিতে সমর্থ।

এখন আমরা সমাজ-গঠনের পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব। মানুষের সামাজিক যুগের ইতিহাস রচনা করিবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি, মানুষের সামাজিক বিবর্তনের সম্পূর্ণ চিত্র কি করিয়া অংকিত করা যায় তাহাই প্রথমে আলোচনা করিব। বিবর্তন কথাটার অর্থ প্রথমেই বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বিবর্তন শব্দের ভিতর পরিবর্তন ও গতির ভাব নিহিত আছে। সামাজিক বিবর্তনের অর্থ হইতেছে বিভিন্ন স্তরের সমাজের মধ্য দিয়া বর্তমান যুগের শিল্পপ্রধান সমাজে মানুষের কর্মজীবনের পরিণতি। বিবর্তনের দৃষ্টিভংগী হইতে ইতিহাস বিচার করিলে সহজেই দেখা যায় যে ঐতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য হইতেছে তিনটি। প্রথমতঃ তাঁহাকে সন্ধান করিতে হইবে যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজের যে পরিবর্তন দেখা যায় তাহাদের কারণ কি? যেমন, খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন কি সাড়ে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে মিশরে যে ঐক্যবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তৎপর মিশরীয় সভ্যতার যে বিকাশ আরম্ভ হইল, তাহার কারণ কি? ঐক্যহীন, পরস্পরের সহিত সংগ্রামরত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিশরীয় রাষ্ট্রসমূহের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিবর্তন এবং সেই সংগে সমাজবন্ধনের দৃঢ়তা লাভ, তৎসহ মিশরীয় শিল্পের উন্নতি এবং পরলোক সম্বন্ধে চিন্তার প্রকাশ—এই সমস্ত মিলিয়া যে সমগ্র জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করি, তাহা কেমন করিয়া অসিল? তাহা কি স্বতঃস্ফূর্ত, অথবা এক অজ্ঞেয় বিশ্বশক্তির আত্মপ্রকাশ? পূর্ববর্তী সমাজ-জীবনের সহিত তাহার কি কোন সংযোগ নাই? ঐতিহাসিককে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিককে কার্যকারণ সম্পর্কের অনুসন্ধান আর এক ধাপ অগ্রসর করিতে হইবে। প্রথম দৃষ্টিতে যে সকল সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহারা দেশে ও কালে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং তাহাদের কারণ অনুসন্ধান করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহারও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে। তাহারা পরস্পর বিরোধীও হইতে পারে। ঐতিহাসিককে দেখিতে হইবে এই সকল বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত হইতে কোন সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা, যাহার দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজের বিবর্তনের কোন সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, এই বিবর্তনকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে পরিবর্তনের কারণ সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা যায়। এখানেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন হয়। এই দৃষ্টিভংগীর মূল কথা হইল বহুত্বের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার

করা, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন তথ্যসমূহকে সাধারণ সূত্রে গ্রথিত করা। ইতিহাসে এই দৃষ্টিভংগীকে কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রথমতঃ দেশের বিভিন্নতা হইতে যে সমস্যা আসে তাহার আলোচনা করিব। চারিটি বিভিন্ন দেশে মোটামুটি একই সময়ে সামাজিক পরিবর্তন হইল। বিভিন্ন ভাবে চারিটি পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে কয়েকটি কারণ সকল ক্ষেত্রেই উপস্থিত আছে, এবং পরিবর্তনের মধ্যেও কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে সাধারণ (common) কারণসমূহ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। এই ভাবে আবার বিভিন্ন কালে যে সকল সামাজিক গঠন ছিল এবং যে সকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহাদিগকে এক সংগে দেখিলে হয়তো কোন pattern বা type লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবে হয়তো সমগ্র মানব-সমাজের বিবর্তনের মধ্যে কোন ধারা এবং ছন্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকের তৃতীয় কর্তব্য হইতেছে এই পরিবর্তনের মধ্যে প্রগতির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা এবং, প্রগতি ইতিহাসের নিয়ম, একথা বলা যায় কিনা—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, অন্ততঃ দিতে চেষ্টা করা।

গোড়াতেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ইতিহাসে সত্যিই কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় কিনা। প্রাকৃতিক জগতে যাহা সম্ভব, মানুষের সমাজ-জীবন লইয়া সেই ভাবে গবেষণা করা যায় কি? নিয়মের প্রতি, শৃংখলার প্রতি মানুষের মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণবশতঃই আমরা ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে শৃংখলা খুঁজিতে চেষ্টা করি, যেখানে বিশৃংখলা দেখি সেখানে বিশৃংখলারও নিয়ম আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করি। সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে যে সত্যিই কোন নিয়ম আছে এ বিশ্বাস হয়তো আমাদের মনের নিয়মানুরাগেরই দৃষ্টান্ত মাত্র, সত্যিই হয়তো এই বিশ্বাসের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। মানুষের জীবন এত বিচিত্র, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক বৈচিত্র্য এত বেশী যে কয়েকটি সহজবোধ্য সূত্র আবিষ্কার করিয়া সমগ্র মানব জীবনের এক অংশের মাত্র উপলব্ধি লাভ করা যায়। প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্তনেরই কারণ আছে তাহা মানিলে সেই কারণ সম্পর্কে একটা সহজ সূত্র আবিষ্কারের ইচ্ছা হয়, এবং যে সামাজিক তথ্য এই সূত্রের সহিত খাপ খায় না তাহাকে বিকৃতি করিয়া খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা হয়। তাহার ফলে ইতিহাস বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং যেখানে কার্যকারণ সম্পর্ক সহজে ধরা পড়ে না সেখানে কোন পূর্ব-পরিকল্পিত সূত্র প্রয়োগ করিবার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত না করিয়া বিনয়ের সহিত স্বীকার করা ভাল যে বিষয়টির পূর্ণ উপলব্ধি হইতেছে না। তাহা ছাড়া তথ্যকে সূত্রজালে গ্রথিত করিবার ব্যাপারে মতভেদ হইতে বাধ্য, সুতরাং তর্ক-বিতর্কের সীমানায় না যাইয়া তথ্য পরিবেষণ করিয়া যাওয়াই ঐতিহাসিকের চরম কর্তব্য। অর্থাৎ সোজা কথায় ইতিহাসকে সমাজ-বিজ্ঞান হিসাবে বিচার করা উচিত নহে। এই মতবাদ আজকাল অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিভংগী প্রাকৃতিক জগৎ অতিক্রম করিয়া মানুষকে লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছে—মানুষও তো প্রাকৃতিক জগতেরই অংশ। মানুষের সামাজিক জীবনে পরিবর্তন একটি বড় সত্য, এবং এই পরিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়া অগ্রগতি হইয়াছে তাহাও সত্য। এই সত্যকে বুঝিবার চেষ্টা না করার অর্থ হইতেছে বুদ্ধির অসামর্থ্য স্বীকার করা। যে সকল সূত্র বা নিয়ম ইতিহাসে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হয় তাহাদের সহিত মতদ্বৈধ হইলে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর সহিত বিরোধ ঘোষণা করিতে হইবে তাহা নহে—নূতন নিয়ম অবিষ্কার করিতে হইবে। সামাজিক পরিবর্তনের গূঢ় কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে মানুষের কার্যকলাপ অনেকটা রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে। মানব-চরিত্র যতটা সম্ভব রহস্যলোক হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করাই উচিত। নিয়মের প্রতি, শৃংখলার প্রতি অনুরাগ যে শুধু মানুষের একটা মানসিক বৃত্তি এমন মনে করিবার কারণ নাই, বাহ্য জগতে শৃংখলা একটা সত্য, বিশৃংখলার মধ্যেও নিয়মের অস্তিত্ব দেখা যায়। বস্তুতঃ বাহ্য জগতে শৃংখলা আছে বলিয়াই তাহার ভিতর-রূপ মানুষের মনে দেখা যায়।

ইতিহাসকে সমাজ-বিজ্ঞানরূপে দেখা যায় এ কথা মানিয়া লইয়াও কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এই দৃষ্টিভংগী অসম্পূর্ণ, সমগ্র মানব-জীবনের উপলব্ধি ইহার দ্বারা হয় না। প্রথমতঃ এই দৃষ্টিভংগী পরিবর্তনের যুগ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেই সমধিক উপযোগী, স্থিতির সময়ে সমাজের রূপ বিশ্লেষণ করিতে হইলে এই দৃষ্টিভংগীকে কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত দৃষ্টিভংগী সমাজের সমষ্টিগত জীবনের প্রতিই মনোযোগ দেয়, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির এক অংশরূপে দেখিবার চেষ্টা করে, তাহার ফলে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে খণ্ডিত ধারণা হয়। এই দুই যুক্তির মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। দ্বিতীয় যুক্তিটি প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসে ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও প্রতিফলন কতখানি সেই প্রশ্নই উত্থাপন করে, সেজন্য আমরা তাহা পরে আলোচনা করিব। প্রথম যুক্তিটির উত্তরে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সমর্থকগণ বলেন যে স্থিতি এবং গতি এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন নয়, কারণ প্রকৃতিতে সমস্তই গতিশীল, গতির বেগের তারতম্য আছে বলিয়াই অনেক সময় গতি স্থিতির রূপ ধারণ করে। সমাজ কোন সময়েই স্থিতিশীল নয়, সুতরাং আপাত-প্রতীয়মান স্থিতির অন্তরালে যে পরিবর্তনের স্রোত বহিতেছে তাহাকে আবিষ্কার করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, স্থিতিও গতির একটি রূপ এবং সমাজে পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি হয় না, সুতরাং অনেক দিন ধরিয়া যে সমাজ স্থিতিশীল থাকে তাহাকে বুঝিতে হইলে পরিবর্তন-সন্ধানী দৃষ্টিভংগী প্রয়োগ করা উচিত নহে। চীনদেশের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। বহুদিন যাবৎ চীনদেশের ইতিহাসে কোন ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন হয় নাই। চীনের এই যুগের ইতিহাস যিনি অধ্যয়ন করিবেন তিনি যদি কেবল পরিবর্তনের বীজ খুঁজিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে ব্যর্থ হইবেন। তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে স্থিতিশীল অবস্থায় চীনা সংস্কৃতির রূপ কি রকম, চীনের ভাবধারা কি রকম। তাহা ছাড়া আরও একটি কথা ভাবিবার আছে।

প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত সমাজের বিবর্তন দেখান যেমন ঐতিহাসিকের কর্তব্য তেমনি প্রাচীনের সহিত বর্তমানের হৃদয়ের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করাও ঐতিহাসিকেরই দায়িত্ব। যেমন, আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে মধ্যযুগীয় ইউরোপ বর্তমান ইউরোপের অপেক্ষা অনুন্নত ছিল; মধ্যযুগীয় ভাবধারার অনেক অংশই বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সকল পরিত্যক্ত ভাবের বর্তমানে কোন সামাজিক প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইতিহাসকে শুধু বুঝিতে নয়, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে হইলে ঐ সকল পরিত্যক্ত ভাবকেও কল্পনায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমরা যে যুগের ইতিহাস পড়িব সেই যুগের মানসিক জগতে যদি আমরা প্রবেশ করিতে না পারি তবে ইতিহাসের যথার্থ উপলব্ধি হইবে না। অতীতের সহিত বর্তমানের মানসিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা মনুষ্যের হৃদয়কে সমৃদ্ধ করে, সেই সমৃদ্ধির প্রয়োজনকে অস্বীকার করা মানসিক অস্বাস্থ্যের পরিচয়।

সামাজিক বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টার ফলে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগীর আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা এই দৃষ্টিভংগীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব। এই দৃষ্টিভংগীর গোড়ার কথা হইল এই যে সামাজিক বিবর্তনের মূল কারণ পাওয়া যায় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিতর। এই অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ নিয়ন্ত্রিত হয় দুইটি বিষয়ের দ্বারা :—(১) উৎপাদনের উপকরণ (factors of production) এবং (২) উৎপাদন-সম্পর্ক (relations of production)। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি গড়িয়া উঠে—এই সকলকে বলা যায় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সংস্কৃতির বনিয়াদ। বনিয়াদের রূপ ভিত্তির উপর নির্ভর করে, আবার ভিত্তিও অনেক পরিমাণে বনিয়াদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ পর্যন্ত ইতিহাসে যত সমাজ দেখা গিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই শ্রেণীসমাজ। একটি বিশেষ শ্রেণী উৎপাদন-উপকরণের মালিক এবং উৎপাদন-সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে, এবং এই শক্তির প্রভাবে সমাজের উপর প্রভুত্ব করে। এই প্রভুত্বের ফলে শোষিত শ্রেণী সংগ্রাম করে, এবং শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়া সমাজ এক নূতন রূপ ধারণ করে। পুঁজিবাদী-সমাজ হইল শ্রেণী-সমাজের শেষ রূপ, ইহার পরে আসিবে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ। কোন সমাজের পরিবর্তনের কারণ সেই সমাজেই নিহিত থাকে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগীর কোন বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা ইহার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কেই আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ উৎপাদন-ব্যবস্থার কথাই ধরা যাক্। উৎপাদনের উপকরণ কিভাবে জন্মলাভ করে, উপকরণের উন্নতিই বা কিভাবে সাধিত হয় সে বিষয়ে মার্ক্সীয় মতবাদে পরিষ্কার জবাব পাওয়া যায় না। নূতন উৎপাদন-যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সমাজে পরিবর্তন আসে একথা ঠিক, কিন্তু উৎপাদন-যন্ত্রের আবিষ্কারে সামাজিক অভিজ্ঞতা ছাড়াও ব্যক্তিগত প্রতিভা থাকে, এবং এই প্রতিভার সহিত সামাজিক অভিজ্ঞতার কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা অনেক সময়ে সম্ভব নয়। বস্তুতঃ উৎপাদন প্রণালীর ক্রমবিকাশ কি কারণে হয় তাহার পূর্ণ

জবাব পাওয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে। ইতিহাসে দেখা যায় যে একই অবস্থা হইতে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস বিভিন্ন পথে চলিয়াছে। গ্রীক দেশে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যে উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না কেন তাহা চিন্তার বিষয়। এ্যাথেন্সের রাজনৈতিক বিপর্যয় তাহার অর্থনৈতিক অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে যে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাই বা বেশীদূর অগ্রসর হইল না কেন, আবার ইউরোপের মধ্যযুগের শেষে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালী প্রসার লাভ করিল কেন তাহা চিন্তার বিষয়। অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ইউরোপের সমকক্ষ ছিল; তাহার পরে যে পার্থক্য হইয়াছে তাহার কারণ নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক নয়।

তারপর সমাজের অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্ক ধরা যাক। মার্ক্সবাদে অবশ্য উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু একথাও বলা হইয়াছে যে অর্থনৈতিক কাঠামোই সমাজের আসল রূপ নিয়ন্ত্রণ করে। মোটামুটিভাবে একথা সত্য হইলেও ইহার যে ব্যতিক্রম আছে তাহা স্বীকার করা প্রয়োজন। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে রাজনৈতিক ঘটনা বা সাময়িক বিপর্যয়ের ফলে অর্থনীতির দিক হইতে উন্নত সমাজও অনুন্নত শক্তির অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং উৎপাদন-প্রণালীও অবনতির পথে নামিয়া যায়। রোম কর্তৃক গ্রীস বিজয় এবং বর্বরগণ কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস এরূপ দুইটি দৃষ্টান্ত। রাজনৈতিক মতবাদের সহিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্কও তেমনি একতরফা নয়। জাতীয়তাবাদের কথাই ধরা যাক। যদি স্বীকার করা হয় যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তবে সেটা ঠিক হইবে, কিন্তু তাহা হইতে যদি এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে পুঁজিবাদের সহিত জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, তবে ভুল হইবে। একবার জন্মলাভ করিয়া জাতীয়তাবাদ একটি স্বাধীন শক্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং মানুষের মনে বাসা বাঁধিয়াছে, পুঁজিবাদের ধ্বংস হইলেই জাতীয়তাবাদ অন্তর্হিত হইবে ইহা আশা করা দিবাস্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বস্তুতঃ মানুষের অন্তরের সহিত বাহ্য জগতের সম্পর্ক কি? এই আলোচনায় আমরা দর্শনের রাজ্যে আসিয়া পড়ি। মার্ক্সবাদে ভাবের সৃজনীশক্তি স্বীকৃত হয়, কিন্তু ইহাও বলা হয় যে ভাবের উৎপত্তি সমাজ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না, এমন কি ইতিহাসের যুগে যুগে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে সমাজের শ্রেণী-বিভেদের মানসিক প্রতিফলন মাত্র। দর্শনের রাজ্যে ইহার উপযোগী ধারণা হইল এই যে মন বস্তুরই অত্যুন্নত স্তরের একটি ধর্ম (Mind is a property of matter in a highly developed form)। এই দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়, সমাজ জীবনে এই তত্ত্বের যে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহারই আলোচনা করিব। চিন্তা বা ভাবকে যদি আমরা শ্রেণী-বিভেদের প্রতিফল বলিয়া বিবেচনা করি, তবে বলিতে হয় শ্রেণী-বিভেদই চিন্তা

জন্মদাতা, অন্ততঃ প্রধান উদ্দীপক। তাহা যদি হয় তবে শ্রেণীভেদ যখন বিদূরিত হইবে এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন ভাবের প্রধান উদ্দীপনাও তিরোহিত হইবে। তখন কি আর মানুষের চিন্তাশক্তির বিকাশ হইবে না? সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগে আমরা কি মানসিক অনুর্বরতা ডাকিয়া আনিব? এই সমস্যার সমাধান হয়, যদি আমরা স্বীকার করি যে মানুষের সমগ্র মানসিক সত্তাকে অর্থনীতির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। মানুষ শুধু দ্রব্য উৎপাদন করে না, সে ধর্মচর্চা করে, সাহিত্য রচনা করে, প্রেম করে, রাজনীতি করে। মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্যকে অর্থনৈতিক আবেষ্টনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল হিসাবে দেখা অসম্ভব। মনের সংগে বাহ্য জগতের সম্পর্কটা পারস্পরিক। মন বাইরের জগতের ডাকে সাড়া দেয়, আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়; আবার বাহ্য জগতের উপর মন প্রভাব বিস্তার করে। এই যে বাহিরের আকর্ষণ, ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে যে সকল উপাদান (elements) পাওয়া যায় তাহা অতি বিচিত্র এবং বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সন্ধান নিষ্ফল। মানুষের সকল আবেগ, সকল মনোভাব একটি বিশেষ কেন্দ্র প্রদক্ষিণ *করিয়া ঘুরিতেছে এবং সেই কেন্দ্র হইতেছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*—ইহা যদি সত্য হইত তবে মানব-জীবন মানসিক জগতে অনেক বেশী দরিদ্র হইত। হোমার যে কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন সমাজের ছাপ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই কাব্য লিখিবার আবেগের উৎস অর্থনীতির মধ্যে পাওয়া যাইবে না।

উপরের বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়। ইতিহাসে নানা রকমের শক্তির লীলা দেখা যায়—অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভৃতি। কোন একটি ঘটনার পশ্চাতে অনেক রকমের শক্তির সমবায় দেখা যায়। কোন সামাজিক আলোড়ন যখন হয় তখন এক সংগে সমাজের নানা দিকে—অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে, ধর্মে, ভাবে—পরিবর্তন দেখা যায়। প্রশ্ন হইল এই যে আপাত-দৃষ্টিতে যাহাকে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয় সেই সকল সামাজিক শক্তির মধ্যে কোন ঐক্যের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না, একথা বলা যায় কিনা যে বিশেষ কোন দিকে পরিবর্তন হইলে তাহার ফলে অন্য সব দিকে পরিবর্তন হইবে, এবং তাহা হইলে সেই বিশেষ দিকটি কি। মার্ক্সবাদ অনুসারে সমাজের সকল চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে তাহার অর্থনীতি; অর্থনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তন হইলে অন্য সব দিকে পরিবর্তন হইবেই; প্রথম পরিবর্তনের সহিত শেষের পরিবর্তনসমূহের কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। ইহার বিরুদ্ধে দুইটি কথা বলা যায়। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণ কোথায় অনুসন্ধান করিব? তাহার আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা একথা বলিতে পারি না যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন অন্যান্য পরিবর্তনের উৎস; শুধু একথাই বলিতে পারি যে সকল দিকের পরিবর্তন-রেখাসমূহ একাভিমুখী (parallel)।

মার্ক্সবাদই যে প্রথম ইতিহাস-পাঠে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর প্রবর্তন করে তাহা অবশ্য

স্বীকার করিতে হইবে। ইতিহাস শাস্ত্রে মার্ক্সবাদ অনেক নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুইটি সত্যের উল্লেখ করিব। প্রথমটি হইতেছে আপেক্ষিকতাবাদ (principle of relativity)। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের ভাবধারা, রীতিনীতি প্রচলিত থাকে। এক যুগের মনোভাব হইতে আর এক যুগের মনোভাবের বিচার করা সমীচীন নহে। দাসত্ব-প্রথাকে এযুগে সকলেই নিন্দা করিবেন, কিন্তু একযুগে দাসত্ব-প্রথাও সমাজ-বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছিল। আপেক্ষিকতা মানিলে চিরন্তন সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে, কারণ সত্যতা আপেক্ষিক শব্দ, যাহা এক সমাজের পক্ষে সত্য অপর সমাজের পক্ষে তাহা সত্য না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সমাজের ইতিহাসের উপাদান সমাজের ভিতরেই খুঁজিতে হইবে, কোন বাহ্য (মানুষ ও প্রকৃতির বহির্ভূত) শক্তির অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। একদিকে প্রকৃতি, অপরদিকে তাহার পরিপূর্ণ সত্তা লইয়া মানুষ—এই মিলিয়া ইতিহাসের সামগ্রী। এই দুইটি কথা মনে রাখিলে অনেক ভুল ধারণা হইতে বাঁচা যাইবে।

এবার আমরা ইতিহাসে প্রগতি কতখানি সত্য তাহা আলোচনা করিব। প্রথমেই প্রগতির মানে কি সেটা বোঝা দরকার। প্রগতি অর্থে আমরা সমাজ-জীবনের সর্বাংগীন উন্নতি বুঝিব—অর্থনৈতিক উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ, মানসিক সৃষ্টির প্রাচুর্য প্রভৃতি। জীবনের সকল দিক ব্যাপিয়া শক্তির বিকাশ প্রগতির লক্ষণ। বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যায়। মানুষ যে পরিমাণে নিতান্তই প্রাণরক্ষার তাগিদ হইতে মুক্ত হইয়া মানসিক সম্পদ সৃষ্টির দিকে শক্তিকে পরিচালিত করিতে পারে সে পরিমাণে তাহার প্রগতি হয়। এই অর্থে ইতিহাসে যে প্রগতির ধারা আবিষ্কার করা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিম কাল হইতে আজ পর্যন্ত উৎপাদন-রীতিতে যে সকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহার ফলে মানব-সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিকার্য প্রথম প্রচলিত হওয়া সভ্যতার ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। শিল্প-বিপ্লব আর একটি। উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধির ফলে মানুষের অবসর-সময় বৃদ্ধি পাইয়াছে, সংস্কৃতি-সৃষ্টির সুযোগ ঘটিয়াছে। যে যুগে যে দেশের সমাজ উৎপাদন-প্রণালীতে যত বেশী উন্নত হইয়াছে, সে যুগে সেই সমাজে তত বেশী সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছে, জ্ঞান-সাধনা, শিল্প-সৃষ্টি প্রভৃতির ভিতর দিয়া সেই সমাজ তত বেশী মানসিক কার্য-তৎপরতা দেখাইয়াছে। সংস্কৃতি বিকাশের গোড়ার কথা হইতেছে জীবন হইতে আর্থিক-সমস্যাকে বিদূরিত করা—সমস্যার বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া নয়, সমস্যার সমাধানের পথ বাহির করিয়া। মানুষের সৃজনীশক্তিকে মুক্ত করাই হইল প্রত্যেক বিপ্লবীর আদর্শ। বর্তমান যুগে শিল্পের উন্নতির জন্য মানুষের উৎপাদিকা-শক্তি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে মানুষের সৃজনীশক্তিকে নব নব সৃষ্টির পথে পরিচালিত করা এখন সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে ব্যাহত করিতেছে যাহারা সেই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ইতিহাসের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে ইতিহাসের ধারা বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকে না। ইতিহাসের অগ্রগতি অনেক সময় ব্যাহত হইয়াছে। বর্বর-আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের ভাংগন এমন একটি দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই সাময়িক অধঃপতন দেখা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখি গুপ্ত-যুগের গৌরবময় সভ্যতার জ্যোতিঃ বেশীদিন অম্লান ছিল না, হর্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগকে অনেকে অবনতির যুগ মনে করেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, উন্নতির পর অবনতি, তারপর আবার উন্নতি—এভাবেই বুঝি ইতিহাস চলে। তাহা যদি হয় তবে ইতিহাসে প্রগতি যেমন সত্য, অবনতিও তেমন সত্য; একটাকে বাদ দিয়া আর একটিকে বড় করিয়া দেখিব কেন? "The fact of progress is written plain and large on the page of history; but progress is not a law of nature. The ground gained by one generation may be lost by the next. The thoughts of men may flow into channels which lead to disaster and barbarism." (H. A. L. Fisher)। কিন্তু progress যদি fact হয় তবে ইতিহাসের ধারা progressive বলিতে আপত্তি কি? সাময়িক অবনতি প্রগতির ধারারই অংশ বিশেষ। ইতিহাসকে খণ্ডিত-ভাবে বিচ্ছিন্নতা, বিশৃংখলা, উত্থান ও পতন দেখা যায়, কিন্তু ইতিহাসের সমগ্ররূপকে দেখিলে মানুষের সৃজনীশক্তির বিচিত্র বিকাশ সহজেই ধরা পড়ে। পর্বতে উঠিবার পথ কেবলই উপরের দিকে যায় না, সে পথ উচুনীচু পথ। ইতিহাসের পথও সেই রকম। এক সময় ছিল যখন মনে করা হইত যে ইতিহাসের গতি চক্রাকার। প্রাচীন গ্রীসে এই ধারণা প্রচলিত ছিল। বর্তমান পণ্ডিত-সমাজে এই ধারণা বর্জিত হইয়াছে, কারণ ইহার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। বহু অবনতির যুগ কাটাইয়া প্রগতির যে রূপ বর্তমান সমাজে প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং নব সম্ভাবনার ইংগিত করিতেছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা, তাহার ঐতিহাসিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করা ও তাহা হইতে ভবিষ্যতের নির্দেশ গ্রহণ করা ঐতিহাসিকের দায়িত্ব।

উন্নতি-দর্শন ও ভবিষ্য-সমাজ

উমা সেন

চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্

'উন্নতি', 'বিবর্তন', 'বিপ্লব' ইত্যাদি পারিভাষিক বর্তমানকালে দার্শনিক ও সমাজশাস্ত্রীদের মহলে এক নতুন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। লোকমুখেও এই শব্দগুলির প্রচলন বেড়েছে পূর্বের থেকে অনেক বেশী। অথচ এদের প্রকৃত অর্থ কি বা কি হওয়া উচিত সে ধারণা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট। আর যারাও বা এদের অর্থ-বিন্যাসে সচেতন ও সুদক্ষ, তাদের মধ্যেও রয়েছে অন্তহীন মতবিরোধ ও বৈষম্য।

'উন্নতি' পারিভাষিকটি উচ্চারণের সংগে সংগেই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে ওঠে মানুষের দ্বন্দ্বময় ও গতিশীল জীবনের মূর্তি। মানব-জীবন সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে চলেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না কোথাও। "ভাঙিতেছে পুরাতন গড়িছে নূতন, জগতের নীতি এই মহাবিবর্তন"—নবীনচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে জীবনের ও জগতের গতিশীল মন্ত্র। এই মন্ত্র গ্রীক্ দর্শনিক হেরাক্লিটাস্ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের হেগেল-মার্ক্স-বঁর্গ্‌স-শ-অরবিন্দ অনেকেই বিচিত্র-স্বরে উচ্চারণ করেছেন। সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, চির-চঞ্চল আমাদের এই পৃথিবী—নিয়ত-গতিশীল আমাদের এই সমাজ। গতি হ'ল জীবনের ও জগতের প্রথম ধর্ম। মানুষের উন্নতি, বিবর্তন বা বিপ্লব সবই গতিশীল অবস্থারই বিশেষ বিশেষ রূপমাত্র। উন্নতি বল্‌লেই গতি, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, অবস্থান্তর বুঝায়; যদিও যে-কোন গতি, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য বা অবস্থান্তরকেই উন্নতি বলা চলে না। তবে কোন্ জাতীয় গতি বা পরিবর্তন উন্নতি-পদবাচ্য—*এই হ'ল বর্তমানে আসল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সকল দার্শনিক* ও চিন্তাবীরই বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিন্তু উত্তরের যে ইংগিত তারা প্রদান করেছেন, তা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, এমন কি পরস্পর-বিরোধীও।

কোন কোন চিন্তাবীরের বিবেচনায় মানুষের ইতিহাস হ'ল তার ক্রমোন্নতির এক-টানা কাহিনী। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ চলেছে ক্রমশঃ এগিয়ে ধারাবাহিক উন্নতির পথে। তার ইতিহাস হ'ল তার অভ্যুত্থান ও জয়যাত্রার নিরবচ্ছিন্ন কাহিনী। "From the theory of the human perfectibility inherited from the eighteenth century, from the Hegelian interpretation of history as the progressive manifestation of absolute spirit, from the more recent doctrine of evolution, above all from the immense scientific and technological progress, we were led to believe in a constant, continuous and almost automatic progress."[১] অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর পর নানা ঘটনাবৈচিত্র্য আমাদের অনেকের মনে এ বিশ্বাসই সৃষ্টি করেছে যে, জগতের প্রবাহ হ'ল ক্রমাগত উন্নতির পথে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুপ্রচারিত র‍্যাশান্যালিস্টগণের মতবাদ, হেগেল-দর্শনের প্রসার, ডারউইনিয়ানদের ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব, সর্বোপরি আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক অভূতপূর্ব উন্নতি মানব-মনে নিরবচ্ছিন্ন ও স্বতঃস্ফূর্ত উন্নতির ধারণা সৃষ্টি করেছে। মানুষ দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে চলেছে শাশ্বত উন্নতির পথে।

আবার, কারো কারো ধারণা বা বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর ইতিহাস মানুষের ক্রমিক অবনতির সাক্ষ্যই বহন করছে। একদিন পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারীরূপে। তারপর ঘটেছে তার সত্য-শিব-সুন্দরের সেই মহান্

---

(১) Sir S. Radhakrishnan: "Progress and Spiritual Values" (Philosophy, London, 1937, July; p. 260).

আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। যতই কালের জয়যাত্রা এগিয়ে চললো, ততই ঘটলো মানুষের ভীষণ থেকে ভীষণতর অবনতি। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে সত্য ও সুন্দরের জ্যোতির্ময় স্বপ্ন। অসত্য ও অসুন্দরের আঘাতে আঘাতে তার অন্তর মলিন ও বিদীর্ণ। যুদ্ধ-লিপ্সা ও লোভের তাড়নায় মানুষ আজ অন্ধ। বিপ্লবের যুগে মানুষ অত্যন্ত দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে উন্নতির পরিবর্তে ধ্বংসের পথে। যুদ্ধ এনে দিয়েছে ঘরে ঘরে হাহাকার, অভিশাপ ও দুর্দশার প্লাবন। তার সৃষ্ট সম্পদ, ঐশ্বর্য, বিজ্ঞান, দর্শন—সবই তার ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করে তুলছে দিনে দিনে। কাজেই নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির কথা হ'ল অসত্য। পৃথিবীতে সত্য হ'ল মানুষের ক্রমিক অবনতি। স্বর্গচ্যুত মানুষের পৃথিবীতে যে ইতিহাস তা হ'ল তার পতন, স্খলন ও ব্যর্থতারই কাহিনী। এই সকল পণ্ডিত ও চিন্তাবীরেরা মানুষের অবনতি-দর্শন প্রচারে মুখর-কণ্ঠ। বিশেষত যুদ্ধোত্তর যুগের ধ্বংসলীলার ভেতর তাঁরা পাচ্ছেন তাঁদের মতের বাস্তব সমর্থন। এই সমর্থন আরও উল্লেখযোগ্য মূর্তিতে তাঁরা লাভ করেছেন জার্মান দার্শনিক অস্‌ওয়াল্ড স্পেংলারের (Oswald Spengler) সুবিখ্যাত গ্রন্থ "The Decline of the West" থেকে। বইখানির সকল মতামত কতখানি স্বীকার্য তা বিবেচনার বিষয়, তবে বস্তুনিষ্ঠ-দৃষ্টিতে একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে মানুষের ক্রমিক ও ধারাবাহিক উন্নতি-দর্শনে বইখানি কুঠারাঘাত করেছে। মানুষ আজ নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি-দর্শনে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এদেরই চরমপন্থী হ'লেন তাঁরা যাঁরা মানুষের ইতিহাসে কেবল তার ক্রমিক অবনতির সাক্ষ্যই সন্ধান করে থাকেন।

পক্ষান্তরে, কোন কোন চিন্তাবীর বিশ্বাস করেন যে, মানুষের ইতিহাসে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি বা অবনতি ব'লে কোনটাই সত্য নয়। সত্য হ'ল তার চির-চঞ্চল জীবন-প্রবাহ। এই প্রবাহে কখনও ঘটছে তার উন্নতি, কখনও অবনতি, তাঁদের বিচারে "The idea of inevitability, whether of progress or of decline, of a dialectical movement in historical sequence, is an illusion. Human history is not subject to natural laws." এই সকল পণ্ডিত ও চিন্তবীরের ভেতর ঐতিহাসিক এইচ্, এ, এল্, ফিসার ও দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কেউই মানুষের ইতিহাসকে বাঁধা-ধরা কোন একটা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ দেখতে পান নি। তাঁদের বিচারে বিশ্বের পরিবর্তনের পশ্চাতে নেই কোন predetermined pattern। অধ্যাপক ফিসার তাঁর 'A History of Europe' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "One intellectual excitement has, however, been denied me. Men wiser and more learned than I have discerned in history a plot, a rhythm, a predetermined patteern. These harmonies are concealed from me..........(there is) only one safe rule for the historian; that he should recognize in the development of human destinies the play of the contingent and the unforeseen." এই মতের সমর্থক হিসাবে আমরা দার্শনিক রাধাকৃষ্ণান্‌কেও পাই। দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল

ও অধ্যাপক বিনয় সরকারও অনেকটা এই মতাবলম্বী। এঁদের কেউই ইতিহাসে উন্নতি বা অবনতি কোনটারই inevitabilityতে বিশ্বাসী নহেন।[২] তাঁরা বিশ্বাস করেন মানব-মনের সৃষ্টি-মূলক ঐশ্বর্যে ও ক্ষমতায়। প্রকৃতিতে ও সমাজে শত-সহস্র বন্ধন সত্বেও মানব-মনের স্বাধীনতা ও স্বরাজ রয়েছে।[৩] প্রকৃতি তাকে বাধা দিচ্ছে। প্রতি নিমেষে তার স্বপ্ন গুড়িয়ে যাচ্ছে অন্ধ প্রকৃতির নির্দয় আঘাতে। তবুও মানুষ কল্পলোকে গ'ড়ে তোলে আদর্শের স্বপ্ন আর তাকে বাস্তবে রূপ দিতে হয় একান্ত প্রয়াসী। প্রকৃতির বন্ধনের কাছে মানুষ তার আত্মার স্বাধীনতাকে পরিত্যাগ করে নি। মানুষ নিজেকে প্রকাশিত করতে চেয়েছে স্মরণাতীতকাল থেকে। আপন ঐশ্বর্যে নিজেকে পরিপূর্ণ করে ফুটিয়ে তোলার আকাংক্ষা মানুষের অন্তরে প্রবল। এই আত্ম-প্রকাশের প্রচণ্ড আবেগে মানুষ ছুটে চলেছে সম্মুখ-পথে। দিকে দিকে তার সহস্র বন্ধন। এই বন্ধন ভেংগে প্রতি মুহূর্তে তাকে অগ্রসর হতে হয়। মানুষ তার বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে রচনা করে উন্নতির রাজপথ। সংগ্রাম, সাধনা, বুদ্ধি ও শক্তির জোরেই মানুষ নিয়ন্ত্রিত করছে যুগে যুগে তার ভাগ্য এবং ইতিহাসের গতি। এই ইচ্ছা ও কর্ম, সাধনা ও শক্তির অভাব ঘটলেই আসে তার বন্ধন, পরাজয় ও পতন। তাই দেখা যাচ্ছে, মানুষই হ'ল তার ইতিহাসের স্রষ্টা। শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ—দুই-ই সৃষ্টি করবার মতো তার স্বাধীনতা রয়েছে।

যদি মানব-মনের এই স্বাধীনতা ও স্বরাজ না থাকতো, তাহ'লে তো জগতে ইতিহাস বলে কোন বস্তুই থাকতো না। যদি ভগবানের ইচ্ছাই হতো সর্বময়, তাহ'লে তো স্বর্গরাজ্য চিরদিনই পৃথিবীতে বন্দী হয়ে থাকতো। যদি প্রাকৃতিক বাঁধা-ধরা নিয়মাবলী মেনে চলার নামই হতো মানুষের ইতিহাস, তাহলে তো ইতিহাস হয়ে পড়তো অর্থহীন ও যান্ত্রিক। সে ইতিহাস নিয়ে মানুষের গৌরবের কি থাকতো? মানবাত্মার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যই ইতিহাসকে ক'রে তোলে অনিয়মিত ও ছন্দোহীন, অথচ বিস্ময়কর ও ঐশ্বর্যপূর্ণ। যাঁরা বস্তুবাদী অর্থাৎ যাঁরা জড় থেকে চৈতন্যোদয়ের পক্ষপাতী বা চৈতন্য অপেক্ষা জড়ের প্রাধান্য ঘোষণায় অগ্রণী, তাঁরা স্বভাবতঃই মানবোন্নতির ধারাকে খুঁজে থাকেন বাইরের ঘটনাস্রোতের মধ্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষই হ'ল শেষ-বিশ্লেষণে ইতিহাসের গতির নিয়ামক, নির্ধারক ও স্রষ্টা। বস্তু-জগতের পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে মানব-মনের সচল-গতি, বাইরের ঘটনাস্রোতের পরিবর্তনের সংগে নিজেকে মানিয়ে চলার ঐকান্তিক প্রয়াস। বস্তুর প্রভাব মানব-মনে আছে একথা সত্য, তবে সেই প্রভাবকে অস্বীকার করার বা নতুন রূপ দেবার ক্ষমতাও রয়েছে মানুষেরই। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণান্ এ প্রসংগে তাঁর অভিমত

(২) Sir S. Radhakrishnan: "Religion and Society" (London; pp. 32-33).

(৩) Bertrand Russell: "Mysticism and Logic" (*i.e.*, A Free Man's Worship: Chap. III).

ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, "Materialist views of history attempt to account for human progress by outward circumstances, by climatic changes, or social inventions. External conditions, however, are only the material. They provoke the reaction, but do not produce it. The driving power of all change is the mind of man, his intelligent purposive striving to adapt himself more adequately to the changing world." পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই মানুষকে অগ্রসর হ'তে হয়। অবস্থার প্রভাবকে নিজ অনুকূলে ব্যবহার করা বা না-করা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে মানুষের সজ্ঞান সাধনার উপরে। মানব-মনের এই সজ্ঞান সাধনাই হ'ল ইতিহাসের ভেতর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপাদান। মানুষ যেখানে অন্ধ ও অচেতন, সেখানে সে দুর্বল। যেখানে সে সজ্ঞান সাধক, সেখানেই তার শক্তির উৎস ও উন্নতির সম্ভাবনা। কাজেই উন্নতির ধারাটা যান্ত্রিক বা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। অবশ্যম্ভাবিতা বলে কোন শব্দ এর অভিধানে নেই। এ হ'ল সাধনা ও সৃষ্টির বস্তু।

বস্তুজগতের ঐশ্বর্য ও উপকরণগুলি মানুষের নতুন সৃষ্টির পথে উপাদানমাত্র। নব-সৃষ্টির জন্য এদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বিপুল। তবে সৃষ্টির জন্য শুধু উপকরণগুলিই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন বৃহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণারও। আজ পৃথিবী নানা ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে যে-অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সেখানে মানুষের উন্নতির আশা রয়েছে সুবিশাল, আবার পতনের আশংকাও রয়েছে যথেষ্ট। কোন অনিবার্য গতির ইংগিত এখানে সন্ধান করা বৃথা। সম্ভাবনা রয়েছে বিকাশেরও, বিনাশেরও। অ্যাটমিক শক্তি দিয়ে জীবন-সৃষ্টি সম্ভব, আবার জীবন-ধ্বংসও সম্ভব। কাজেই নিছক উপকরণ বা বস্তু-সংগ্রহই কল্যাণময় সমাজ-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বস্তু-সংগ্রহের সাথে থাকা চাই কল্যাণময় সমাজ-সৃষ্টির জ্যোতির্ময় আদর্শও। আজ বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে বহির্জগতে মানুষের ঘটেছে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অভূতপূর্ব প্রাচুর্য, প্রকৃতির উপরেও হয়েছে তার বিপুল কর্তৃত্ব। মানুষ জ্ঞান পেয়েছে, শক্তি পেয়েছে; কিন্তু তবুও তো জীবনকে সে সুন্দর করে সৃষ্টি করতে পারছে না। এত ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও কেন তার জীবন আজও এমন অসহায় ও অভিশপ্ত? এই সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করেও কেন সে আজও এমন অসুখী ও দরিদ্র? তার কারণ আজ সে পারছে না পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে। বিজ্ঞানের সাহচর্যকে অবলম্বন করে সে কেবল বস্তু-জগতের উপকরণই বাড়িয়ে চলেছে, কিন্তু পারে নি তাদের বৃহত্তর সমাজ-সৃষ্টির আদর্শের অনুপ্রেরণায় নিজেকে সক্রিয় করে তুলতে। দারিদ্র্য মোচনের জন্য যেমন সম্পদ-সৃষ্টিই একমাত্র কথা নয়, সম্পদ-বণ্টনের প্রশ্নটাও সুবিশেষ জরুরী; তেমনি বৃহত্তর জীবন-সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যটাই যথেষ্ট নয়, নতুন জীবনাদর্শের সন্ধানও নিতান্ত আবশ্যক। কেবল বিজ্ঞানের সাহচর্যকে অবলম্বন

করলেই যে ছন্দোময় জীবন-স্থষ্টি সম্ভব, সে ধারণা ভ্রান্ত। "Science and its inventions are concerned with the outer organisation, not the inward living. They can remove the hindrances to good life but cannot create it. They can diminish illness but cannot tell a man what he shall do with his health. They can remove poverty and cure unemployment but cannot tell a man what he shall do with his wealth and leisure while science gives us the capacity to control the conditions of life, it does not help us to use these conditions for fine living. We have to go beyond science to get the ideal values." [৪]

এই "ideal values"-এর স্বপ্ন দৃষ্টির সম্মুখে সদা-জাগ্রৎ না থাক্‌লে নতুন ভবিষ্য-স্থষ্টি অসম্ভব। জীবনকে সুন্দর ও ছন্দোময় ক'রে গ'ড়ে তুলতে হ'লে বিপুল আদর্শ সকলের আগে প্রয়োজন। বিজ্ঞানের অফুরন্ত দানকে জীবনে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হ'বে। কারণ, বিজ্ঞান দেয় মানুষকে জ্ঞান, আর জ্ঞানই শক্তি। তবে সেই জ্ঞানকে করতে হ'বে প্রেমের সংগে যুক্ত—শক্তিকে ক'রতে হ'বে সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিজ্ঞানের দানকে চরমভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েও তাই বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর "Scientific Outlook" গ্রন্থে বিজ্ঞানের অপূর্ণতা করেছেন। "Science and Values" অধ্যায়টি অত্যন্ত মূল্যবান। সেখানে রাসেল এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মানুষের ভবিষ্য-সমাজকে সুন্দর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যের সংগে সংগে আদর্শের অনুপ্রেরণাও একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধির সংগে সংগে চাই হৃদয়-বৃত্তির উৎকর্ষ, জ্ঞানের সংগে চাই নতুন মানব-চেতনার উদ্বোধন। এই দুই-এর সমন্বয় করার শক্তির উপরেই জ্যোতির্ময় ভবিষ্য-সমাজ-স্থষ্টির সম্ভাবনা ও তার সফলতা নির্ভর করে।

আধুনিক বাংলা কবিতা

তরুণ সরকার

দ্বিতীয় বর্ষ, আর্টস্

অকৃত্রিম জীবনবোধ যে কবিতার প্রেরণার উৎস, চিরন্তন কালের দরবারে সেই কবিতারই থাকে স্বীকৃতি পাবার দাবী, বিদগ্ধ সমালোচকদের মুখে এমন কথা আমরা শুনেছি। আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে যে কোনো আলোচনা প্রসংগে এ কথাটাই প্রথম মনে আসে, কারণ বাংলাদেশে প্রথম যখন কয়েকজন কবি রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের নিছক অনুসরণ না ক'রে, একটু অন্য ভংগীর, অন্য ঢঙের কবিতা রচনা সুরু করেন, তখন

(৪) Sir S. Radhakrishnan: "Progress and Spiritual Vaues" (Philosophy, London, July, 1937).

সমালোচক-মহল হ'তে তাঁদের বিরুদ্ধে কৃত্রিমতা ও অগভীরতার অভিযোগ আসে। ঐ সব অভিযোগ যদি সত্য হ'ত অর্থাৎ ঐ কবিগোষ্ঠী যে কাব্য-রীতির সূত্রপাত করেন তার পিছনে যদি প্রত্যক্ষ জীবনের প্রেরণা না থাকত, তবে সে কাব্য-রীতির স্বল্পায়ু হওয়া ছাড়া গতি ছিল না। কিন্তু বিরোধী সমালোচকদের বিদ্রূপ ও বাধা উপেক্ষা ক'রে আধুনিক বাংলা-কবিতা আজ বিশ বছর পরেও আশ্চর্য রকম জীবন্ত; তার ভাণ্ডার বহু শক্তিশালী কবির রচনাভারে সমৃদ্ধ, তার ভবিষ্যৎ বিচিত্র সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। সুতরাং এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে আধুনিক বাংলা কবিতার মধ্যে এমন কিছু ছিল বা আছে যা শাশ্বত, যা চিরন্তন জীবন-ধর্মকে অস্বীকার করে না। এবং সেইজন্যই, আজ যখন আধুনিক বাংলা কবিতা তার শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণের পথে, তখন তার জন্ম, ক্রম-পরিণতি ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বোধ হয় ন্যায়সংগত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের ও বিশেষভাবে ইউরোপের চিন্তাধারায় বেশ একটা বড় রকম ওলটপালট হ'য়ে যায় একথা সকলেই জানেন। হতাশা ও স্বপ্নভংগের একটা ভাব সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে; পুরাতন মূল্যবোধে বিশ্বাস ভেংগে যায়, পুরানো আদর্শ হ'য়ে যায় বাতিল। আমাদের দেশ যেহেতু নানাদিকে পশ্চাৎপদ এবং প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে তা'কে আসতে হয়নি, সেই হেতু আমাদের দেশের চিন্তা-জগতে এই পরিবর্তনের ঢেউ বেশ কিছুদিন পরে এসে আঘাত করে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় দশ বছর পরে, উনিশশো'-তিরিশ সালের কাছাকাছি সময়ে। আমাদের জাতীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও উনিশশো-তিরিশ একটি উল্লেখযোগ্য সাল। কারণ ঐ সময়ের পর হ'তেই ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে নানারূপ দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। আর বাংলা-কাব্যে যে ধারা আধুনিক কবিতা নামে পরিচিত, তার জন্মকালও উনিশশো'-তিরিশের নিকটবর্তী সময়।

ঐ সময়কার বাংলা-কাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে তৎকালীন সকল কবিই রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে কবিতা লিখছেন, শুধু অনুসরণ নয়, অনুকরণও চলছে যথেষ্ট পরিমাণে। এ কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরিপূর্ণ অতিক্রম করা কোন বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কারণ রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে দিয়ে গেছেন একটা ঐশ্বর্যশালী নূতন রূপ, তাঁর প্রভাব আমাদের ভাষার গভীর মর্মে অনুপ্রবিষ্ট। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্ট বাক্যাংশ আমাদের কথোপকথনে, আমাদের রচনায় প্রবেশ করে। কিন্তু ঐ বিশেষ সময়ে রবীন্দ্র-অনুকারক ঐ কবিদল বাংলা-সাহিত্যকে নিজস্ব কিছুই দান করতে না পেরে শুধুই ব্যর্থ অনুকরণ ক'রে যাচ্ছিলেন, অর্থহীন ছন্দলালিত্য ও কৃত্রিম ভাবালুতা দ্বারা বাংলা-কাব্যের আবহাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর ক'রে তুলছিলেন। "Tagore achieved beauty and ease, but with most of his followers ease and beauty became a mere mannerism"। সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকটও

কবিতার সমাদর ক'মে গিয়েছিল, কবিতা শুধু মাসিকপত্রের পাদপূরণের জন্যই ব্যবহৃত হ'ত। এই একঘেয়েমির মধ্যে যে দু'জন কবি কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চার করেন তাঁদের নাম নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদার। অকুণ্ঠ বীররস ও স্বতন্ত্র মননের পরিচয় যথাক্রমে এই দুই কবির রচনার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। তবু এই দুই কবিকে আধুনিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, কারণ এঁরা বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করেছিলেন, কোনো নূতন ধারার সূত্রপাত করেননি'। তা'ছাড়া যুদ্ধোত্তর-যুগের মানসিক বিশৃংখলা এঁদের কাব্যে সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হবারও অবকাশ পায়নি'।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মের সংগে একটি সাহিত্য-পত্রিকার নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সে পত্রিকা 'কল্লোল'। সেই সময়কার যে কয়েকজন নূতন লেখকের রচনায় প্রকাশভংগী ও বিষয়বস্তু উভয়দিকেই পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, তাঁদেরই মুখপত্র 'কল্লোল'। যুদ্ধোত্তরযুগের হতাশা, সংশয়, অবিশ্বাস এই সব লেখকদের কলমে যেন প্রাণ পেয়ে উঠল, প্রচলিত সমাজ-বিধান, প্রচলিত জীবনযাপন-পদ্ধতির প্রতি প্রবল বিদ্রোহের সুরও ধ্বনিত হ'য়ে উঠল এঁদের রচনায়। কাব্যের ক্ষেত্রে যে কয়জন কবি এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, তাঁদের নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও মণীন্দ্র ঘটক (যুবনাশ্ব)। বাংলা সাহিত্যিক জগতে এঁদের লেখা প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল, পাঠকমহলে ও সমালোচকদের মধ্যেও মতের বিভিন্নতা দেখা গেল, কেউ এঁদের সমর্থন করলেন, কেউ বা এঁদের বিরুদ্ধে করলেন যুদ্ধঘোষণা। এই কবিরা কিন্তু জীবনের কোনদিকেই মুখ ফিরিয়ে রইলেন না। সমাজের নীচু তলার অস্তিত্ব এতদিন সাহিত্যে, বিশেষতঃ কবিতায় অস্বীকৃত ছিল, এঁদের কাব্যে সেই নীচু তলার দাবীও হ'ল স্বীকৃত, উপর তলার জীবনেও যেখানে ভণ্ডামি, যেখানে অন্যায় সেখানে বিদ্রূপের, ব্যংগের কশাঘাত ক'রতেও এঁরা দ্বিধা করলেন না। প্রথম বিদ্রোহের উৎসাহের আতিশয্যে বাড়াবাড়ি অবশ্য এঁদের মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু করলেন, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, পরিণতমানস সমালোচকের কাছে এঁদের শক্তির পরিচয়ও ধরা পড়তে দেরী হ'ল না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এঁদের কয়েকজনকে দিলেন স্বীকৃতির ছাড়পত্র, আশীর্বাদ করলেন এঁদের অভিযানকে। আধুনিক কবিতার বিরোধীরা এইখানেই একটি মস্ত ভুল করেন: 'রবীন্দ্রোত্তর' বা 'রবীন্দ্র-পরবর্তী' এই কথাগুলির মধ্যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব খুঁজে পান। আধুনিক কবিরা কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার ক'রেই এগিয়ে চলেছেন, বাংলা-কাব্যের স্রোত যে রবীন্দ্রনাথে এসেই শেষ হ'য়ে যেতে পারে না, এই সত্য-উপলব্ধি থেকেই এঁরা পেয়েছেন যাত্রার প্রেরণা। এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথকে আশীর্বাদক হিসাবে,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন গদ্য-কবিতার প্রচলনে) সহযাত্রী হিসাবে—পাওয়ার সৌভাগ্যও এঁদের হ'য়েছিল।

যাই হোক, এই কবিদের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলে। নূতন যে সব শক্তিধর

কবি ক্রমে ক্রমে এঁদের দলে এসে নাম লেখালেন, তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সময়ের দিক থেকে আরো কিছু পরে আর একজন শক্তিমান কবিও এঁদের দলে যোগ দেন, তিনি অমিয় চক্রবর্তী। নানাবিধ কারণে 'কল্লোল' প্রকাশনা বেশীদিন সম্ভব হ'ল না, কিন্তু আধুনিক কবিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হ'য়ে গেল। শুধুমাত্র কবিতা যার উপজীব্য, এমন পত্রিকাও দু'একটি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হ'তে লাগল, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতেও কবিতা অধিকতর সম্মানের স্থান পেতে আরম্ভ করল। অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক, বাংলা কবিতার হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে আধুনিক কবিরা যে মূল্যবান সাহায্য দিয়েছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের যুগ শেষ হবার পর 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর এই সব কবিরা ক্রমে ক্রমে গভীরতর পরিণতি লাভ করতে লাগলেন; দু'একটি তারকার দীপ্তি ম্লান হ'য়ে এলেও অধিকাংশেরই দীপ্তি হ'ল উজ্জ্বল। অনেক শিশু-তারকা, অনেক নীহারিকার আশ্বাসও পেল বাংলা-কাব্যের আকাশ। এই সব কবিদের রচনার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, কিন্তু এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয়, তাঁদের কিছু পরিচয় না দিলে বোধ হয় বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্র-যুগ ব্যক্তি-মানসের দাবীকে প্রধান ব'লে গণ্য করেছিল, রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে কিন্তু সমাজ-মানস ক্রমে ক্রমে প্রধান্য পেতে লাগল। বৃহত্তর সামাজিক জীবনকে স্বকীয় শক্তিবলে যিনি কাব্যক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। অবনত, অবহেলিত জীবনের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও নির্ভীক লেখনী সম্বল করেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য-যাত্রা। তাঁর 'প্রথমা' অবনত জীবনের গুণকীর্তনেই মুখের ঃ

> "আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
> —আমি কবি যত ইতরের।"

কিন্তু সামাজিক শক্তিকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি দিয়ে, ব্যক্তি-মানসের কাব্য-রচনাতেও তিনি যে কম দক্ষ ন'ন তা' তিনি দেখালেন 'সম্রাট' কাব্য-গ্রন্থে ;

> "আমার থাক
> সমস্ত অঙ্কের এপিঠে
> মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,
> নেশার রঙে টলমল
> এই মুহূর্ত বুদ্বুদ,
> জন্ম-মৃত্যু-প্রেম,
> আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই
> আত্মার আকুতি।"

ব্যক্তি-মানসকেই পটমি রেখে আর একজন কবি যিনি সমর্থ লেখনীতে কবিতা রচনা

করলেন, তিনি বুদ্ধদেব বসু। তাঁর দৃষ্টিভংগী কিন্তু আধুনিক, যুদ্ধাতিক্রান্ত মানুষের হতাশা আর স্বপ্ন তাঁর কাব্যেও ফেলেছে নতুন ছায়া ঃ

"আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ।"

ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন—এই দুইয়ের কোনো একটিকে অবলম্বন ক'রে আরো অনেকেই রসোত্তীর্ণ কাব্য রচনা করেছিলেন, তাদের নাম উপরে উল্লেখ করেছি। একজনের নাম করা হয়নি', 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও আধুনিক কবি হিসাবে যাঁর স্থান অনেক উঁচুতে। তিনি বিমলচন্দ্র ঘোষ। তাঁর 'দক্ষিণায়ন', 'উলুখড়', ও 'দ্বিপ্রহর' প্রথম শ্রেণীর কবি হিসাবে তাঁর স্থান নির্ণীত ক'রে দিয়েছে। ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর বিশাল জ্ঞান অনেক সময় সত্যেন্দ্রনাথের কথা স্মরণে আনে। ছন্দ ও ভাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অপর একজন কবিও মূল্যবান পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছেন, তিনি অমিয় চক্রবর্তী। ব্যক্তি-মানসের ভাবনা-ধারণার রূপায়নে সিদ্ধ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আবার অনেক কবির কাব্য-জীবন ব্যক্তি-মানসকে অবলম্বন ক'রে সুরু হ'লেও পরিণতিতে তাঁরা সমাজিক সত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, সমাজ-জীবনের সংগে ব্যক্তি-জীবনের যথার্থ যোগসূত্র নির্ধারণ ক'রতে পেরে নিজেদের বিকাশের নূতনতর পথ খুঁজে পেয়েছেন। বিষ্ণু দে ও সমর সেন এই দিকের পথিকৃৎ।

সাম্প্রতিক কাব্য-জগতে অনুসন্ধান ক'রলে আরো অনেক নূতন কবির সন্ধান পাওয়া যাবে যাঁরা ইতিমধ্যেই কাব্যক্ষেত্রে মৌলিক ও স্থায়ী কিছু দান করেছেন ও যাঁদের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিময়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পরিশেষে কয়েকটি কথা। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ অনেকে এনে থাকেন, অনেক সময় আধুনিক কবিতা কিছু না প'ড়েই বা অল্পমাত্র প'ড়ে। আধুনিক জীবনযাত্রাই যে পূর্বের তুলনায় কত জটিল ও সেই কারণে দুর্বোধ্য হ'য়ে পড়েছে তা তাঁরা মনে রাখেন না। ইচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতার সমর্থন আমি করছি না, কিন্তু কবিতার সংগে জীবনের যোগ যে হেতু অংগাংগী, সেই হেতু আধুনিক কবিতার পক্ষে কিছুটা যে দুর্বোধ্য না হয়ে উপায় নেই, এই আমার বক্তব্য। পূর্বের তুলনায় জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হয়েছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যে মানুষের মনোরাজ্যের কত অন্ধকার দেশে নূতন আলোকপাত হয়েছে—আধুনিক জীবন ও জীবন-দর্শন যে কিছুটা দুর্বোধ্য হবে তা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। শুধুমাত্র সহজ, সরল আবেগের পথ ধরে চলার সাধ্য তাই যথার্থ আধুনিক কবির থাকতে পারে না।

এ কথা নিঃসংশয়ে সত্য যে নূতন নূতন রীতি প্রবর্তনের চেষ্টায় ও উৎসাহের আতিশয্যে ভাবের ও আংগিকের ক্ষেত্রে আধুনিক কবিরা অনেক সময়েই রসের মাত্রা অতিক্রম ক'রে গিয়েছেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা যে তাঁরা করেননি এমন কথাও সত্যের অপলাপ। হয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শতাংশের একাংশও কোনো বিষয়ে আধুনিক কবির নেই। কিন্তু তাঁদের সকলের সামগ্রিক সৃষ্টি, যা আধুনিক কবিতা নামে পরিচিত, তা' যে রবীন্দ্র-কাব্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী তা' মেনে নিতে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত নয়।

এগিয়ে যেতেই হবে, কারণ এগিয়ে চলা প্রাণধর্মের লক্ষণ। 'সোনার তরী' লিখে রবীন্দ্রনাথ ব'সে থাকেননি, তাঁর অদম্য প্রাণশক্তি তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নূতন থেকে নূতনতর প্রয়াসে। 'সোনার তরী' থেকে 'নবজাতক' যে দুর্বার এগিয়ে চলার দীর্ঘায়িত ইতিহাস, সেই এগিয়ে চলার প্রেরণাকেই আধুনিক কবিরাও মূলমন্ত্র ক'রে নিয়েছেন। অগ্রদূত যারা ভুল-ভ্রান্তি তাদের নিত্যসংগী, কিন্তু বিপুলা পৃথিবী আর নিরবধি কাল তাদেরই স্বপক্ষে।

পদাবলী-প্রসংগ—গোষ্ঠ

অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী

'অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম' শ্রৌত ঋষির পরম আবিষ্কার। 'রয়েছো তুমি একথা কবে, জীবন-মাঝে সহজ হবে', যে সহজ অথচ গভীর কামনা বিশ্বকবির গীতাঞ্জলিতে ব্যক্ত হয়েছে সেই সুন্দর কামনার পূর্তি ঋষির এই সিদ্ধান্ত। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'। সর্বসংশয়চ্ছেদের, অন্তর-বিকাশের, এ যে রহস্য-গভীর ও রহস্য-মধুর মন্ত্র!

অস্তি, তিনি আছেন। ভাতি, তিনি সুন্দর, শোভমান। প্রিয়ম্, তিনি আমাদের প্রিয়। কেমন প্রিয়? বিত্তের মতো, পুত্রের মতো? পশ্চিমের ঋষি বলেছেন, বিত্তই মানুষের প্রিয়, সে হো'ল 'Economic Man'। পুত্র মানুষের প্রিয়, সে হো'ল 'Sensuous Man'। কিন্তু ঔপনিষদ ঋষির সিদ্ধান্ত, 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'। পুত্র, বিত্ত, অন্য সব-কিছুর চেয়ে তিনি প্রিয়তর, মানুষের জ্ঞান-সাধনা, কর্ম-সাধনা ও প্রেম-সাধনার তিনি পরম লক্ষ্য। মানস-সুরধুনী ত্রিপথগা। জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছার তিনটি পথ ধরে মানুষের চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল ছুটে চলেছে সীমাহীন সেই সিন্ধুর পানে। আস্তিক্য দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যকলা, চিত্র, সংগীত প্রভৃতি প্রচেষ্টা ঋজু-কুটিল নানা পথ ধরে দুর্নিবার বেগে ছুটে চলেছে সেই বৃহতের দিকে। 'যত নিবারিয়ে চিত নিবার না যায়রে', 'পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো', বৈষ্ণবের মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার এই প্রাণ-নিঙড়ানো কথায় নিত্যাভিসারী মানবাত্মার এই চিরন্তনী আর্তি ফুটে উঠেছে।

গভীর যাঁদের তত্ত্বদৃষ্টি, অন্তর যাঁদের বিদ্বেষবিহীন, তাঁরা কোনও দেশের কোনও যুগের মানুষের সাধ্য-সাধনার কোনও স্তরকেই হেয় মনে করেন না। ভগবদ্ভক্তের একটি পরিচয় তিনি 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্'। সেদিনও দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস বলে গিয়েছেন, "ওরে, কারুর ভাব নষ্ট করিস্‌নে-রে"। সত্যসন্ধ এই প্রেমিক মানুষটি সাধনার অনেকগুলি পথে নিজে হেটে চলে দেখেছিলেন, অনেক মতকে জীবনে অংগীকার করে নিয়েছিলেন। তাই ভেদ-বিদ্বেষ-বিভ্রান্ত নব্য সভ্যতার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে প্রেম ও প্রত্যয়ের কণ্ঠে মানুষের অয়ন-পন্থার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'যত মত, তত পথ', নবীন সভ্যতার কোলাহল মুখর মহানগরীর অদূরে সুরধুনী-তীরে পঞ্চবটী-মূলে বসে "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"এই শ্রুতির নূতনতর ভাষ্য রচনা করতে পেরেছিলেন। দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী দুর্ধর্ষ পণ্ডিত মিশ্র বিশ্বম্ভর যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তখন থেকে বিরুদ্ধবাদীর মত-নিরসনে তিনি কোনও উদ্যম প্রকাশ করেননি।

দর্শনে বিজ্ঞানে যুগ যুগ ধরে প্রাচী ও প্রতীচীর মানুষ যে জীবন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে চলেছে তাঁর অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষকেই 'সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ' বলা হয়েছে। গীতাশাস্ত্র বলেছেন, "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ অহন্তু সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥" একালের বহির্বিজ্ঞানকে ভূতযাজী বলা যেতে পারে। "'যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ একালের এই ভূতযজ্ঞের ঋত্বিক্ যাঁরা তাঁরা যজ্ঞেশ্বরকেই বাদ দিয়েছেন; অথবা যজ্ঞেশ্বরের অভেদাত্মা ভূতনাথকে অস্বীকার করে শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করে চলেছেন। তাঁরা দক্ষ, সন্দেহ নেই। কিন্তু শিব যেখানে অস্বীকৃত, সেখানে বীরভদ্র শাসিত ভূতগন যজ্ঞধ্বংস করবেই। সারা জগতে এই দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস চলছে। একদিন যে-পৃথিবীর ধূলিকণাও মধুময় হয়ে উঠেছিল, সেই পৃথিবীর অণু-পরমাণু আজ বিশ্বধ্বংসের তাণ্ডব-নৃত্যে যোগ দিয়েছে। ভূত-যজ্ঞের যাজ্ঞিকগণ কি শিবহীন যজ্ঞের পরিনাম চিন্তা করবেন না?

সত্যস্বরূপ সত্য শিব ও সুন্দর। সদ্‌বস্তু সৎ চিৎ ও আনন্দ। কর্মসাধনা ও জ্ঞানসাধনার তিনি পরম লক্ষ্য বটেন। কিন্তু তাঁর সংগে ভালবাসার সম্পর্ক পাতানোর ইতিহাসই মানুষের অধ্যাত্মজীবনের যথার্থ ইতিহাস। সংসার-সীমার যতো কাজ যতো কথা, যতো ভাব, সব-কিছুর মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায় যদি তাঁর দিকে, তবে কি সাংসারিকতা ও পরমার্থিকতা এক হয়ে যায় না? বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মতো 'দাসী হঞা তাঁর পায়ে নিশিবোঁ আপনা' ভাবটি অংগীকার করে যদি গোটা জীবনটাই সঁপে দেওয়া যায় তাঁর পায়ে তা হ'লে কি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কর্ম-মোক্ষের সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয় না? শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর, বৈষ্ণবের এই মানবিকতা কি কোমৎ-দর্শন-প্রোক্ত Humanism এর চেয়ে গভীরতর নয়? 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—চণ্ডীদাসের এই

উক্তির আবেদন আমাদের কাছে পরম বস্তুর অস্বীকৃতির মধ্যে। কিন্তু বাংলার যে অপরূপ মানুষটির সমগ্র জীবন চণ্ডীদাসের পদাবলীর জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ তিনি এই উক্তির কদর্থ-নিরসন-কল্পে ইংগিত করে গিয়েছেন, "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নর-বপু তাহারি স্বরূপ"। মানুষ কামনা-বাসনা-বিহীন অন্তরে সেবকের নিষ্ঠা, সখার একাত্মতা, মায়ের অমেয় ভালবাসা ও কান্তার আর্তি নিয়ে ছুটতে পারে তাঁর দিকে। রসিকচূড়ামণি রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলাপে এই তত্ত্বের সম্যক্ স্ফুরণ হয়েছিল। মানবীয় প্রেমের ভাষা ও ভংগী অবলম্বন করে মহাজন পদকর্তা বাংলা দেশে ভাগবত প্রেমের যে দিব্য গাথা রচনা করে গিয়েছেন তাতে অপূর্বভাবে ব্যক্ত হয়েছে রহস্যগভীর ও রহস্যমধুর এই পরম সত্যটি।

সুচির-শ্রুত সুমধুর গোষ্ঠ-পদাবলীতে এই সত্য কিরূপে প্রতিভাত হয়েছে সে দিকে আমরা একটু অবহিত হতে চাই। সরলপ্রাণ গোপবালকেরা গোঠে মাঠে গোচারণ করে। লোককল্যাণের প্রতীক, শান্ত সুদর্শন নিরীহ জীবগুলি তাদের পালনীয়। সরল প্রাণের সবটুকু নিষ্ঠা দিয়ে তারা ভালবাসে এই জীবগুলিকে। আর উদার প্রাণকে উজাড় করে দিয়ে মিলিত হয় তারা কিশোরসুন্দর সখাদের সংগে। সমান বয়স, সমান প্রাণ, সমান আকৃতি তাদের। স্বধর্ম-পালনের ক্ষেত্রে তারা নিবিড়ভাবে মিলিত হয় একে অপরের সংগে। এতটুকু আড় বা আড়াল নেই তাদের প্রাণের মাঝখানটিতে। উদার মোহন প্রকৃতির কোলে তারা মানুষ। নিসর্গের সংগে অতি নিবিড় তাদের একাত্মতাযোগ। কৃত্রিমতার কলুষ-বাষ্পে মলিন হয়নি তাদের অন্তর। প্রাণে তাদের আনন্দের বান ডাকে। পরিপূর্ণ প্রাণে তারা খেলা করে, গান গায়, আর আকুল-করা সুরে বাঁশী বাজায় বনান্তরালে। তার পরে সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে ধরণীর বুকে। তখন কোমল তৃণাহার-তৃপ্ত শ্যামল-ধবল বিচিত্র জীবন-সহচর জীবগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে তারা ফিরে আসে গৃহের পানে। জননীর সস্নেহ উৎসুক আঁখিযুগল প্রতীক্ষা করে তাদের জন্যে। কি সরল সুন্দর দিব্য নিষ্পাপ পবিত্র প্রেমপূর্ণ এই জীবন। যেখানেই অকৈতব প্রেমের খেলা সেখানেই ভগবত্তার স্ফুরণ, একথা অস্বীকার করি আমরা কোন প্রাণে? এমন দিব্য মধুর নির্মৎসর জীবন যদি তাঁকে টানতে না পারল তবে মানুষের ভরসা রইল কোথায়? সব-কিছুতেই তাদের এক-ভাবনা, সব-কিছুর মধ্যে তারা প্রত্যক্ষ করে পরম এককে। "যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ ন মে প্রণশ্যতি॥" প্রাণ-মাতানো 'ভাই' ডাক ছাড়া শেখেনি তারা আর কোনো ডাক। "কটি কাছনি বঙ্কিম ধটি, বেণুবর বাম কাঁখে। জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে॥" তাদের একজন জাগলে ঘুমন্ত সংগীদের ঘুম ভাংগিয়ে জাগিয়ে তোলে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই মন্ত্রই তাদের কণ্ঠে কতো মিঠে শুনায়। বিশ্বকবির কথায় "ওরে বিহান হলো জাগোরে ভাই ডাকে পরস্পরে"। 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' মন্ত্রের প্রেরণা কত সার্থক হয়েছে তাদের জীবনে। সুচির-শ্রুত এই

জীবন-সংগীত প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল আমাদের বিশ্বকবিকে। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন—

"যদি পরজন্মে পাইরে হোতে ব্রজের রাখাল বালক,
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক।"

শান্ত সুদর্শন গোজাতি স্মরণাতীত কাল থেকে মনুষ্যজাতির মংগল-সাধনে নিরন্তর ব্যাপৃত থেকে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করছে। আর্য-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে এই প্রাণীটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কৃষিকার্যের পরমসহায় এই জীবটি। বসুন্ধরা-মাতাকে শস্যশালিনী করে জীবন-যজ্ঞের উদ্‌যাপনে এই প্রাণীটি চিরকাল ধরে সহায়তা করে এসেছে মানুষকে। পরম উপাদেয় কান্তি-পুষ্টি-প্রদ-পদার্থ গব্য। হবি ছাড়া যজ্ঞ বা দেবকার্য হতে পারে না। সুতরাং সর্বযজ্ঞেশ্বর হরির তৃপ্তিসাধন, যা ছিল এই জাতির চরম লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সাধনের পরম সহায় এই জীবটি। তাই ভগবদ্‌বন্দনার মন্ত্রেও ভারতবাসী ভুলতে পারেনি লোককল্যাণের প্রতীক এই প্রাণীটিকে। "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" সর্বকল্যাণের নিদান Absolute Good যিনি তিনি কল্যাণসাধক জীবমাত্রেরই হিতস্বরূপ, 'লোকেশ-চৈতন্যময়াধিদেব' যিনি, তাঁকে লোককল্যাণের মধ্যেই উপলব্ধি করতে হয়, একথায় হেঁয়ালি বা আতিশয্য কোথায়? সেকালের কামধেনু শুধু কামনা-পূর্তির বা 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'র সহায় ছিলনা, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা'র ছিল পরম অবলম্বন। রজোগুণের সংগে সত্বের, বাহুবলের সংগে তপোবলের, বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের লড়াই হয়ে গিয়েছিল সত্বসহায় এই সত্বটির স্বত্ব নিয়ে। নন্দিনী-সুরভি রাজার প্রাসাদ ও ঋষির আশ্রমের শ্রীবর্ধন করত। তাদের পুরাতন স্মৃতি মন-প্রাণকে সত্যই নন্দিত সুরভিত করে তোলে। ধবলী-শ্যামলী-শ্যামসুন্দর সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে স্মরণ-মননের পথে এনে দেয়। সুকঠিন গিরিগাত্র সুকোমল তৃণাস্তরণ ধারণ করে গোজাতির হিতসাধন করে গোবর্ধন আখ্যা ধারণ করেছিল। সেই গো-বর্ধনের গুরুভার বহন করেন বলে তিনি গিরিধারী। শ্যামল বনানী-রাজি সেই বিশ্বরূপের মোহনমালা, তাই তিনি বনমালী। সেই গিরিধারী বনমালীকেই আমরা বন্দনা করি 'গোব্রাহ্মণ-হিতায়' মন্ত্রে। ঐশ্বর্যের দেবতা দেবরাজও হার মেনেছিলেন গোবর্ধনধারী এই প্রেমের ঠাকুরের কাছে।

শ্রীনন্দ-নন্দন যশোদা-দুলাল গোকুলের মাঠে গোচারণ করেছিলেন। ভক্তিজগতের একটি পরম রহস্যময় সত্য এই কথাটি। কত রস, কত ভাব, কত কথা, কত গান, কত হাসি, কত অশ্রু এই তত্ত্বটুকু নিয়ে। গাবস্তিষ্ঠন্ত্যত্র, গোষ্ঠ-শব্দের আক্ষরিক অর্থটি এই। প্রাচীন কালে নদীতীরে বিশাল প্রান্তরে গোচর-ভূমি আর তৎ-সংলগ্ন গোশালাও থাকত। গোধন-সম্বল বৈশ্য গোপ-জাতির স্বধর্মপালনের ক্ষেত্র এই গোষ্ঠ। গোপজাতির স্বধর্ম-নিরত আনন্দময় প্রতিনিধি শ্রীনন্দ। বাৎসল্য-সর্বস্বা বাৎসল্য-যশস্বিনী যশোমতী তাঁরই সাধ্বী সহধর্মিণী। জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতিবলে বসুদেব-দেবকীর যে দিব্যধন তাঁরা ন্যাসরূপে লাভ করেছিলেন, তা তাঁরা আত্মবিহ্বল হয়ে, সর্বস্ব পণ করে রক্ষা করে ধর্মপালন করেছিলেন। 'সস্ত্রীকো

ধর্ম্মমাচরেৎ'। গোপদম্পতীর এই বাৎসল্য-নিষ্ঠার তুলনা কোথায়? শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম তাঁরা, যাঁরা সখ্যের সুন্দর সুদৃঢ় দাম বা রজ্জু দিয়ে কিশোর ভগবানকে বাঁধতে পেরেছিলেন। সুবল তিনি, সখ্যই যাঁর পরম বল। আর অংশুমান্ হলেন এমন একজন যিনি প্রেমস্নিগ্ধ স্বচ্ছ হৃদয়ের স্নেহাংশু বিকিরণ করে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন সবার সেই গোপন সখাটিকে।

যেমন সুন্দর রাখাল সখাদের নাম, তেমন অপরূপ তাদের বেশবাস। পরিধানে কটি-কাছনি বংকিম ধটি। কাঁধে বেণু, চরণে প্রেম-মন্থর কুঞ্জর-গতি। বদনে প্রাণ-ঢালা আকুল-করা ভায়্যা ভায়্যা রব। কাঁধে গো-ছাঁদন ডোরি, কানে কুণ্ডল-খেলা। গলে গুঞ্জার মালা, ভুজে অংগদ-বালা। দলপতি তাদের স্বয়ং শ্রীদামচন্দ্র, মাথায় লাল পাগড়ি। "আওত শ্রীদামচন্দ্র, রঙ্গিয়া পাগড়ি মাথে", পদকর্তা রায়শেখর প্রেমিক কিশোর সখার বিশ্ব-বিমোহন ছবি এঁকেছেন। প্রেমের অরুণরাগ বুঝি পাগড়িটি রাংগিয়ে দিয়েছে!

সমানবয়সী সখারা এসে জুটেছেন গোষ্ঠের পথে। রাম-কানুকে তাদের চাই-ই। গোপাল কি শুধুই মা-যশোদার। সবার সমান দাবী তাঁর উপর। গোপালের উভয় সংকট। তাঁকে ছাড়া সখারা সব গোষ্ঠে যাবে কাকে নিয়ে? কিন্তু মা কি তাঁকে যেতে দেবেন! মাকে লুকিয়েই বা যান তিনি কোন প্রাণে? একদিন ননী খেয়ে লুকিয়েছিলেন, মা যশোদা মরে-ছিলেন আর কি?

"কি করিব ওরে শ্রীদাম করিব আমি কি।
চূড়া বাঁধি ধড়া পরি বসি রয়্যাছি॥
মায়ে না বলিয়া আমি যদি যাই গোঠে।
মরিবে আমার মা পড়িবে সঙ্কটে॥"

আকুল হয়েছেন গোপাল সখাদের আহ্বানে। গোচারণ করে শিখিয়ে দিতে হবে বিশ্বাসী সখাদেরকে গোচারণের স্বধর্ম।

"গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে অমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব।"

আবার,

"আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়ায়ে রাজপথে"

প্রেমের অরুণ রাগে রঞ্জিত যাঁর শিরোভূষণ সেই শ্রীদামচন্দ্র আমার জন্যে ঘর ছেড়ে একেবারে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর কি আমি থাকতে পারি? "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে", রাখাল-বেশ যে আমাকে প'রতেই হবে! দে, মা, আমায় সাজিয়ে। তখন মা-যশোমতীর সাজানোর পালা।

"শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনে আরতি॥"

অন্যত্র পদ-র্কতা বলেছেন, উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে, ত্বরায়, স্নেহাতিশয্যে মা-যশোদা সাজাতে পারছেন না। সাথীরা সব এগিয়ে এসে আথে-ব্যথে হাতে-হাতে কানাইর বেশ-বাস সমাধা ক'রল।

"গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাইর চূড়া বলাই বাঁধিল॥
অঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জামাল॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায়ে রাঙ্গা চরণ হেরিয়া॥"

সাজ-সজ্জা তো হো'ল। দুধের ছেলেকে দূর বনে পাঠাতে হবে। তাতে আবার দুরন্ত কংসের কত মারণ-চর এসে আতংকের আবর্ত তুলে গিয়েছে। মায়ের স্নেহাতুর প্রাণ যে সর্বদাই পাপশংকী।

আহা,

"যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ।"

আবার,

"বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়॥"

আর,

"দধিমন্থন-কালে সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির নাহি করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈঞা যদি গোপাল খেলে যাঞা
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি।"

গোপাল যে মা-যশোদার সবে-ধন নীলমণি। তাই জনে জনে সখাদের ডেকে, বিশেষ করে বলাই'র হাত ধরে, মায়ের প্রাণের আকুলতা জানাচ্ছেন যশোমতী,

"শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করি তো সবারে।
বন কত অতিদুর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপালে লৈঞা না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপালে করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।"

রাণী বিশেষ করে বলে দিচ্ছেন,

"সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লৈঞা।
অভাগিনী রৈল তোমার চাঁদমুখ চাঞা॥"

আবার দিব্য দিয়ে বলছেন,

"আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহ বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥"

ঘরে ব'সেই মা-যশোদা সেই দূর-দূরান্তরের বিশ্ববিমোহন বংশীরব শুনতে চেয়েছিলেন, শুনতে পেয়েছিলেন। যুগ-যুগান্তের কত মায়ের গভীর প্রাণের অপার আকুল আর্তি না জানি জেগেছিল তাঁর প্রাণে!

মায়ের এই আর্তি কিশোরদের প্রাণে বাজল। সখারা সব স্তব্ধ। তাদের দাবি মিলিয়ে গেল মায়ের মিনতির কাছে। দাদা-বলাই এলেন এগিয়ে, ভরসা ক'রে, অভয় দিতে।

"নন্দরাণী গো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি অবসান কালে গোপালে আনিয়া দিব
তোর আগে করিনু নিশ্চয় ॥
সঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈঞা যাব সাথে
যাচিঞা খাওয়াব ক্ষীর-ননী।"

একটু অনুযোগের সুরেই তিনি দাবি জানিয়ে চাইলেন ছোট ভাইটিকে, মায়ের প্রাণে ব্যথা না দিয়ে, ভরসা জাগিয়ে,

"সকালে আনিব ধেনু বাজাইয়া শিঙ্গা-বেণু
গোচারণ শিখাব ভায়ারে।
গোপকুলে উতপতি গোধন চারণ-বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাই ঘরে ॥"

অগ্রজ যে তিনি। হাতে ধ'রে স্বধর্মের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে প্রাণাধিক অনুজকে, বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম ক'রে, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দলন ক'রে। কানাইকে সঁপে দিতে হোল মা-যশোদার, দাদা-বলাইর হাতে, সখাদের সংগে। বাৎসল্য তার পরম ধন সঁপে দিল সখ্যের করে। এমনি ক'রে পর্যায়ক্রমে নিত্যকাল ধ'রে স্বীকার ক'রে আসছেন তিনি মানুষের বিচিত্র ভাব-রসের বহুবিধ বন্ধন। 'তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্', তাঁরই দেওয়া প্রতিশ্রুতি, গোপাল-গোবিন্দ তিনি। গোপালন বা অংগীকারবাক্য-পালন যে তাঁর নিত্য পরিচয়।

তারপর একদিকে মায়ের 'ধারা বহে অরুণ নয়ানে, অপরদিকে,

"দণ্ডবৎ করি মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা-বেণু গগনে গোখুর-রেণু
সুর-নর হরষিত মন ॥"

"যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈর্বেদৈঃ সাংগপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ" তিনি সাড়া দিলেন গোচারণে, সখাদের ডাকে। 'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর-সমুদ্ভবম্'। প্রভাত-সূর্য প্রেমারুণ লোহিতাভা বিকিরণ ক'রে নন্দিত করলেন এই বিজয়ী রাখালদলকে। গোঠের পানে চলেছেন তাঁরা নীলমণিকে বেষ্টন ক'রে, আনন্দোচ্ছল কলসংগীত তুলে। পুরোভাগে সজ্জা ক'রে চলেছেন দাদা বলরাম।

"বাজত সব গোঠ-বাজনা
সাজত বলবীরে।

* * *

বনমালা গলে বাহে তাড়বালা
শ্রবণে কুণ্ডল সাজে॥
ধব ধব ধব ধবলী বলিয়া
ঘন ঘন শিঙ্গা বাজে॥
হুঁহু পথ ছোড়হ বলি
অঙ্গুলি ঘন জোই।

* * *

কর-পাচনী কক্ষে দাবি
রাঙ্গাধূলি গায় মাখে।
কা-কা-কা-কা-কা-কা কানাইয়া বলিয়া
ঘন ঘন ঘন ডাকে॥"

এমনি ক'রে গোষ্ঠের পানে হোল তাদের জয়যাত্রা। এ যেন একান্তভাবে আমাদের ঘরের ছবি। বাস্তব-জীবনে একদিন এর ভিত্তিমূল দৃঢ় প্রোথিত ছিল। ধবলী-শ্যামলী আমাদেরই গোঠে চ'রত। শ্রীদাম-সুদামের প্রেমে সেখানে ধরা দিতেন গোপাল, মা-যশোদার বাৎসল্যবর্ধিত চিরন্তন গোপাল। সংসারীর রোমাঞ্চ হয় সে-কথা ভাবতে। আর ভক্ত প্রত্যক্ষ করেন আপন অন্তর-গোষ্ঠে গোষ্ঠবিহারীর নিত্যবিহার। সখাদের নিয়ে বুঝি আর একবার তেমনি ক'রে গোষ্ঠের বাজনা বাজিয়ে তিনি এসেছিলেন আমাদেরই এই দেশে। শিংগা-বেণু বুঝি রূপান্তরিত হয়েছিল সেবার মৃদংগে, সরল বিশ্বাস আর গভীর প্রেমের সংগে মিশে গিয়েছিল প্রজ্ঞাঘন শাস্ত্রজ্ঞান। একবার যেমন স্বহস্তে গোচারণ ক'রে গোপ-সখাদের শিখিয়েছিলেন গোচারণের স্বধর্ম, এবারেও তেমনি নয়নে অশ্রু ও কণ্ঠে হরিনাম নিয়ে বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন' পতিত-পবিত্র পণ্ডিত-পাষণ্ড সবাইকে শুনিয়েছিলেন শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থনোত্থ প্রাণদ মন্ত্র,

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

সার্বভৌম-ভাষায় তাঁকে বন্দনা ক'রে ধন্য হই,

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তি-যোগ-শিক্ষার্থমেকঃপুরুষঃ পুরাণঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীর-ধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

পাঁকের কমল

গোবিন্দলাল মুখোটী

চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্

ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিস্তব্ধ রাত্রি—কি এক অজ্ঞাত আতংকে রাত্রির অন্ধকার বোবা হয়ে। ঝিল্লিরব থেমে গেছে বহুক্ষণ। বনস্পতিরাও মাথা নেড়ে এই নিস্তব্ধতা ভংগ ক'রতে সাহস করছে না। প্রকৃতির থমথমে ভাব কি আসন্ন ঝড়েরই স্থচনা ক'রছে?

নিজ্ঝুম বনপথ—

আচম্বিতে রাত্রির এই মৌনতাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কোরে সাংকেতিক বাঁশি বেজে উঠল—একবার—তুবার—তিনবার। আবার সব চুপচাপ। শুধু বটগাছটার খোড়ল থেকে পেঁচা একবার ডেকে উঠল—হুতুম-থুতুম।

হিংস্র জানোয়ারে জমজমাট সেই বন থেকে এই অমানিশার রাত্তিরে অন্ধকারের সংগে গা মিশিয়ে বেরিয়ে এল চার কিশোর। খস্, খস্, খস, খস্——পাতার ওপর দিয়ে গুড়ি মেরে বিভিন্ন দিকে চলে গেল তারা।·········

১৯৪২ সাল। জনসাধারণ, বিশেষ কোরে কিশোর এবং যুবকেরা মেতে উঠেছে কি এক অনুপ্রেরণার—স্বাধীনতার সংগ্রামে। সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে যেন একটা বিপ্লবের কালবৈশাখী ব'য়ে গেল। ভয়াল নটের তাথৈ তাথৈ তাণ্ডব নৃত্য মূর্ত হ'য়ে উঠল দিকে দিকে। পরাধীনতার নাগ-পাশে আবদ্ধ গণদেবতা আচম্বিতে যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে জেগে উঠে একটা বিকট হুংকার ছেড়ে সমস্ত বন্ধনকে অবলীলাক্রমে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে চাইল। তুশো' বছরের দাসত্ব যে জাতকে কেবল গোলামি ক'রতে এবং সেলাম ঠুকতেই শিখিয়েছে,—সরীসৃপের মত যে জাত মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, সে জাত সহসা যেন আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে উঠল। গণতন্ত্রের ভাঁওতা দিয়ে যে দাসত্বের বোঝা তাদের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা তারা বহন ক'রতে অস্বীকার ক'রল। দিকে দিকে দামামা বেজে উঠল—আয়রে আয় ভারত সন্তান! এ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়—কৃষ্ণচন্দ্র আর মীরজাফরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ অঞ্জলি অঞ্জলি রক্ত দানে মার শুষ্ক তৃষিত কণ্ঠকে সরস ক'রে। মা আজ তৃষ্ণার্ত, লোলজিহ্ব—মায়ের জিভে আর রক্তের সেই লালিমা নেই—সাদা হ'য়ে গেছে—খাঁ খাঁ ক'রছে।···মায়ের বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর আজ রুদ্ধ। কেবল ক্ষীন ভগ্নকণ্ঠে শোনা যায়—ম্যয় ভুখী হুঁ, ম্যয় ভুখী হুঁ।—··· মায়ের ভুখার অন্ন যোগাবে কে রে?

তরুণ উষার অরুণ আলো মুক্তিপথের ইংগিত দিল। মুক্তির আশায় জনগণ

বাঁধ-ভাংগা নদীর মতই হয়ত কিছুটা উচ্ছৃংখল—কিছুটা বে-পরোয়া হ'য়ে পড়ল।...... এই রেল-পথই আমাদের দাসত্ব-বন্ধনকে সুদৃঢ় ক'রতে সাহায্য ক'রছে—ভাংগ, ভাংগ এই রেল-পথ।..... এই তারই আমাদের পরাধীনতার বাণী বহন ক'রে নিয়ে যায় দূরান্তরে—কাট, কাট এই তার। এই থানাপুলিশই আমাদের কণ্ঠকে নির্মম হাতে রুদ্ধ করে দিয়েছে—নির্বাক ক'রে দিয়েছে—পুড়িয়ে মার, পুড়িয়ে মার এদের;—ভেংগে ফেল এই bastile-এর দরজা। ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা জননীর বক্ষ থেকে নির্মূল ক'রে ফেল্ ঐ উদ্ধত বিদেশী বণিকের পদচিহ্ন—ওরে নির্মূল ক'রে ফেল্।.....

নিরুদ্ধ, নির্জীব শক্তির সহসা ভয়াবহ এই বিকাশ দেখে শক্তিশালী সরকার বিস্মিত হ'ল—শংকিতও হ'য়ে প'ড়ল খানিকটা। কিন্তু মুহূর্তমাত্র—পরক্ষণেই নিগারদের এই ঔদ্ধত্যকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্যে শ্বেতজাতি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল।...জুতো লেহন ক'রে যারা বড় হ'য়েছে,—প্রত্যেকটি পাঁজর যাদের বিদেশী প্রভুর কাছে বিক্রীত, এতবড় দুর্বিনীত তারা;—এতবড় স্পর্ধা তাদের যে তারা শ্বেত-সরকারের বিরুদ্ধতা ক'রতে সাহস করে? খোঁজ তাদের—যারা এই অগ্নিমন্ত্রের হোতা;—যারা এই জড় স্পন্দনহীন জাতিকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছে।.....

এবার আমরা সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের পটভূমিকায় ফিরে যাই। বন থেকে বেরিয়ে এল চারজন তরুণ। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে প'ড়ল তারা।......

সতেরো বছরের তরুণ কিশোর—কিশোরই তার নাম—এগিয়ে চলেছে:...চলেছে নিশীথিনীর তিমির অবগুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে সতর্ক পদবিক্ষেপে; ত্রস্ত তার দৃষ্টি, নিঃশব্দ সর্পিল তার গতি—

এই গুরুতর কাজ কি সে সুসম্পন্ন করতে পারবে? কোনদিন ত এরকম ভয়াবহ কাজ সে করেনি।—তবে কি সে ফিরে যাবে?—একদিকে রয়েছে সুকোমল শয্যা—অপরদিকে রঁয়েছে বন্ধুর রুক্ষ মৃত্তিকা। একদিকে স্নেহ, দয়া, মমতা, ভালবাসা—অন্যদিকে নির্মমতা, রূঢ়তা, প্রতিহিংসা। কোন্ পথ সে বেছে নেবে? কোন্ সত্যদ্রষ্টা তাকে সত্যপথের সন্ধান দেবে? তারা ত কারাগারে! কারাপ্রাচীর ত সেই সত্য সুন্দর শিবের পূজারীদের মুখর মুখকে মূক করে দিয়েছে। তাদের যদি এ কাজে সম্মতি না থাকে?...তবে ফিরেই যাক সে—। "না—না—না"—

কিশোরের হাত ওই চকচকে বস্তুটার ওপর শক্ত হ'য়ে চেপে বসে। গালের ওপর দিয়ে টস টস ক'রে ঘাম গড়িয়ে পড়ে। বড় ক'রে একটা নিঃশ্বাস টেনে নেয় সে।

স্তব্ধ পা দুটো সচল হয় আবার; এবারে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—কোন কিছুতেই মন তার টলবে না—না-না-না।

—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা মনে নেই, মনে নেই সেই বালক-বৃদ্ধ-শিশুদের ওপর নির্মমভাবে মেশিনগানের গুলিচালনা—মনে নেই এ নিষ্ঠুর পৈশাচিক

হত্যাকাণ্ডের নায়ক ডায়ারকে ইংরেজ-ললনাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন, শুধু তাই নয়, তাকে লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা···মনে নেই, মনে নেই পাঞ্জাবের এক রাস্তায় পাঞ্জাবেরই অধিবাসীদের হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বাধ্য করা···মনে নেই নীলকরদের সেই অত্যাচার··· বাংলার তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্তন···মনে নেই, মনে নেই অযোধ্যার বেগমের ওপর অমানুষিক অত্যাচার···

চোখ দিয়ে আগুন বের হ'তে থাকে কিশোরের। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে—অস্ফুট আওয়াজ বের হয়—শয়তান······

এইটা ত?···হ্যাঁ, এইটাই ত সেই বাড়ী। এই বাড়ীতেই ত সেই মহাপুরুষ থাকেন, যিনি একদিন কিশোরকে চুপি চুপি ডেকে ব'লেছিলেন—কিশোর যদি কিছু শাঁসালো খবর যোগাড় ক'রে দিতে পারে, তা' হ'লে তিনি কিশোরকে বেশ কিছু ছাপ-মারা কাগজ মাসিক বরাদ্দ ক'রে দেবেন······

প্রলোভন···টাকার প্রলোভন···এত বড় সাহস এই বণিকরাজের পদলেহী কুকুরের যে সে কিশোরকে টাকা দেখিয়ে কিনতে চায়......

মহাপ্রভু সস্ত্রীক দোতলায় থাকেন,—এ খবর কিশোরের অজানা নেই। কাপড়টা ভাল ক'রে এঁটে নেয় কিশোর। তারপর জলের পাইপ বেয়ে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে উঠতে থাকে।···কাসির শব্দ? কিশোর থেমে পড়ে,·· নাঃ কিচ্ছুনা—ও বোধ হয় মনের ভুল। আবার সে উঠ্‌তে থাকে···এই ত দোতলার রেলিং। এক পা রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঘোড়সওয়ার হ'য়ে বসে কিশোর—পরক্ষণেই বারান্দায় লাফিয়ে পড়ে।··· খুট্ ক'রে দরজা খোলার শব্দ হয়। সট ক'রে কিশোর স'রে যায় একদিকে। একজন লোক বেরিয়ে আসে—এত অন্ধকারে কে যে তা ঠিক বোঝা যায় না···কিশোরের দিকেই এগিয়ে আসছে যে। নাঃ, আর দেরী করা যায় না—বড্ড কাছে এসে প'ড়েছে —silencer-লাগানো উদ্যত পিস্তল থেকে হুস কোরে গুলি বেরিয়ে যায়···একেবারে কপালের মাঝখানে। চীৎকার করবারও অবসর পায় না লোকটা—ধপাস ক'রে প'ড়ে যায়। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিশোর—তাকিয়ে দেখে তার প্রথম বলি।— ঘর থেকে গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসে—কি হ'ল? প'ড়ে গেলে নাকি?—কিশোরের বুকের রক্ত চ'লকে ওঠে। ওই যে, ওই যে তার আসল victim। নতুন রক্তের স্বাদ-পাওয়া বাঘের মতই কিশোর এখন—দুর্বার, দুঃসাহসী। দৃঢ় করে পিস্তল চেপে ধ'রে কিশোর দৃঢ় পদে ঘরে গিয়ে ঢোকে।—সামনেই দেখতে পায় অভিষ্ট জীবটিকে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে—এতটুকু মাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে পরপর দু'বার পিস্তলের ঘোড়া টেনে দেয়। একটা অস্ফুট কাতর আওয়াজ—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে আসে। কিশোরের হাত মুখ বুক রাংগিয়ে দেয়। লাফ দিয়ে সে দুপা পেছনে হ'টে আসে।

নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকারে রাত্রির নীরবতা খান্ খান্ হ'য়ে ভেংগে যায়।—নীচে বহু লোকের দ্রুত পদধ্বনি।—ওপরে উঠে আসছে।—

—কিশোর, কিশোর! সাবধান হও। তোমাকে ত এখনই ধরা প'ড়লে চ'লবে না—তোমার ওপর যে আরো অনেক কাজের ভার ন্যস্ত রয়েছে—দলের মংগলামংগল তোমারই ওপর নির্ভর ক'রছে—কিশোর—কিশোর।—

কিশোর মুহূর্তমধ্যে বারান্দায় প'ড়ে অদৃশ্য হ'য়ে যায় সেই কোণে, যে কোণে র'য়েছে জলের পাইপ।—কিশোরের বিমূঢ়তা ভেংগে গিয়েছে—জড়তা দূর হ'য়েছে—বিদ্যুতের মতই যে পাইপ বেয়ে নেমে পড়ে। হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা পার হ'য়ে যায়—ঢুকে পড়ে সেই গলির ভেতর—যে গলিতে দিনের চেয়ে রাত্রেই জন-সমারোহ বেশী। ঢুকে পড়ে কিশোর সামনের খোলা দরজা দিয়ে অজানা অচেনা এক বাড়ীতে। উদ্‌ভ্রান্ত তার দৃষ্টি—বিপর্যস্ত তার বেশ-ভূষা। সুন্দরী এক যুবতী কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা ক'রতে ছুটে আসে; পরক্ষণেই সভয়ে পেছিয়ে যায় সে—কে, কে তুমি?

শুষ্ক-কণ্ঠ কিশোরের বুকের স্পন্দন বেড়ে গেছে বহুগুণ। বিহ্বলভাবে সে বলে—আমি, আমি খুনী—আ-আমি খুনী। মেয়েটির চোখে ভয়, ঘৃণা, আতংক পাশাপাশি ফুটে ওঠে—তুমি ডাকাত? তুমি খুনী?—এ-দৃষ্টি কিশোরকে তীরের মত বিদ্ধ করে, সচেতন ক'রে দেয়—আমি দেশের ভালোর জন্যেই খুন করেছি। আমার ভুল বোঝনা দিদিভাই। একি পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে কেন?—এত ধোঁয়াই বা এল কোত্থেকে? পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া তাকে গ্রাস ক'রতে ছুটে আসছে।—ইস্-স ক-অ-তো রক্ত। কড়কড় কড়কড়—উঃ মাথায় যে বাজ ভেংগে প'ড়ল—লুটিয়ে পড়ে কিশোর। মনের এবং শরীরের ওপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে গেছে কিশোর যে আর তা ব'ইতে পারছে না।

—দিদিভাই!—আঃ! কি মিষ্টি ডাক—রুদ্ধ গৃহের কপাট খুলে যায়, মনোজগতে বিপ্লব ব'য়ে যায় মেয়েটির—দিদি—দিদি সে। সে ওই ভূলুণ্ঠিত কিশোরের দিদি। সে আর পতিতা নয়, সে আর ঘৃণ্য নয়, সে শুধু দিদি!

একবার সে লুটিয়ে-পড়া কিশোরের দিকে চেয়ে দেখে, তারপরেই ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। কিশোরের হাত ধ'রে বলে—ওঠ ভাই, ঘরে চল, ভাই, ভাই—। সাড়া দেয়না কেন?—তবে কি—? না না···ছুটে গিয়ে সে জল নিয়ে আসে। চোখে মুখে সজোরে ঝাপটা দিতে থাকে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে কিশোর। সস্নেহে ঝুঁকে সে ডাকে···ভাই?

—উঁ?

—ঘরে চল।

—কেন?—কিশোর তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

—কেন আবার কি? ঘরে না গিয়ে এখানেই শুয়ে থাকবে নাকি—চল—আর—আর ওরাও যে এসে প'ড়ল?

…ওরা?…কারা?…ওঃ…মনে পড়ে কিশোরের। …অতি কষ্টে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, হাঁটবার সামর্থ্যও আর তার নেই। মেয়েটিই একরকম তাকে টেনে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। তাড়াতাড়ি একপ্রস্থ জামা-কাপড় বের ক'রে পরিয়ে দেয়। রক্তাক্ত জামা-কাপড় একটা মাটির কলসির ভেতর ঢুকিয়ে দেয়—সংগে সংগে পিস্তলও। ব্র্যাণ্ডি-মেশান দুধ এক গ্লাস খেতে হয় কিশোরকে তার অনুরোধে। অনেকটা সুস্থ-বোধ ক'রে কিশোর।… কিশোরের নাম-ধাম সে জেনে নেয়…ঘটনাটিও।

সহসা অদূরে পুলিশের বাঁশি বেজে ওঠে। সদর দরজার খিল খুলে দেয় মেয়েটি। শংকায় কিশোরের বুক কাঁপতে থাকে—নীল হয়ে যায় তার মুখ। মেয়েটি ফিরে আসে। কিশোরের মুখের দিকে চায়। বলে…ভয় পেয়েছ? ভয় কি? আমি যে তোমার দিদি—। তার পরেতেই অনুচ্চ স্বরে বলে—কোন কথাটি কইবে না, কিশোর। আমি যা করি তা শুধু দেখে যাও।—

কিশোরের সামনে বাঁয়া-তবলা সাজিয়ে দেয় সে। পাশে রাখে মদের বোতল আর কাঁচের গ্লাস। বলে, যা মনে আসে তাই বাজিয়ে যাও কিশোর। কিন্তু খবরদার কোন কথাটি কইবে না।—নীল আলোতে ঘর ভরে যায়। বিচিত্র নারী অদ্ভুত নৃত্য সুরু ক'রে দেয়—রিণি রিণি রিণি রিণি,—চঞ্চল চরণে সুমধুর নিক্কনে নূপুর বাজতে থাকে। নাচতে নাচতে কিশোরের কাছে আসে। বলে—বাজাও বাজাও কিশোর, মাতালের ভাণ কর।—কিশোর উদ্দামভাবে বেতালা বাজাতে থাকে। খানিকক্ষণ পরে শোনা যায় মচ্ মচ্ মচ্ মচ্—তিন জোড়া ভারী বুটের শব্দ। দরজা খুলে যায় সশব্দে। জমাদার আর সেপাই দু'জন বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে। দৃশ্যটা উপভোগ করে তারা কিছুক্ষণ। নর্তকী মদির দৃষ্টি হেনে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় জমাদারের দিকে,— স্খলিত স্বরে জিজ্ঞেস করে—কি ব্যাপার দারোগা সাহেব?—দারোগা বলাতে জমাদার ভারী খুশী হয়ে ওঠে, তারপর আবার সাহেব।—সত্যিইত, সে কি আর একটা যে-সে লোক? সুপুষ্ট গোঁফজোড়াতে একটা চাড়া দিয়ে বলে—বহুত হুশিয়ার হো বিবি। ভারী কঠিন বেপার আছে—একটা জবর খুন হয়েছে। খুনী যে কাঁহা ছিপল,—সুবৃহৎ ভুঁড়িতে একবার হাত বুলিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জমাদার বল্লে—ঢুড়তে ঢুড়তে হামাদের জান বাহার ভৈল।—

—কি সর্বনাশ, খুন!—কোথায়—কখন?—নর্তকী শিউরে ওঠে।

—এহিত, কুছু আগে হোয়েশে।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় নর্তকীর মুখ। কম্পিতস্বরে বলে—আমার কি হবে দারোগা সাহেব? আমার যে বড্ড ভয় করছে। যদি খুনী এখানে আসে—ও

বাবাগো। ব'লেই সুন্দরী তন্বী জমাদারকে জড়িয়ে ধরে। সুকোমল দেহের স্পর্শে জমাদারের দেহে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ দেখা দেয়। বিব্রতভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে জমাদার—আরে, হামিলোগত এহি রাস্তামেই ঢুড়ব। বাহুবল্লরী দিয়ে আরো জোরে সে জমাদারের গলা জড়িয়ে ধরে, বলে,—না না, তোমায় ছাড়বোনা কিছুতেই ছাড়বোনা দারোগা সাহেব—মাগো—ব'লেই মূর্ছা ও পতন হবার উপক্রম। এবার জমাদারই তাকে জড়িয়ে ধ'রে পতন থেকে রক্ষা করে। কিছুক্ষণ বাদে যেন খানিকটা সুস্থ হয়ে জমাদারের বুকে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে থাকে, ওগো দারোগা সাহেব, আমায় ছেড়ে যেয়োনা আমি ঠিক মরে যাব।

এ পরশ, এ ক্রন্দন, এ আবেদন জমাদারের বুকে তুফান তোলে। আর নিজেকে রক্ষা ক'রতে পারছে না সে রক্তমাংসেরই মানুষ ত।

—বিবিকে ছেড়ে যাবে না সে—কর্তব্য ?—চুলোয় যাক কর্তব্য, আর খুনীর পেছনে ঘোরাই কি শুধু কর্তব্য ?—এই যে পরমাসুন্দরী ভীতা একটি অবলা আশ্রয় চাইছে,—একে আশ্রয় দেওয়া কি কর্তব্য নয় ?—এ-ও ত কর্তব্য—আর এ অবস্থায় তুলসীদাসজীইত ব'লেছেন—কি ব'লেছেন অবশ্য তা ঠিক মনে আসছে না—যাহোক ব'লেছেন ত। কিন্তু চাকরী ? এ কৈফিয়তে চাকরী থাকবে কি ? আরে ধ্যেৎ, পাগল হয়েছ ? কেই বা দেখতে আসছে, আর কেই বা কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।—আর যদি দরকারই হয়, সে তখন যাহোক একটা দিলেই চ'লবে।

তার নন্দী আর ভৃংগীর দিকে তাকিয়ে বলে জমাদার—আরে রামলগণ রামভজন ভাইয়ো! এতনী রাতকো আসামীকো পাত্তা মিলগী ?—জমাদারের ইংগিত তারা সহজেই বুঝতে পারে—জমাদারের অনুচর ত। মাথা নেড়ে বলে—কভি নেহি।

—তব্ ?

এই "তব্"টা যে কি তা তারা ঠিক ঠাহর করতে পারে না। প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। জমাদারই "তব্" এর মানে প্রাঞ্জল ক'রে দেয়—বলে —তব্ এইসি ঢুড়নেমে ক্যা ফয়দা হোগা ? তারা সজোরে শির সঞ্চালন ক'রে জানায় —কুছ নেহি। —তব্ জেড়াসে হিয়া ঠাহর যাও।···'জেড়াসে' কেন, সারা রাত্তিরই 'ঠাহর'তে তাদের আপত্তি কি ?

ঘরে ঢুকতেই কিশোরকে দেখতে পায় জমাদার, বলে—আরে ইয়ে কৌন্ বা ? নর্তকী উত্তর দেয়—আমার তবলচী। জমাদার বিস্মিত হয়। বলে—তবলচী ? আরে এতনা ছোট ছেলিয়া তবলার কি বুঝেসে ? নর্তকী বলে—খুব বোঝে, খুব বোঝে। নাও, এখন বোস ত! ও সেপাইজীরা তোমরাই বা দাঁড়িয়ে কেন ? আপ্যায়িত সেপাই দু'জন ব'সে পড়ে ···

ধেনো মদের স্রোতে জমাদার আর সেপাই দুজন ভেসে যায়। সব রকমের মদই সংগ্রহ থাকে নর্তকীর—সব রকমের লোকই ত তার ঘরে আসে! · মদের ঝোঁকে তিন জনই

উপরওয়ালা তাবেদারের অহিনকুল-মাফিক মধুর সম্পর্ক ভুলে, সাম্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গলা জড়িয়ে একেবারে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল এবং তার পরেতে একেবারে বুঁদ—নট্ নড়ন-চড়ন।

অতি বিস্ময়ে কিশোর এতক্ষণ নির্বাক হয়ে এই রহস্যময়ী নর্তকীর অদ্ভুত কার্য-কলাপ দেখছিল। ছবির মত ঘটনাগুলো তার চোখের সামনে দিয়ে পর পর ঘটে গেল। সে যেন নীরব দর্শক মাত্র।··· ··· এবার নর্তকীর খোলস খসে প'ড়ল—বেরিয়ে এল কিশোরের দিদি। দিদি তার কাছে গিয়ে ব'সল। হাত দুটি ধ'রে ধীরে ধীরে ব'লল—কিশোর আর রাত্রির ত বেশী নেই। এবার বাড়ী যাও ভাই। এ পথে আর কেউ ধ'রবে না তোমাকে। যারা ধরবার তারা তো ওই পড়ে ···

হঠাৎ কিশোর একি কাণ্ড ক'রে বসল,—পতিতার পায়েই প্রণাম ক'রে ফেলল সে। দিদি ত্রস্তে কিশোরকে ধ'রে বলে—ছিঃ, আমাকে কি প্রণাম করতে আছে ভাই? কিশোর মুখ তুলে বলে—কেন নেই; তুমি যে আমার দিদি।

—ওরে পাগল ছেলে! তুই আজ আমায় এ কি সম্মান দিলি?—দিদির চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে।

চোখ খুলতেই দেখতে পান কিশোর তার দিকে চেয়ে রয়েছে—একদৃষ্টে। সলজ্জ হাসি হেসে চোখ মুছে ফেলেন তিনি, বলেন,—কি যে এক রোগ হয়েছে, মিছিমিছি চোখ দিয়ে জল পড়ে। আর দেরী করা চলে না তোমার। এবার যাও তুমি।

কিশোর বলে,—চল দিদি, তুমিও আমার সংগে যাবে।

অকৃত্রিম বিস্ময়ে দিদি বলেন,—আমি? তোমার সংগে? কোথায়? ···

—কেন? আমাদের বাড়ীতে!—

—না, ভাই, তোমাদের বাড়ীতে? আমি? বিষণ্ণ হেসে দিদি বলেন—পাগলা ভাই আমার কিছু বোঝ না। তা কি হয়?

কিশোর জোর দিয়ে বলে,—কেন হবে না? নিশ্চয় হবে!

রাত্রির আঁধার স্বচ্ছ হয়ে আসছে। আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলাতে আলোর প্রাধান্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।···

দিদি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন,—না, না, না, তা হয়না কিশোর, তুমি যাও, তুমি যাও। কিশোর বেঁকে বসে,—বললে কি হবে? তোমায় না নিয়ে আমি কিছুতেই এখান থেকে নড়ছি না।

ভোরের আলো উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। আর ত সময় নেই এখনি হয়ত কেউ এসে পড়বে···এখনি হয়ত ওরা উঠে পড়বে। যদি কিশোরকে ওরা ধরে ফেলে।

—কিশোর।—চমকে ওঠে কিশোর।—বেশ্যার বাড়ীতে রাত কাটাতে বুঝি খুব ভাল লাগে—নড়তে ইচ্ছে করে না, না?—একি কথা? কিশোর স্তম্ভিত হয়ে দিদির দিকে—

তাকিয়ে থাকে, একি পরিহাস ? না না—কই, ও মুখে ত স্নেহ-প্রীতির চিহ্ন মাত্র নেই—তবে কি সে ভুল বুঝেছিল ?

কিশোরের বিস্ময়ভরা বিমূঢ় দৃষ্টি দিদির হৃদয়কে চুরমার করে ভেংগে দেয়।

ওরে পিশাচী, একটু ধৈর্য ধর। কাঁদিস না,—কাঁদবার জন্য সারা জীবনই ত পড়ে রয়েছে—দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসংবরণ করেন তিনি। তবু দু'ফোটা জল বিশ্বাসঘাতকতা করে।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে অরুণ কিরণ ঝিকমিক করছে। সবুজ পাতাগুলো আনন্দচঞ্চল হয়ে উঠেছে সোনাল আলোর পরশ পেয়ে। আর যে সময় নেই। শেষ চেষ্টায় কণ্ঠে সবটুকু গরল ঢেলে দিয়ে চাপা তীব্র স্বরে দিদি বলেন—এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ ? যাও বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

কশাহতের মত মাথা নীচু করে বেরিয়ে যায় কিশোর। দরজার বাজুতে মাথা দিয়ে দিদি দাঁড়িয়ে থাকেন,—চেয়ে থাকেন কিশোরের অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে।

একটা ছিটকে-পড়া দুঃসাহসী জাত হারাবার ভয়হীন দামাল সূর্যরশ্মি আলোর তিলক পড়িয়ে দেয় পতিতার ললাটে।

এবারে চোখের জল আর বাধা মানে না, অঝোর ধারায় ঝরে পড়ে। দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে আসে,—তবু, তবু চেয়ে থাকেন চলমান কিশোরের দিকে।

চলে যায়—চলে যায় কিশোর—ব্যগ্র ব্যাকুল আকুল দৃষ্টির সম্মুখ থেকে চলে যায়—চলে যায় দূরে বহুদূরে—যায়, মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে—লুটিয়ে পড়েন দিদি।

ভুল

দেবব্রত চন্দ্র
চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উক্তি আজ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হ'ল রিচার্ডের কাছে। পৃথিবী রংগমঞ্চ নয়, জীবন নাটক নয়। জীবনের মধ্যে নাটকীয়ত্ব যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও নাটকের মধ্যে জীবন অবান্তর, অর্থহীন। অন্ততঃ পেশাদার রংগমঞ্চের ম্যানেজারদের অভিমত তাই। জীবনের হুবহু প্রতিলিপি সমাদৃত হয় না ; এটা তাঁদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত সত্য। হিংসা-দ্বেষ-শাঠ্য-বঞ্চনা-জর্জরিত পৃথিবীতে সত্যের স্থান কোথায় ? অগণন বঞ্চিত মানুষের হতাশা ও বেদনার কাহিনী অপমান ও লাঞ্ছনার উদ্ঘাটন, অভাব ও অভিযোগের প্রতিধ্বনি নিষ্ঠুর সত্যের আবিকৃত রূপায়ণ ব'লেই ত অবাঞ্ছিত।

তবু, তবু রিচার্ডের নাটক গ্রহণ না ক'রলেও রিচার্ডকে অস্বীকার করতে পারেন না তাঁরা,—অন্ততঃ রীগ্যাল্ থিয়েটারের ম্যানেজার মিঃ র্যামসে পারেন না। আজ আঠারো

বছর থিয়েটারের ম্যানেজারি ক'রছেন তিনি, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাট্যকার—এদের মুখ দেখলেই তিনি বুঝতে পারেন কার কতটা শক্তি। রিচার্ডের মধ্যে যে ছাই-চাপা আগুন রয়েছে সে কি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে? তা'ছাড়া আজ প্রায় আট মাস ধ'রে রিচার্ড যাওয়া-আসা ক'রছে তাঁরই কাছে, রিচার্ডের জন্যে একটা কিছু না ক'রতে পারলে তাঁর অস্বস্তির সীমা থাকবে না। রিচার্ডকে তিনি সাহায্য করবেন, নিশ্চয়ই করবেন।

"তবে মুস্কিল এই যে 'রক্তাক্ত পৃথিবী' নাটকখানা—"

"বেশ ত'; ওটা না চলে আমার 'বহ্ন্যুৎসব' নাটকখানা না হয় একবার প'ড়ে দেখুন না!" আকুল আগ্রহে আর মিনতিতে রিচার্ড ভেংগে প'ড়ল।

"না, না—" ব'লে মিঃ র‍্যামসে ধীরে সুস্থে একটা সিগার ধরালেন, তারপর গলাটা একটু খাটো ক'রে বললেন, "মানে ব্যাপারটা এই যে ওরিয়েন্টের মিস্ ডরোথিকে আমাদের স্টেজে আনবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এদিকে মুস্কিল হয়েছে যে মিস্ ডরোথি আমাদের পুরোনো কোন নাটকে অভিনয় করতে রাজী নন। কাল সকালে নতুন নাটক নিয়ে গিয়ে তাঁকে পড়াতে হবে, সেটা পছন্দ হ'লে তবে তিনি পাকা কথা দেবেন। তাই বলছিলাম কি—"

"কিন্তু এতে মুস্কিল কি?" আনন্দের অসহনীয়তায় রিচার্ড আমতা আমতা ক'রে বলে, "আপনি যদি বলেন তা'হলে কাল আমার চারখানা নাটকই না হয় নিয়ে আসব আপনার কাছে। ওর মধ্যে যেটা পছন্দ হয়—"

"তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি! কিন্তু মানুষের সত্যকার জীবন-বেদ নিয়ে লেখা নাটকে পয়সা আসে না। তাই এমন নাটক চাই যার প্রধান স্ত্রী-চরিত্র অফুরন্ত নাচবে, গাইবে—অভিনয়াংশ থাকবে তারই সবচেয়ে বেশী, বিচিত্র পোষাক-পরিধানের বিবিধ সুযোগও তার থাকা চাই ইত্যাদি ইত্যাদি।"

অসংগত অসম্ভব এই প্রস্তাবে রিচার্ডের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। একটা নির্বোধ অভিনেত্রীর ফরমায়েস মত তা'কে নাটক লিখতে হ'বে; এত বড় অপমান সে কি স্বীকার করে নিতে পারে? জীবনের সংগে সংশ্রববিহীন অবাস্তব মিথ্যা এক নারী-চরিত্রকে রূপে-রঙে-রসে উজ্জ্বল ক'রে সৃষ্টি করবে তারই লেখনী? মানুষের জীবন-বেদ তুচ্ছ প্রতিপন্ন হবে কাঞ্চন-মূল্যে?—কিন্তু জীবনে সুযোগ একবারই আসে। নাট্যকাররূপে পরিচিত হবার এই একমাত্র দুর্লভ সুযোগ।...

...আর কি মিষ্টি গন্ধ মিঃ র‍্যামসের ঐ সিগারটার!..

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখস্থ শ্রেণীতে সে বসতে পারবে, পাশে থাকবে মার্থা আর তা'র তিনটি ছেলে-মেয়ে—ঐ রকম একটা সিগার সে কিনবেই সেদিন। হ্যাঁ, রিচার্ড রাজী; কাল সকালেই সে নাটক নিয়ে আসবে। আজ সারারাত জেগে সে লিখবে—সারা রাত—।

.. দূরের গির্জার ঘড়িতে ঢঙ্ ঢঙ্ ক'রে তিনটে বাজল—কিন্তু এখন মাত্র তিনটে অংক শেষ হ'য়েছে—

চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে এক মনোরম উদ্যানে লুসির সংগে ছদ্মবেশী রাজপুত্রের অভিসার। লুসি বলছে,……কি লিখবে রিচার্ড? কি বলতে পারে লুসি? কিছুই মনে আসছে না? কি বলত মার্থা রিচার্ডকে ন'বছর আগে?

আবার, আবার সেই কান্না। তারস্বরে কান্না জুড়েছে তিনটি ছেলে-মেয়ে। মার্থাকে ধমকে উঠল রিচার্ড। "আর একটু থামাতে পারলে না ওদের?"

"কি করে থামাব বলতে পার?" মার্থা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে। "খানিকটা দুধ কি এক টুকরো রুটি জোটাবার মুরোদও যদি থাকত!"

"আজকের রাত শুধু, আজকের এই রাতটুকুর মত যেমন পার ওদের চুপ করিয়ে রাখ মার্থা, দোহাই তোমার!" মিনতিতে ভেঙে পড়ে রিচার্ড, "কাল যা চাও সব দেব—সব।"

খট্ খট্ শব্দে রিচার্ড টাইপ-রাইটারের চাবিগুলোর ওপর আংগুল চালাতে লাগল। পল্লীবালিকা লুসিকে সে সাম্রাজ্ঞী বানাবেই আজকের রাতে, যে ভাবেই হোক, যেমন করেই হোক।

সকাল সাতটা বেজে গেল, লুসির অভিষেক এখনও বাকী, রিচার্ড পাগলের মত টাইপ করে যাচ্ছে। ঘরময় কাগজ ছড়ানো। ছেলে-মেয়েরা আর মার্থা তখনও অকাতরে ঘুমিয়ে।

দরজায় টোকা পড়ল। দৌড়ে গিয়ে রিচার্ড দরজা খুলে দিল, সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ র‍্যামসে, মুখে সিগার।

…কি মিষ্টি গন্ধ সিগারটার! প্রাণ ভ'রে ঘ্রাণ নিতে লাগল রিচার্ড।

"হ্যাঁ, নাটক প্রায় সম্পূর্ণ, একটা পাতা শুধু বাকী।"

"বেশ ত, শেষ করে নিন ওটুকু, আমি একটু বসছি না হয়। কিংবা ততক্ষণ আমি বরং নম্বর অনুযায়ী পাতাগুলো সাজিয়ে ফেলি।"

মিঃ র‍্যামসে হেঁট হয়ে পাতাগুলো কুড়োতে লাগলেন।

খট্ খট্ খট্—লুসি আসছে দরবারে। "এ কি করেছেন?" মিঃ র‍্যামসে যেন আর্তনাদ করে উঠলেন। "এ যে সব শাদা কাগজ।"

"শাদা!" রিচার্ডকে কে যেন পাথির বানিয়ে দিল।

"হ্যাঁ শাদাই ত। দেখি দেখি—আরে মেশিনে কারবন লাগাতে ভুলে গেছেন?—" রাগে আক্রোশে র‍্যামসে বলে উঠলেন—"অপদার্থ, অপদার্থ কোথাকার।"

"শাদা, শাদা!" অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে রিচার্ড। শাদা দেওয়াল প্রতিধ্বনি তুলে বলে, "শাদা,শাদা"।* Im

---

* বিদেশী গল্পের ভাব অবলম্বনে।

জীবন ও যৌবন

শান্তিকুমার ঘোষ
চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্

যৌবন-তুফান আজি লাগিয়াছে পালে—
টলমল ঘুরে যায় জীবনের তরী !
হে মোর ভাগ্যের নেয়ে, বোসো আজি হালে
নিজ হাতে খুলে দাও বাঁধনের দড়ি।

কালি-লেপা মেঘে আজি ঘনায় আঁধার
ঘন-বৃষ্টি আচ্ছাদনে ; এপার ওপার
কোথায় হারায়ে যায়। দেখি আঁখি মেলি'
উদ্দাম কল্লোলস্রোত উঠেছে উদ্বেলি'
বাধা-বন্ধহারা। রক্তে মোর লাগে দোল,
আকাশ-বাতাস ভরি, একি কলরোল
আকুল করেছে মোরে। কাহার আহ্বান
ধ্বনিল মেঘের মন্দ্রে—হ'ল খান্ খান্
আমার শৃংখল আজি। হে মোর কাণ্ডারী,
উধাও অজানা মাঝে দিব আজি পাড়ি।

সিন্ধুর প্রতি

অসিত ভট্টাচার্য
দ্বিতীয় বর্ষ, আর্টস্

হে কালের বন্দী-বন্ধু, উচ্ছ্ংখল আবেগের দল
লুটায়ে টুটায়ে দাও, তন্বী ঐ বেলার শৃংখল-
স্বর্ণমোহবাহুপাশে।
প্রচণ্ড আবেগে আন, হান তুমি
তাড়ন-উচ্ছ্বাস।
নিম্নে চেয়ে দেখে মুগ্ধ, মূঢ়ঘন ঐ নীলাকাশ ঃ—
নাচিতেছে তরংগ উদ্বেল, আদিম রজনী হ'তে
মৃত মুকুলের কান্না, মেশে আসি, চিরন্তন স্রোতে

তোমার অশান্ত বক্ষে; তাই ওগো রত্নাকর,
মুক্তা হল অশ্রুবিন্দু, মানুষের বাসনা দুর্বার
ফেনায়, ফেনায় পুঞ্জে, উচ্ছ্বসিয়া, উদ্বেলিয়া উঠে
ব্যথায় সুনীল-কান্তি, মায়াক্ষীণ বেলাপ্রান্তে টুটে
উত্তরের অপেক্ষায়। কালের ক্রন্দনরাশি—
প্রতিহত-বেদনায়, ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে হাসি'।

রাতের আঁধারে যবে আকাশের বুকে ফোটে তারা
কালের স্বপনগুলি সু-দুর্জয়, বাধা বন্ধ-হারা;
লক্ষ লক্ষ বাহু মেলি' আকাশের পানে তাই চাও,
বহুদূর, বহুদূর, বেদনায় চেতন হারাও।

আজ আমি শূন্য যেন, স্বপ্ন সম মনে হয় দিন,—
বিস্ময়-বেদন-ভরা, কুমারী সে শূন্য সীমাহীন—
তার-ই মাঝে, বিন্দুসমা পৃথ্বী হায়, কোথায় বিলীন।
এই শ্যাম-ঘন পৃথ্বী, সঘন পাষাণ-পুঞ্জে যা'র
নির্ঝরের অশ্রু ঝরে, স্তরে স্তরে ঘন মেঘ-হার
বক্ষে দোলে, রাশি রাশি ঘাসে আর ফুলে
শৈশবের স্বপ্ন যত ফুটে ওঠে, নেচে ওঠে দুলে।

তার-ই মাঝে বহে কাল, শংকা, সুখ, লজ্জা আর আশা,
মোর বহুপুরুষের একই প্রেম, একই ভয় ভাষা।
আজ মোরা মনে হয়, সু-তুচ্ছ ক্ষনিক শুধু আমি
কালের মানবস্রোতে, এ মহামালার বুকে ফুল সে অনামী।
মোর দুঃখ, মোর সুখ, মোর শংকা, মোর লজ্জা ভয়
উদ্দাম উত্তাল বক্ষে, চক্ষে শুধু স্বপ্ন মনে হয়;
মহাকাল সূর্য যেন, আমি এক সূর্যমুখী ফুল,—
উভয়ে চরম সত্য, তবু আমি কতবড় ভুল
উদ্দেশ ও অর্থহারা।

ওগো সর্ব-শ্রান্তি হারা,
সুনীল, ফেনিল বক্ষে, ঘনায়েছে দুরন্ত সংঘাত,
বুভুক্ষু বক্ষেতে মম, আনো, হানো প্রচণ্ড আঘত
দুঃসহ আবেগে।
লুটে যাই, টুটে যাই, শুধু এক অন্ধ মহাবেগে ;
উদ্দাম উত্তাল একা অর্থহীন সর্বলুপ্তি মাঝে
কল্লোল উচ্ছ্বাসে শুধু, চিত্তের বেদন যেন বাজে।

উজ্জীবন

নবীগোপাল চক্রবর্তী
চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান

মৃত রাত্রির অন্ধকারের স্তূপ
নির্মম হাতে ভেঙে,
আমরা নেমেছি পথে—
শত দধীচির পাঁজর-গুঁড়ানো পথে।
নতুন যুগের আমরা নও-জোয়ান,
আমাদের বুকে শোণিত ধারায় কোটি সূর্যের গান।
ভাঙবো, ভাঙবো, ভাঙবো,
যুগান্তরের পাষাণ-প্রাচীর ভাঙবো,
দুরাশার পথ গড়বো।
সূর্যের সন্তান,
মত্ত হাওয়ায় মেলেছি ঊর্ধ্বে দৃপ্ত লাল নিশান।
স্বেচ্ছাচারের স্বর্গ-রাজ্যে সুখে
বণিক-বিধাতা ঝিমোয় নেশার ঘুমে।
আমরা আঘাত হানবো,
স্বার্থপর স্বর্গ-রাজের স্বর্ণ-তোরণ ভাঙবো।
বন্ধ্যা এ ভূমি বিদীর্ণ ক'রে,
শস্য শপথ আনবো।
পেয়েছি নতুন প্রাণ
আমাদের বুকে শোণিতধারায় কোটি সূর্যের গান।

পুস্তক-সমালোচনা

বাংলা সাহিত্যের কথা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, হইতে সরস্বতী লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে দশ টাকা।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যাহা নানা সাময়িক পত্রে বা সংকলন-পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল বর্তমান গ্রন্থ তাহাদের সমষ্টি। এই গ্রন্থে তেরটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে তন্মধ্যে চারটি প্রবন্ধের বিষয় উপন্যাস-সাহিত্য, চারটি প্রবন্ধে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ বিশেষ দিক আলোচিত হইয়াছে, তিনটি প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিতার কোন কোন অংশ আলোচিত হইয়াছে, একটি প্রবন্ধের বিষয় রূপকথা এবং বাকী প্রবন্ধটিতে বংগ-সাহিত্যে পদ্যের উদ্ভবের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

বাংলার সমালোচনা-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত অপরিপুষ্ট। বৈষ্ণব কবিরা উচ্চাংগের গীতি-কবিতা লিখিয়াছিলেন; বৈষ্ণব রসবেত্তারা অলংকার শাস্ত্র বা দর্শন শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা করেন নাই। আধুনিক যুগে বংকিমচন্দ্র বংগ-সাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সাময়িক পত্রে কিছু কিছু সমালোচনা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং সেই সকল প্রবন্ধে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তা বর্তমান। কিন্তু তিনি সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনার সর্বপ্রধান গুণ সরলতা। কিন্তু সোজা কথায় সাহিত্যের রস বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার অধিকাংশ রচনায় তিনি সাহিত্যের দুরবগাহ রহস্য-লোকে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার গীতিকবিতা-সম্বন্ধীয় বা ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়ক প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু তিনি সমালোচনা-সাহিত্যকে অপরিপূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বহু হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল প্রবন্ধ নূতন সৃষ্টি; বিষয়-বস্তুর নিরপেক্ষ বিচার বা বিশ্লেষণ তাহার মধ্যে নাই।

বংকিমোত্তর বংগ-সাহিত্যের সমালোচকগণকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল সমালোচক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন; যাহা তাঁহাদের ভাল লাগে সেই সম্পর্কে তাঁহারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন; তাঁহাদের উপলব্ধি কতটা যুক্তিসংগত তাহা তলাইয়া দেখেন না। অপর এক শ্রেণীর সমালোচকগণ কোন বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস করেন এবং সাহিত্যকে সেই বিশেষ মতবাদের অংগীভূত বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বা সাহিত্যকে অংলকারের নিদর্শন বলিয়া প্রচার করেন। অতি আধুনিককালে দুই শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচক দেখা যায়। একদল সাহিত্য-সমালোচক সাহিত্যকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি মাত্র বলিয়া প্রচার করেন। প্রতিভা যে অনন্যতর রসের সৃষ্টি করে তাহা ইঁহাদের সমালোচনা হইতে বাদ পড়িয়া যায়। আর এক শ্রেণীর বিশৃংখলবাক্ লেখক আছেন যাঁহাদের রচনায় পূর্বোল্লিখিত সকল শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের সম্মিলন বা খিচুড়ি পাওয়া যায়। ইঁহাদের সমালোচনা প্রলাপোক্তিসদৃশ।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল দল হইতে স্বতন্ত্র। তিনি সাহিত্যকে সৌন্দর্যের সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন এবং সকল রকম অবান্তর ধারণা হইতে বিমুক্ত হইয়া অবিচলিতমনে সেই সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করেন। সাহিত্য সাহিত্যিকের সৃষ্ট বস্তু; সেই হিসাবে তাহা বোদ্ধার উপলব্ধি হইতে পৃথক্। কিন্তু বোদ্ধা স্বীয় উপলব্ধির দ্বারাই ইহার সৌন্দর্য উপভোগ করেন। আমাদের প্রাচীন আলংকারিকেরা কবি-বোদ্ধাকে সহৃদয় আখ্যা দিয়াছেন। পুনঃপুনঃ কাব্যাভ্যাসফলে যাঁহার মন স্বচ্ছ মুকুরের মত হইয়াছে; যিনি কাব্যবর্ণিত বিষয়ে তন্ময় হইতে পারেন এবং কবিহৃদয়ের সংগে মিলিত হইতে পারেন তিনিই সহৃদয় ব্যক্তি। এই আখ্যা যদি কোন

সমালোচকে প্রযুক্ত হইতে পারে তিনি ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈষ্ণব-কবিতা সম্পর্কে তাঁহার আলোচনার বিচার করিলেই তাঁহার সংগে অন্যান্য সমালোচকদের পার্থক্য প্রমাণিত হইবে। অপরাপর সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব-কবিতার আলোচনা করিয়াছেন ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া, কেহ কেহ ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া ইহার প্রতি অগ্রসর হইয়াছেন; যাঁহারা ভক্তিরস অতিক্রম করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছেন তাঁহারাও বৈষ্ণব অলংকার শাস্ত্রের গণ্ডী ছাড়াইতে পারেন নাই। আর এক শ্রেণীর সমালোচক আখ্যায়িকাকে প্রাধান্য দিয়া আখ্যায়িকার অন্তরালবর্তী রসধারার সন্ধান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব, অলংকারতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতিকে গৌণ করিয়া বৈষ্ণব-কাব্যকে সৌন্দর্যসৃষ্টি হিসাবে দেখিয়াছেন এবং এই কারণে কাব্যরসের মর্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার চোখ দিয়া দেখিলে বৈষ্ণব-কবিতার রহস্য ও মহিমার সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে এবং তিনি রসসৃষ্টির প্রতি অচঞ্চল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতিরও যথাযথ মূল্য দিতে পারিয়াছেন। এই কারণেই তিনি বিদ্যাপতির অপেক্ষাকৃত অবহেলিত রচনা কীর্তিলতাকে যথোপযুক্ত মূল্য দিতে পারিয়াছেন এবং তথাকথিত "দীন" চণ্ডীদাসের নীরস আখ্যায়িকাশ্রেণীর কাব্যের সংগে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাসের রচনার সংযোগ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে চারটি প্রবন্ধ আছে তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটকের সম্পূর্ণাংগ সমালোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এত বিস্তৃত, পুংখানুপুংখ, সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা আর কোথায়ও দেখা যায় না। বিশেষ করিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স্ প্রভৃতি অন্যান্য রোমান্টিক কবিদের কাব্যের সংগে রবীন্দ্রকাব্যের তুলনামূলক বিচার করিয়া সমালোচক রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্যটি ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ, রূপকপ্রবণতা, মাটির পৃথিবীর মূক, নগ্ন, মৌন, অশোধিত জীবনের সংগে নিবিড় সহানুভূতি কেমন করিয়া তাঁহার কাব্যে মৌলিকতা দান করিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে।

একটি বিষয়ে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ সুবিচার করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কাব্যের অতিশয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং যেখানে যেখানে রবীন্দ্রনাথ এই নূতন পরীক্ষায় সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে মোটের উপর এই প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। ইহা সত্য যে অনাদিকাল হইতে কবিরা ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ছন্দ কাব্যকে গদ্যের সমতলক্ষেত্র হইতে কল্পনার আকাশে উন্নীত করিতে সাহায্য করে। কিন্তু তবু মনে হয় 'কোপাই' প্রভৃতি গদ্য-কবিতায় এমন একটা বিস্তৃতি এবং কঠিন-কোমলের সমন্বয় আছে যাহার পক্ষে ছন্দোবদ্ধ কাব্য উপযুক্ত বাহন হইত না। ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ইংরেজি বাইবেলের কাব্য-রস অনস্বীকার্য। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কাব্য-মহিমা স্বীকার করিয়া ইহাদের আভ্যন্তরীণ rhythm বা ধ্বনি-প্রবাহের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ধ্বনি-প্রবাহ বা rhythm এবং ছন্দ বা metre এক বস্তু নহে এবং যে প্রকাশভংগীর অনন্যসাধারণত্বকে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের একাধিক বাংলা গদ্য-কবিতায়, ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রভৃতিতে বিদ্যমান এবং ইহা স্বীকার করিয়াই সমালোচককে কাব্যে ছন্দের স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। মনে হয় Critical Theories and Poetical Practice in Lyrical Ballads গ্রন্থে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ছন্দের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত খণ্ডন করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তি বর্তমান আলোচনায় তাঁহার দৃষ্টি আংশিকভাবে সংকুচিত করিয়াছে।

উপন্যাস সম্পর্কে যে কয়টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার মধ্যেও উচ্চাংগের অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের আলোচনার বৈশিষ্ট্য এই যে "বংগসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'তে উপন্যাসের যে সকল বিষয় তিনি বাদ দিয়াছেন এইখানে সেই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দুইটি প্রবন্ধ সমসাময়িক সমালোচকদের প্রত্যুত্তর হিসাবে লিখিত হইয়াছে। যে সকল সমালোচক তাঁহার পূর্ব-প্রকাশিত মতের

বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মত যুক্তিহীন, অনুভূতি পংগু ; তাঁহারা সাহিত্য-রসের অনধিকারী। এই সকল খণ্ডিতদৃষ্টি ও বিশৃংখলবাক্ সমালোচকদের মতবাদ এইরূপ গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়ার যোগ্য নহে এবং প্রথম দৃষ্টিতে এই দুইটি প্রবন্ধ একটু নীচুস্তরের বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পূর্বপক্ষ যত অকিঞ্চিৎকরই হউক না কেন, ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার খণ্ডনে যে যুক্তিজালের অবতারণা করিয়াছেন তন্মধ্যে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও রসোপলব্ধির ছাপ সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং তুচ্ছবিষয়ের মধ্যে অনন্যসাধারণ সম্ভাব্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মতের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "রাজলক্ষ্মী ধর্ম-সংস্কারের ও আচারগত শুচিতার তাগিদে যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অধিকারলোপের ভয়ে আবার তাহারই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া একটা হাস্যময় অসংগতির সৃষ্টি করিয়াছে"। রাজলক্ষ্মী যে শ্রীকান্তের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে তাহা কি অধিকারলোপের ভয়ে? শ্রীকান্তকে প্রত্যাখ্যান এবং শ্রীকান্তের পশ্চাদ্ধাবনে যে অসংগতি রহিয়াছে তাহা কি হাস্যকর না ট্রাজেডির লক্ষণাক্রান্ত?

'রূপকথা' ও 'বংগসাহিত্যে গল্পের উদ্ভব" প্রবন্ধ দুইটিতে বিশ্লেষণ ও বিচারকুশলতা অব্যাহত আছে এই দুইটি প্রবন্ধে সাহিত্যের ও বংগসাহিত্যের বিশেষ অংশের উপর নূতন আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। গ্রন্থ-বিস্তারের ভয়ে এই দুইটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধের আলোচনা সম্ভব হইল না। উপসংহারে শুধু এই বলিতে পারি যে শুধু বংগ-সাহিত্যে কেন, যে কোন সাহিত্যে এইরূপ প্রবন্ধসমষ্টি বিরল। মননশক্তির তীক্ষ্ণতায়, অনুভূতির প্রগাঢ়তায় এবং অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় এই গ্রন্থ Pater রচিত Appreciations-এর সংগে তুলনীয়।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। সিগ্‌নেট প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চার টাকা।

স্বাধীন ভারতের পশ্চিম-বংগের প্রথম প্রধান-মন্ত্রী ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিশিষ্ট রাসায়নিক ও রাজনীতিবিদ্ বলিয়াই খ্যাত। কিন্তু তাঁহার লিখিত 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের-পাঠক-মাত্রই তাঁহার সংস্কৃতে সু-গভীর জ্ঞান ও সাহিত্যের রসবোধের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবেন। রসায়ন-শাস্ত্রের সহিত ইতিহাসের কোনও যৌগিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানি না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একদা বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন যে, ঐতিহাসিক হইবার ইচ্ছাই তাঁহার মনে বরাবর বলবতী ছিল; কেবল কয়েকটি আকস্মিক ঘটনার ফলে তিনি রাসায়নিক হইয়া গিয়াছিলেন। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, আচার্য রায় মহাশয় বিলাতে তাঁহার ছাত্রাবস্থায়ই সিপাহী-যুদ্ধের একখানি ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁহার রচিত History of Hindu Chemistry একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ এবং উহা তাঁহার ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির সম্যক্ পরিচায়ক তো বটেই। এই দিক্ দিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—এই দুইজন মনীষীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে: উভয়েই প্রধানতঃ রাসায়ন-শাস্ত্রের সাধনা করিয়া অবসরকালে ইতিহাসের চর্চা করিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ ঘোষের 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থখানি যে অবস্থায় রচিত হইয়াছে তাহা সত্যই অভিনব। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, উদীয়মান রাসায়নিক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ রাজকীয় টংক-শালার সহকারি-কর্মাধ্যক্ষের (Deputy Assay-Master) পদ ভারতীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে লাভ করিয়াও একদিন হঠাৎ ধূলি-মুষ্টির মত তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে দেশের কার্যে নিঃশেষে সমর্পন করিলেন। ফলে রাজশক্তির সহিত বিরোধ এবং দীর্ঘ কারাবাস। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অল্পকালের মধ্যে এই রাসায়নিক ঐতিহাসিকে পরিণত হইলেন। পণ্ডিত জওহরলাল এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের মত ডাক্তার ঘোষও তাঁহার কারাবাসের সময়টা পর্যন্ত দেশের সেবায় নিয়োজিত করিলেন। Discovery of India এবং India Divided-এই দুইখানা পুস্তকের ন্যায় ডাক্তার ঘোষের 'প্রাচীন

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। সহজ, সাবলীল ভাষায় মাত্র ২৬৪ পৃষ্ঠার এই পুস্তকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে চিত্র অংকিত করিয়াছেন, তাহা অতীব মনোজ্ঞ।

প্রত্যেক সভ্যতাই একটি বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থান ও রাষ্ট্র-বিধানের বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠে এবং ঐ বনিয়াদের প্রসার ও উন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট সভ্যতারও বিকাশ হয়। কিন্তু সেই বনিয়াদ যদি শিথিল বা দুর্বল হয়, তাহা হইলে তাহার উপর নির্ভরশীল সভ্যতারও অবনতি ঘটে, ইহাই ধ্রুব সত্য। সামাজিক সাম্য ও জনমতপ্রধান-রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রাচীন রোমক সভ্যতার উত্থান হইতে পারিয়াছিল এবং সমাজে অসাম্য ও রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বৈরাচার প্রবেশ করায় ঐ সভ্যতার পতন হইয়াছে। এইভাবে মধ্য-যুগের য়ুরোপায় সভ্যতাও সামন্ততন্ত্রী সমাজ এবং রাষ্ট্র-বিধানের বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠে আবার ঐ সমাজ ও রাষ্ট্র-বিধানের পরিবর্তনের ফলেই ঐ সভ্যতারও পরিবর্তন হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাও সেইরূপ একটি বিশেষ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। গুণ ও কর্মানুযায়ী বর্ণাশ্রমধর্মী সমাজ এবং কর্মবাদে একান্ত বিশ্বাসবান্ রাজা কর্তৃক পরিচালিত শাসনতন্ত্রের আশ্রয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের সমীকরণ শক্তি (assimilating power) ছিল অসীম। গ্রীক হইতে আরম্ভ করিয়া শক, হুণ প্রভৃতি বহু জাতি যাহারা একদা রক্ত-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া ধন ও রাজ্য লোভে এই দেশ আক্রমণ করিয়াছিল কালে তাহারা সকলেই, কবির ভাষায়, ভারতের 'এক দেহে হোলো লীন'। বিদেশী শত্রু সম্পূর্ণ ভারতবাসী হইয়া গিয়াছে এবং তাহারাই আবার ভারতীয় সভ্যতার জয়-পতাকা দিকে দিকে বহন করিয়াছে। কিন্তু যে যুগ হইতে ভারতীয় সমাজ গুণ ও কর্মের বিভাগজ বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল বংশানুক্রমলব্ধ জাতি-ভেদের উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয় উঠিল এবং শাসন-তন্ত্রের পরিচালক রাজাও কর্মবাদে বিশ্বাসহীন হইয়া স্বৈরতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রচলিত করিতে লাগিলেন সেই যুগ হইতেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হইল। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ও অবনতির সুসবংদ্ধ ইতিহাস দেশের বর্তমান যুগে অতীব শিক্ষাপ্রদ কাহিনী। এই সু-প্রাচীন সভ্যতার উৎপত্তির ও অবনতির কারণ সম্যক্ নির্ধারণ করিতে পারিলেই ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের অতীতের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং যে নূতন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংস্থাপনের উপর নব-পর্যায়ে স্বাধীন ভারতের নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে তাহা মধ্য-যুগের ও বর্তমান কালের দোষ-ত্রুটি হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতের আদর্শ হইবে। ভারত-ইতিহাসের ভারতীয় আলোচনাকারিগণের ইহাই আশা—ইহাই স্বপ্ন।

15 5»t5l€ta "?!®!5^?(

ডাঃ ঘোষ তাঁহার পুস্তকে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস বোধ হয় পূর্বোক্ত দৃষ্টিভংগী লইয়া আলোচনা করেন নাই। যে সামাজিক পরিবেশের উপর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কোন বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-তন্ত্রের কাঠামোর যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে আছে তাহাও কৌটিল্য-প্রণীত অর্থ-শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই রচিত; মনু-স্মৃতির উল্লেখও মধ্যে মধ্যে আছে। কৌটিল্যের ও মনুর যুগ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্যের গ্রন্থ (পৃঃ ১১০) এবং পুষ্যমিত্রের (পুষ্যামিত্র নয়; ১১২ পৃঃ) সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মনুর গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—এই মত ডাঃ ঘোষ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার পরবর্তীকালের বহু শত বৎসর যে রাষ্ট্র-শাসনপদ্ধতি ভারতীয় সভ্যতাকে ধারণ করিয়াছিল তাহার কোন আলোচনাই ডাঃ ঘোষ করেন নাই। গ্রন্থের নাম দেখিয়া আশা করিয়াছিলাম যে, সু-পণ্ডিত গ্রন্থকার ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিবরণের সহিত উহার উন্নতির ও অবনতির কারণও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে গ্রন্থকার আমাদিগকে কতকটা নিরাশ করিয়াছেন। 'হিন্দু-ভারতবর্ষের পতনের কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই' (১৭৬ পৃঃ) গ্রন্থকার শুধু ইহাই বলিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের এই একান্ত প্রয়োজনীয় প্রসংগের প্রতি সুবিচার হইয়াছে কি না, সন্দেহ।

সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-কলা, শিক্ষা, রাজ-কাহিনী ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, মো-অন্‌জোদড়ো ও হরপ্পা এবং

বৃহত্তর ভারত—এই নয়টি পরিচ্ছেদে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এক তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য বিবরণ আলোচ্য পুস্তকে আছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবদানাবলীর বর্ণনা বহুমূল্য। "প্রাচীন ভারতবর্ষ অংক, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ন প্রভৃতির বিভিন্ন শাখা, কাব্য, নাটক, গল্প প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগ ও দর্শনে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহন করিয়াছিল। এমন কি সেকালে জগতে অন্য কোন জাতি ভারতবর্ষের সমকক্ষ ছিল না।" (১৫২ পৃঃ)। গ্রন্থকারের এই মন্তব্যে ভারতীয় পাঠক দেশের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিবেন। কিন্তু এই বহুমুখী উন্নতির মূল "ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা যে শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন" গ্রন্থকারের এই মন্তব্য বিচারসহ কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে ৭১১ খৃষ্টাব্দে আরব সেনাপতি মহম্মদ ইবন কাসিম সিন্ধু প্রদেশ জয় করিয়া ভারতে মুসলমান সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন। ভারতীয়গণ অসংখ্য হইয়াও এই মুষ্টিমেয় আরব বিজেতাদিগকে সিন্ধু প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া উহা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। সিন্ধু বিজয়ের পরেও প্রায় তিন শত বৎসর ঐ একটি প্রদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুরাজত্ব ও সভ্যতাই প্রচলিত ছিল। তখনও পূর্বতন শিক্ষাপদ্ধতির কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই; পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণের ফলেই নালন্দা ও বিক্রমশীলার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। ঐ ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয় সকল প্রাচীন পদ্ধতিতেই শিক্ষা প্রদান করিতেছিল, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সাহিত্যে, ধর্মে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পকলায় প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু প্রধান অবদান তাহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই সাধিত হইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর পরে পূর্বতন শিক্ষা পদ্ধতি হিন্দু অধিকৃত ভারতে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি-শক্তি হ্রাস পায় এবং ভারতের রাজনৈতিক অবনতি আরম্ভ হয়। সুতরাং ভারতের পূর্বতন উন্নতির মূল তৎকালে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ব্যতিরেকে অন্যত্র অনুসন্ধান করাই সমীচীন।

বইখানি পড়িতে পড়িতে পুনঃপুনঃ মনে হইয়াছে যে কর্মব্যস্ত গ্রন্থকার উহার, বিশেষ করিয়া নবম পরিচ্ছেদের, প্রুফ কপি নিজে দেখিতে পারেন নাই। ফলে ইহার স্থানে স্থানে নানা প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি:—১০৩ পৃষ্ঠায় $৯\frac{১}{৮}$ মাইলে এক যোজন বলা হইয়াছে। আবার ঐ পৃষ্ঠায়ই ১৫৮১ যোজনকে ৭১৮২ মাইলের সমান ধরা হইয়াছে। পুনরায় ১০৪ পৃষ্ঠায় $\frac{৪১}{৪}$ মাইলে এক যোজন বলা হইয়াছে। বৃহত্তর ভারতের হিন্দুরাজ্য চম্পার অবস্থান বর্তমান আন্নামে—আসামে নয় (২৪২ পৃঃ); পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্যের সংস্কৃত নাম কম্বুজ, কাম্বোজ নয় (২৪২, ২৪৩, ২১৪পৃঃ) এবং ঐ সকল পৃষ্ঠায় ও ২৪৬ পৃষ্ঠার উল্লিখিত পূর্বতন হিন্দু রাজ্যের নাম কুনান নয়, ফুনান; কম্বুজের বিখ্যাত আঙকোর-ভাট একটি মন্দির—২৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত আঙকোরঠমের মত উহা কোনও স্থান বিশেষের নাম নয়; ২৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ফরাসী পণ্ডিতের নাম সোঁদে (M. Cœdes)—সিডিস নয় এবং তাঁহার মতে শ্রীবিজয় সুমাত্রা দ্বীপের অন্তর্গত পালেমবংগ-পালেমকংগ নয়; এবং ২৫৫ পৃষ্ঠায় শৈলেন্দ্রবংশের রাজধানী মালয় উপদ্বীপে (উপদ্বীপ নয়) রমেশ মজুমদার মহাশয়ের এই অভিমতের সমর্থক ইংরেজ পণ্ডিতের নাম কোয়ারিচ ওয়েলস (Dr H.G. Quaritch Wales) কাট্রিস ওয়েলস্ নয়। আঙকোর ভাট জগতের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই অভিমত (২৪৪ পৃঃ) ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ফরাসী পণ্ডিত আঁরি মুহো (Henri Mouhat) প্রদান করেন। ৭৪ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তিতে ব্যক্তিত্ব, ৭৬ পৃঃ দুই স্থানে ব্যয়সাপেক্ষ, ৮৩ পৃঃ ভারকেন্দ্র, ২০৭ পৃঃ কলমবদ্ধ এবং ঐ পৃষ্ঠায় পাল রাজারা ও পরে রাষ্ট্রকূট রাজারা, গুর্জর প্রতীহার রাজারা প্রভৃতি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় নাই বলিয়া মনে হয়। Printer's Devil (ছাপাখানার ভূত?) এর দৌরাত্ম্যের চিহ্নও বিরল নহে—৭৭ পৃঃ ৮ পংক্তি—বাধক্য [বার্ধক্য], ৮৭ পৃঃ ৮ পংক্তি—ব্রতা [পাতিব্রত্য], ২০৬ পৃঃ ২ পংক্তি—কালিম [কাসিম], ২৫৫ পৃঃ ১০পংক্তি—রাজারাজা (রাজরাজ) এবং ২৬২ পৃঃ ২২ পংক্তি—বৌদ্ধধর্ম (বৌদ্ধধর্মে)।

সমগ্রভাবে পুস্তকখানিকে বিচার করিলে পূর্বোক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ধর্তব্য নহে। গ্রন্থখানি অত্যন্ত সময়োপযোগী, সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। এইরূপ একখানা পুস্তকের অভাব বহুকাল ধরিয়া অনুভূত হইয়াছে। ডাঃ ঘোষ

সেই অভাব দূর করিয়াছেন। ইহার বহুল প্রচার আমরা কামনা করি এবং আশা করি শীঘ্রই ইহা ভারতের অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইবে। প্রাচীনযুগে ভারতীয় সভ্যতা কত উচ্চস্তরের ছিল তাহা এই বইখানির সাহায্যে ভারতবাসীরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া নূতন যুগে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর সভ্যতা স্থাপন করিতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইবে, আমরা এই আশাই পোষণ করি।

—সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য

ত্রিশূল—অমলেন্দু গুহ, দীপ্তিকল্যাণ ও রাম বসু প্রণীত। কলেজ ষ্ট্রীট, ক'লকাতা থেকে প্রোগ্রেসিভ ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

'ট্রাম', 'পাঠশালার কাব্য' ও 'সরণি' এই তিনটি কবিতা নিয়ে 'ত্রিশূল'। প্রকাশক ব'লচেন, কাব্য-রসিকদের সংগে তরুণ 'কবি-প্রতিভা'র পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই 'ত্রিশূলে'র প্রকাশ। তাঁর সংগে আমরা একমত হ'তে পারলাম না। কবি-যশঃপ্রার্থী তরুণত্রয়ের রচনায় 'প্রতিভা'র সর্বাংগীন নির্মল ঔজ্জ্বল্য তো নেই-ই, সত্যিকারের স্ফুলিংগেরও যথেষ্ট অভাব। হয়ত 'তাগিদে' লেখা বলেই এতে স্বতঃস্ফূর্তির অভাব দেখা দিয়েছে। যা-হোক কবিতাগুলি আমাদের শীর্ণ-খাতে ব'য়ে-যাওয়া নীতি-প্রোজ্জ্বল জীবনের গতানুগতিক ঘটনাপঞ্জীর চিত্রাংকণের দিক থেকে মোটামুটি সার্থক হয়েছে। কিন্তু যে ভাব-গভীরতা ও সৃজন-পটুত্ব থাকলে কবিতা পাঠকের মনে অনুভূতি-তরংগের সৃষ্টি করতে পারে, তা' এতে নেই; মধ্যে মধ্যে সুরুচির অভাবও আছে। যা-হোক, তরুণ কবিদের উদ্যম প্রশংসনীয় এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে তাঁরা তাঁদের 'কবি-প্রতিভা'র যোগ্যতার পরিচয় দেবেন।

—সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত; ষষ্ঠ বর্ষ, ইংরেজি

দৃষ্টিপাত—যাযাবর প্রণীত। নিউ এজ পাব্লিশার্স লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার সাহিত্য-সমাজে আজ-কাল যে সব লেখা বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, যাযাবর-প্রণীত "দৃষ্টিপাত" তাদের অন্যতম। প্রথমেই লক্ষ্য করবার বিষয় বইটি "বেলে-লেটারস" জাতীয়। বাহ্যতঃ অবশ্য এ'টিকে চিঠি-পত্র জাতীয় বলে মনে হয় না। সাহিত্যিক বিচারেও হয়ত লেখাটি না ভ্রমণ-পঞ্জী, না একটি সমগ্র উপন্যাস। কিন্তু এর জাত-নির্ণয় আমাদের কাজ নয়। লেখাটিকে পাঠকসমাজ একবাক্যে উঁচুদরের ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। হয়ত এই স্বীকৃতিতে বাড়াবাড়ি কিছু থাকতে পারে। তবু এই স্বীকৃতিতেই এর সাফল্যের পরিচয় রয়েছে। এক চালে বাজি মাত ক'রতে পারে এমন লেখা বাস্তবিক সচরাচর চোখে পড়ে না। "দৃষ্টিপাত" কিন্তু এই ধরণের লেখা। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হাতে হাতে পুরস্কার পেতে যাযাবরকেই এই প্রথম দেখলুম।

"দৃষ্টিপাতে"র কয়েক পাতা ওল্টালেই বেশ বুঝতে পারি লেখকের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে চলমান জগৎকে তিনি দেখেছেন। জীবনে যে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন সমাজের স্তরে স্তরে সঞ্চরণ ক'রে, তা' তাঁকে সহানুভূতি-শীল করেছে বহুলাংশে। তাই, তিনি যা দেখেছেন তা শুধু নির্ভুল-ভাবেই দেখেননি, দেখেছেন ব্যাপকভাবে একটি বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে। পাঠকের দৃষ্টি লেখক জাগ্রত করেছেন, কেবলমাত্র আকর্ষণই করেননি। সমাজ-বহির্ভূত যাযাবরের মতই লেখক যেন জীবনকে দেখে চলেছেন আকাশ-পথ থেকে। আর আমরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছি অজান্তে।

ঘটনা-বিক্ষুব্ধ ভারতীয় রাজনীতির পটভূমিকায় যাযাবর ঐতিহাসিক দিল্লীর চলমান জীবনের উপর আলোক-সম্পাত করেছেন এবং পেছনে ফিরে স্মৃতি-মধুর অতীতকে রোমন্থন করেছেন বার বার। কোথায় বৃটিশ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী—আর কোথায় সেই সাধু নিজামুদ্দিন যিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—দিল্লী হনুজ্ দূর্ অস্ত্—

দিল্লী এখনও অনেক দূর। ১৯৪২, আর বিস্মৃত একাদশ শতক! কোথায় সেই রাজ্যনাশা পণ্ডিত-মূর্খ, বিকৃত-মস্তিষ্ক মহম্মদ; কোথায় সেই কবর-সমাহিত মেহেরউন্নিসা-উদিপুরীর দল! স্মৃতির পথ চেয়ে যাযাবর বারবার সেই স্মরণাতীত অতীতে ফিরে গেছেন।

রাজধানীর জীবন-স্রোতের টানে প্রত্যক্ষ বর্তমান ভেসে যাচ্ছে অতি দ্রুত গতিতে। দিল্লীর জীবনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানুষের গতিশীলতা, কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রবল প্রতিযোগিতা। বুদ্ধিজীবী বাংগালী, জীবনযুদ্ধে স্বার্থককাম মাদ্রাজী ও অতিকায় পাঞ্জাবী অফিসী-দিল্লীতে ভীড় করেছে। এখানে যে অফিসী-সমাজ গড়ে উঠেছে, তার আংগিকে যাযাবর বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন মানুষকে দেখেছেন বিশেষ দৃষ্টিভংগী দিয়ে। তার দৃষ্টি এড়ায়নি কিছুই। সামান্য দু-একটি কথার আঁচড়ে অলক্ষিত বহু বিষয়কে তিনি আমাদের গোচরে এনেছেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের সহজ এবং বলিষ্ঠ, অবাধ অথচ পরিমিত বাচন-ভংগীর পরিচয় মিলেছে বারবার; দেখিয়েছেন, এই বর্তমান, ইংগিতময় অতীত ও অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে দিল্লীনগরীর জীবনে। দিল্লীকে কি এর পর আরও জানতে হবে? দিল্লীনগরীর কার্যকালীন কোলাহল-দৃপ্ত ব্যস্ততা একদিন থামবে। হয়ত, একদিন এই কলহাস্যময় অশ্রান্ত-জীবন স্মৃতি-সমাকীর্ণ রাজধানী অতীতের চিত্রশালায় ছবি হয়েই থাকবে। কিন্তু আধারকর?···

আধারকর দিল্লীর একজন নাগরিক। ভালবাসার বিনিময়ে সে পেয়েছিল প্রবঞ্চনা। বঞ্চনাময় কয়েকটি দিনের ভাবনা ক'রে কত ঘাটে সে ঘুরলো। সুনন্দা ব্যানার্জি···লাহোর···সেই স্বপ্নালোকিত প্ল্যাটফর্ম্··· পুরাণো ক্ষতটা পীড়া দেয় বারবার···। কর্মক্লান্ত নগরীর জীবনধারা বইতে থাকে দ্রুত, অতি দ্রুত। হতভাগ্য আধারকরের যান্ত্রিক দিনগুলো কাটে। ভারতীয় রাজনীতির স্মরণীয় কয়েকটি মুহূর্তকে অবলম্বন করে রাজধানীর যে ছবি লেখক এঁকেছেন, তা বিষয়-বস্তু হলেও আসলে উপলক্ষ্য মাত্র। পাঠকের চোখে যেটি বিষয়-বস্তু বলে মনে হয় সেটি শুধু মূল কাহিনীর পরিবেশ। দিল্লীর বাহিরের জীবনযাত্রায় অন্তরালে বঞ্চিত আধারকরের কাহিনীই এর উৎসস্থল। জগতের যে প্রান্তে তাকাই, মানুষের সেই চিরকালীন দুঃখ আছেই—ভুল বোঝা, ভুল করা এবং দুঃখ পাওয়া। সেই পুরাতন কথা। যাযাবর সেই চিরন্তন গাথারই একজন অতিরিক্ত লিপিকার; আধারকর একটি টাইপ, রাজধানী দিল্লী ঘটনাকেন্দ্র মাত্র।

"দৃষ্টিপাত" পড়ে সত্যিই খানিকক্ষণ চমক ভাংগে নি। জীবনের অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে প্রকাশিত হ'তে দেখি নি। বিশ্লেষণ-বাহুল্য সত্ত্বেও দৃষ্টিপাতকে আমার ভাল লেগেছে। তরবারির ফলার মতো ধার লেখকের প্রত্যেকটি কথায়, যাতে মনে দাগ কেটে যায়। "দৃষ্টিপাত"-জাতীয় দু-একটি লেখা পড়েই বুঝছি বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরছে।

—অশোককুমার মুস্তাফি; চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্

আমাদের কথা

ষ্টুডেণ্ট'স্ য়ুনিয়ন কাউন্সিল ১৯৪৬-৪৭

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার চন্দ প্রবর্তিত প্রথায় নির্বাচিত য়ুনিয়ন কাউন্সিল তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো। সাম্প্রদায়িক হাংগামা প্রভৃতি কারণে কাউন্সিলের নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসের আগে সম্ভব হয় নি। নিম্নলিখিত সভ্যদের নিয়ে এবারকার কাউন্সিল গঠিত—

সভাপতি	:	অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ (পদাধিকারবলে)
সহঃ সভাপতি	:	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত (ষষ্ঠ বর্ষ, ইংরেজি)
জেনারেল সেক্রেটারি	:	শ্রীকল্যাণশংকর রায় (চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্)
বার্সার	:	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভড় (পদাধিকারবলে)
জুনিয়র বার্সার	:	মহম্মদ মুসফেকুস সালেহিন (তৃতীয় বর্ষ, আর্টস্)

বিভিন্ন বিভাগ ঃ

পাব্লিকেশন সেকশন—	সভাপতি ঃ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র
	সেক্রেটারি ঃ	শ্রীজীবনলাল দের (চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান)
রবীন্দ্র-পরিষৎ—	সভাপতি ঃ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ ভট্টাচার্য
	সেক্রেটারি ঃ	শ্রীঅমলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান)
জুনিয়র কমন্ রুম্—	সভাপতি ঃ	অধ্যাপক আব্দুল ওয়াহাব মামুদ্
	সেক্রেটারি ঃ	শ্রীপুলককুমার বসু (চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান)
সোশ্যাল সার্ভিস সেকশন—	সভাপতি ঃ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী
	সেক্রেটারি ঃ	শ্রীনির্মলকান্তি দাস (চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান)
ডিবেট সেকশন—	সভাপতি ঃ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
	সেক্রেটারি ঃ	শ্রীনীলমণি লাহিড়ী (চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্)
ড্রামা সেকসন—	সভাপতি ঃ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার সেন
	সেক্রেটারি ঃ	শ্রীদেবব্রত চন্দ্র (চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান ঃ ২৩।৯।৪৭ তারিখে পদত্যাগ করেন)

অন্যান্য সভ্য ঃ

শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত, শ্রীসুবীর রায়, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দে, শ্রীকমলেশ দাশগুপ্ত ; শ্রীপদ্মধর ভুঁইয়া, শ্রীসুব্রত চৌধুরী, মঃ ফজলল করিম, শ্রীভবানী শিকদার ; শ্রীঅচিন্ত্য সিংহরায়, শ্রীপ্রবীর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয় পাইন ; শ্রীকনকবিহারী বসু ; শ্রীদেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, মঃ আবু ইমাম ; শ্রীবিনয় চক্রবর্তী, শ্রীকৃষ্ণকুমার সাইগল ; শ্রীআরতি সেন, শ্রীঅজিত মজুমদার, মিঃ নর্ম্যান বোস ; শ্রীসুবীরকৃষ্ণ দত্ত, কাজী খুরশেদ বখ্‌ত্, মঃ ওসমান গণি, শ্রীজয়ন্তপ্রসাদ মৈত্র ; মঃ মনসুর আহম্মদ সিদ্দিকি, শ্রীবংগেন্দুশেখর গংগোপাধ্যায়।

ড্রামা সেকশনের সেক্রেটারি শ্রীদেবব্রত চন্দ্র ২৩।৯।৪৭ তারিখে ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেন। য়ুনিয়নের কয়েকটি গঠনতান্ত্রিক সংস্কার এবারে হয়েছে। ত'র মধ্যে প্রধান হ'ল, একটি পৃথক বিতর্ক সমিতির সৃষ্টি। আগে এ কাজ সাধারণ সম্পাদকই করতেন। অন্যান্য সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল শাখা-সমিতিগুলিতে কাউন্সিলের সভ্য নয় এমন দু'জন ক'র সভ্য নেওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন। সাধারণ সভার অধিবেশন দু'বারের পরিবর্তে অন্ততঃ একবার হ'বে।

* * *

বাৎসরিক কার্যের সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সাধারণ বিভাগ ঃ

সাম্প্রদায়িক গোলযোগের দুর্দিনের মধ্যে আমরা কাজ হাতে নিই। এর দরুণ প্রতি পদে আমাদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে অসংখ্য বাধাবিঘ্নের। তা সত্ত্বেও, ফেব্রুয়ারি মাসে কার্যভার হাতে নেওয়ার পর থেকে আমাদের কাউন্সিল নিয়মিত ভাবে কাজ করে এসেছে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ জন্যে প্রত্যেক মাসে প্রায় তিনটি করে কাউন্সিলের সভা আহ্বান করতে হয়েছে। এত অধিক সংখ্যক সভা অন্য কোন বছরে হয় নি। এর ফলে য়ুনিয়ন-সদস্যদের মতামত ব্যক্ত হয়েছে খোলাখুলি-ভাবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটেছে। সাধারণ সভা যদিও মাসে অন্ততঃ একটি করে ডাকবার কথা, তবু নানা বাধাবিঘ্নের দরুণ এ পর্যন্ত মাত্র একটির বেশী সাধারণ সভার আয়োজন করা সম্ভব হয় নি।

কলেজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কয়েকটি নূতন বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীর-পত্র প্রচলন, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। বাইরের সংগেও তাল রেখে চলতে চেষ্টা করেছে য়ুনিয়ন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্ষুদিরাম-দিবস পালন, হায়দারাবাদ-দিবস যাপন ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। বাটা শ্রমিক ধর্মঘটের সংগে পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েছে আমাদের কাউন্সিল।

সেপ্টেম্বর মাসে যখন সাম্প্রদায়িক হাংগামা নতুন করে শুরু হল তখন শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় আমাদের কলেজই সবার আগে এগিয়ে গিয়েছিল, সমূহ বিপদ সম্মুখে জেনেও। তারপর থেকে কাউন্সিলের চেষ্টায় কলেজের ছাত্রদের ভিতর থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গঠিত হয়েছে কলেজ শান্তি-সেবা-দল। এই শান্তি-সেবা-দলের সভাপতি ও সেক্রেটারি যথাক্রমে অধ্যাপক ডাঃ মামুদ এবং শ্রীদেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

কাউন্সিলের আমন্ত্রণে রাজস্ব ও কারাগার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসেন কলেজে। ছাত্র-সমাজের বর্তমান সমস্যা ও ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

ড্রামা সেকশনের সেক্রেটারি পদত্যাগ করায় সে ভার জেনারেল সেক্রেটারির উপরই এসে পড়ে। এই তরফ থেকে মোট দু'টি অনুষ্ঠানের আয়োজন এ-বছরে হয়েছে। একটি গীতানুষ্ঠান, অপরটি অভিনয়। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ২রা আগষ্ট, ওভারটুন হল্-এ। সংগীত, আবৃত্তি এবং হাস্য-কৌতুকে অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য হয়। সংগীতে আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া শ্রীসুচিত্রা মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকৃতি সেন, শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। হাস্য-কৌতুকে শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায় সকলকে মুগ্ধ করেন।

এই বিভাগের শেষ অনুষ্ঠান হয় ৯ই অক্টোবর, য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে। ঐ দিন সুপরিচিত নাট্যকার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লিখিত নাটক "পরিহাস বিজল্পিতম্" অভিনীত হয় আমাদের কলেজের ছাত্রদের দ্বারা। সহরের গণ্য-মান্য ব্যক্তি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। নাটকাভিনয় সর্বাংগ-সুন্দর হয়েছিল; নাট্যকারও একথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে যান। অভিনয়ের পূর্বে শ্রীযুত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর সুললিত কণ্ঠে কয়েকটি গান শোনান এবং গীটার বাজিয়ে সকলকে আনন্দ দান করেন আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রীমুকুল দাস।

অন্যান্য কাজ-কর্মের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের সুভাষচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি গঠন। আমাদের কলেজের ছাত্র হিসাবে সুভাষচন্দ্রের একটি মর্মর মূর্তি কলেজে স্থাপন করবার জন্যে এই সমিতি গঠিত হয়েছে।

সবশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবো আমাদের প্রতি কাজে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দের মূল্যবান উপদেশ এবং সহানুভূতির কথা।

কল্যাণশংকর রায়—জেনারেল সেক্রেটারি

পাব্লিকেশন সেক্শন্ঃ

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে আমরা কলেজ পত্রিকার পুনঃপ্রকাশে সমর্থ হয়েছি। ভারত-সরকারের নিষেধাজ্ঞাই পত্রিকা এতদিন বন্ধ থাকবার কারণ ছিল। এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করাতে কি পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ সহজে অনুমান করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কাগজের মূল্যাধিক্য, মুদ্রণ-ব্যয়-বাহুল্য ইত্যাদির দরুণ ছাত্র প্রতি দেড়-টাকা ম্যাগাজিনের চাঁদায় পত্রিকার একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশেরই ব্যয় সংকুলান হয় না। প্রাগ্-যুদ্ধ সময়ে ম্যাগাজিন-খাতে যে ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল, বর্তমানে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাই আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা বর্তমান দুর্মূল্যের চাঁদার হার বর্ধিত করে পত্রিকা প্রকাশের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য যেন দূর করেন।

আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা পাঠক-লেখক, অনুগ্রাহক সকলের জন্যই রইলো।

জীবনলাল দেব—সেক্রেটারি

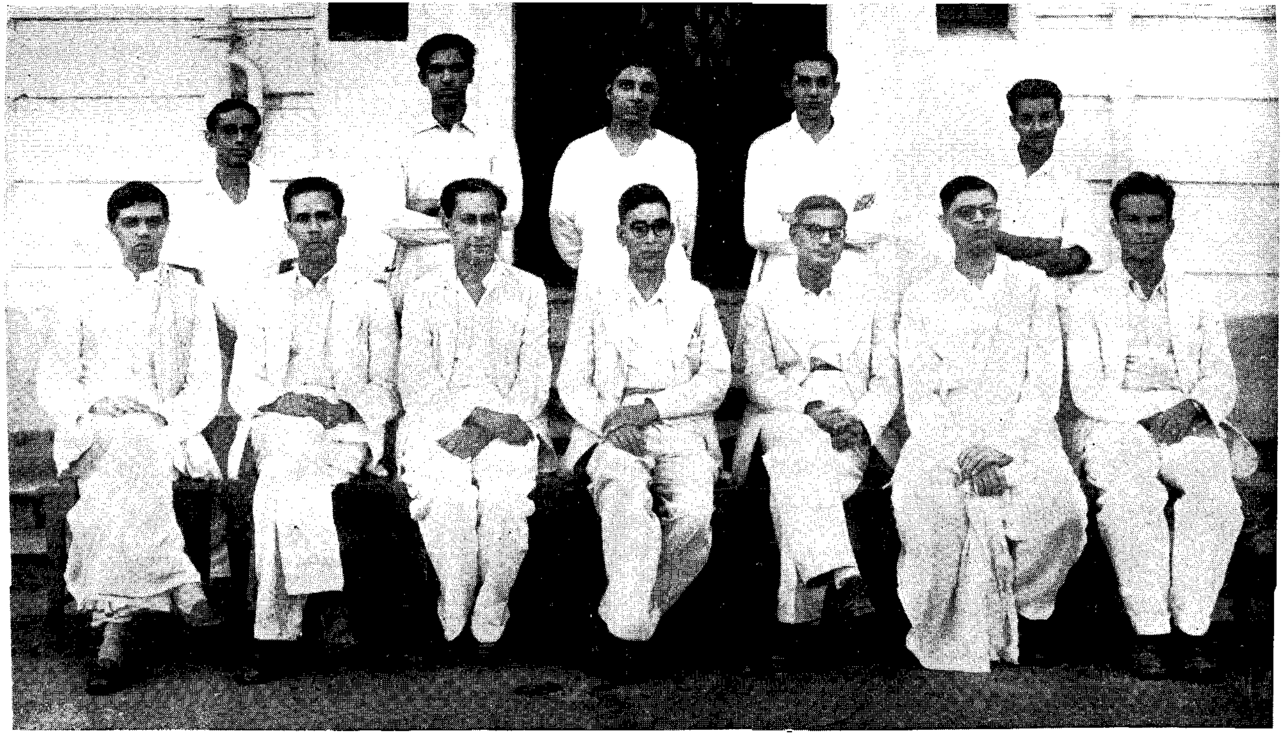

বসে—অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সভাপতি, রবীন্দ্র-পরিষৎ); অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (সভাপতি, বিতর্ক সমিতি); অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার (ডীন্); অধ্যক্ষ যোগীশচন্দ্র সিংহ (সভাপতি, পদাধিকারবলে); অধ্যাপক গুরুদাস ভড় (কোষাধ্যক্ষ, পদাধিকারবলে); অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী (সভাপতি, সমাজ-সেবা-সমিতি); অধ্যাপক মামুদ (সভাপতি, জুনিয়র কমন্ রুম্)।

দাঁড়িয়ে—অমলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (রবীন্দ্র-পরিষৎ); সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত (সহঃ সভাপতি); কল্যাণশংকর রায় (সাধারণ সম্পাদক); পুলক বসু (জুনিয়র কমন্ রুম্); জীবনলাল দেব (প্রকাশনী বিভাগ)।

মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম অভিমুখে আমাদের সমাজ-সেবা-দল

বসে—ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, এ রেজ্জাক, নির্মল দাস (সেক্রেটারি, সোস্যাল সার্ভিস লীগ), সুধীর দত্ত, মনোজকুমার বড়ুয়া।
দাঁড়িয়ে—নিরঞ্জন চৌধুরী, জ্যোতির্ময় চৌধুরী, বংগেন্দু গাংগুলি।

জুনিয়র কমন্ রুম ঃ

কার্যভার গ্রহণের মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বাৎসরিক ষ্টীমার-পার্টির আয়োজন করি। রবিবার, ২রা মার্চ, সকাল এগারোটায় আমাদের ষ্টীমার চাঁদপাল ঘাট থেকে দক্ষিণদিকে যাত্রা শুরু করে। বেলা দুটো অবধি এগিয়ে আমরা রূপনারায়ণ নদীর মোহনায় এসে পৌঁছি। তারপর ষ্টীমারের গতি ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমরা ফিরে আসি কলকাতায়। ষ্টীমারে মাধ্যাহ্নিক আহার এবং বৈকালিক চা ও আনুসংগিকের ব্যবস্থা হয়েছিল। আহারাদির পর গীতিবিচিত্রা এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। গংগাবক্ষের স্নিগ্ধ হাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক মনোহর দৃশ্যাবলী সবাইকেই আকৃষ্ট করেছিল। অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপকদের অনেকে এবং প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় দু'শ জন যোগ দিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। তাঁদের সমবেত চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সর্বাংগসুন্দর হয়ে ওঠে।

এর পর থেকে সাম্প্রদায়িক গোলমালের দরুণ কলেজ বন্ধ হতে থাকে অনিয়মিতভাবে। তাই তখন কোন নতুন প্রচেষ্টায় মন দিতে পারিনি আমরা। তবুও সাময়িক পত্রাদি এবং নানাবিধ আভ্যন্তরীণ খেলা-ধূলার দ্বারা এ সময়ে ছাত্রছাত্রীদের অবসর যাপনের ব্যবস্থা করেছি। প্রসংগতঃ উল্লেখ করতে পারি, আগেকার একটি টেবিল-টেনিস সেটের যায়গায় এখন ব্যবস্থা হয়েছে দু'টির।

২০শে সেপ্টেম্বর ফিজিক্স থিয়েটার ঘরে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই মাত্র অংশ নিয়েছিলেন এ অনুষ্ঠানে। আয়োজন সামান্য হলেও আন্তরিকতার জন্যে অনুষ্ঠানটি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন য়ুনিয়নের সহঃ-সভাপতি মহাশয় এবং অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করেন শ্রীসুরভি রায়চৌধুরী।

শারদীয়াবকাশের কিছুদিন আগে টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিযোগিতান্তিক সর্বশেষ খেলাটি হয় ১১ই অক্টোবর। তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞানের ছাত্র শ্রীপ্রভাস রায় তৃতীয় বর্ষ, কলার ছাত্র শ্রীগোবিন্দ রায়কে ৩-২ সেটে পরাজিত করে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেন। উপস্থিত অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রগণ খেলাটির উন্নত-মানের প্রশংসা করেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন। খেলাটি পরিচালনা করেন শ্রীমিহির সেন।

কলেজে একটি শিল্পকলা-প্রদর্শনীর আয়োজন চলেছে। এতে থাকবে অংকন ও চিত্রণ, আলোকচিত্র, সূচীশিল্প, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, খেলনা ইত্যাদি। কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই শুধু যোগ দিতে পারবেন এতে। পুরস্কারের ব্যবস্থাও করা হ'বে।

কলেজের স্বল্প-পরিসর বিশ্রামকক্ষগুলির যথেষ্ট স্থানাভাবের কথা আমরা অনুভব করেছি বিশেষভাবে। এ নিয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এর উন্নতি যা'তে করা যায় সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেবেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও কলেজ পরিদর্শন ক'রে একই আশ্বাস দিয়েছেন।

আমাদের কার্যকাল ফুরিয়ে এল। যে দুর্দিনের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়েছি তা'র দরুণ যদি অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর কাজ কিছু কম হয়ে থাকে, সে ত্রুটি নিশ্চয়ই মার্জনীয়। কিন্তু অত্যন্ত সুখের সংগে বলি, আমাদের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই হয়েছে সাফল্যমণ্ডিত। এর পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত সাহায্য এই সুযোগে তাঁদের জানাই ধন্যবাদ।

পুলককুমার বসু—সেক্রেটারি।

সোশ্যাল সার্ভিস সেকশন ঃ

নির্বাচনের পর থেকেই আমরা কাজে অগ্রসর হয়েছি। প্রথমে কলকাতার পাঁচটি বস্তি-অঞ্চলে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় করপোরেশনের দু' নম্বর ওয়ার্ডের চিকিৎসাবিভাগের সহযোগিতায়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক

গোলযোগের পুনরাবৃত্তির দরুণ তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যা'হোক গোলমালের মধ্যেও এপ্রিল মাসে আমরা ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসের এবং আশেপাশের একশ'-ষাট জন বাসিন্দাকে আর-ডব্লু-এ-সির সাহায্যে কলেরা-প্রতিষেধক ইনজেকশন দিয়েছি।

আমাদের একটি দল সাতই আগষ্ট মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলের দিকে রওনা হয়। দলে ছিলেন শ্রীকমলেশ দাশগুপ্ত, শ্রীসমর বসু, শ্রীভবানী সিকদার, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীজ্যোতির্ময় চৌধুরী, শ্রীজীবনলাল দেব, শ্রীমঞ্জুবিকাশ বসু, শ্রীসুবীর দত্ত এবং নির্মলকান্তি দাস। এ কাজে তখনকার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এবং জনস্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার উৎসাহ আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সাহায্যে আমাদের অনেক কষ্ট লাঘব হয়েছে। এ ছাড়া মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, কে, ঘোষ জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার চন্দ্র জানা, কংগ্রেস-কর্মী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মোহান্তির সাহায্যও আমরা ভুলব না। সমস্ত ঘাটাল মহকুমা এবং ঝাড়গ্রাম, তকলুক ও মেদিনীপুর সদরের কয়েকটি গ্রামে আমরা কাজ করি। মেদিনীপুর জেলার শিক্ষার ব্যবস্থা, ওখানকার জনসাধারণের স্বাস্থ্য, জেলার উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও তার বিলির ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি। রুগ্ন, দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে আমরা তিন হাজার 'মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট' এবং বেংগল ইম্যুনিটির কাছ থেকে পাওয়া 'এ্যালেক্রিন ট্যাবলেট' বিতরণ করি। এছাড়া কি ভাবে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে তা'র একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করে আমরা পাঠিয়েছি বাংলা সরকারের কাছে।

বন্যার্ত চট্টগ্রামবাসীদের সাহায্যদানেও আমাদের সেবাদল পশ্চাদ্পদ হয় নি। গত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের সেবাদলের শ্রীমনোজ কুমার বড়ুয়া ও শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরী ভারতীয় রেডক্রস্ সমিতির সংগে চট্টগ্রামে যান এবং বন্যাপীড়িত জনসাধারণকে চাল, বিস্কুট প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং ওষুধ-পত্র বিতরণ করেন। বিশে আগষ্ট এঁরা ফিরে আসেন। তখন আরও বেশী সাহায্য প্রেরণের উদ্দেশে আমরা 'চট্টগ্রাম-বন্যা-ত্রাণ সমিতি' গঠন করি।

এই সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীসুশোভনচন্দ্র সরকার, অধ্যাপক ডাঃ আব্দুল ওয়াহাব মামুদ্ ও অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী। এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই সাতশ'-আশী টাকা সংগৃহীত হয়; এছাড়া কলেজ য়ুনিয়ন থেকে পাওয়া যায় তিনশ-ছিয়াত্তর টাকা আট আনা। উনত্রিশে আগষ্ট খাজা আবদুস্ রজ্জাক, শ্রীযোগেন্দ্রলাল হালদার এবং শ্রীনির্মলকান্তি দাস সংগৃহীত অর্থ, পাঁচশ' ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট, বেংগল ইম্যুনিটির কাছ থেকে পাওয়া পাঁচশ' 'বাইডিসেপ্টিফাস ইনজেকশন' ও কিছু পুরাণো কাপড়-চোপড় নিয়ে চট্টগ্রাম রওনা হন। পটিয়া, আগেয়ারা ও বোয়ালখালি থানার ছত্রিশটি গ্রামে আমরা চাল, ওষুধপত্র এবং কাপড়-চোপড় বিতরণ করি।

এবছরে আরও কিছু কাজ করবার ইচ্ছা আমাদের আছে। মনে হয় ক'লকাতার বস্তি-অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে কাজ শুরু করতে আর কোনও বাধা আমাদের হবে না। এ ছাড়া কলেজের ছাত্ররা যা'তে সমাজ সেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ও উপায় বুঝতে পারে তা'র জন্য ছায়াচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতার আয়োজন আমরা করতে চেষ্টা করছি।

নির্মলকান্তি দাস—সেক্রেটারি।

রবীন্দ্র-পরিষৎঃ

অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর এ বিভাগের কাজ হয়েছে সামান্য। সাহিত্যালোচনা বা বক্তৃতার ব্যবস্থা একটিও হয় নি। চেষ্টার ত্রুটি অনেক সময়েই হয় নি, তবে শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করে নি তা'। কেন, সে নিয়ে বিশদ্ আলোলোচনার প্রয়োজন নেই—সাম্প্রদায়িক গোলযোগই এর মূলে রয়েছে প্রতিবার। তাছাড়া, যে অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে আমাদের, তাতে এ ধরণের সাংস্কৃতিক আলোচনার সুযোগ ছিল না

এ বছর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়েছে গত ১৬ই মার্চ, সকাল আটটায়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন কলেজে করা সম্ভব হয় নি কয়েকটি অনিবার্য কারণে; তাই য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটুটে আয়োজন করতে হয়েছিল। কবির সময়োচিত—অর্থাৎ বসন্ত-ঋতু-বিষয়ক—গান ও আবৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছিল ব'লে এই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'বসন্তোৎসব'। পল্লব-পুষ্পে সুশোভিত মঞ্চে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট গানগুলি গাওয়া হয়। সম্মেলক গানগুলির সব গুলিতেই অংশ নিয়েছিলেন আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। একক গানগুলির জন্যে বিশেষ করে নাম করবো শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল ঘোষ, শ্রীসুপ্রীতি ঘোষ, শ্রীতড়িৎ চৌধুরী, শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও শ্রীসুদর্শনা রায়ের। শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব গিয়েছিল বেড়ে।

এ বছর একটি নতুন বিষয়ের প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। গত ১০ই অক্টোবর এ বিভাগের তরফ থেকে একটি আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। চব্বিশ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। আবৃত্তির বিষয় ছিল 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি' নামক কবিতাটি। বিচারক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভাদুড়ী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী। প্রতিযোগিতায় প্রথম হ'লেন শ্রীসন্তোষকুমার দে এবং দ্বিতীয় হ'লেন শ্রীজগদিন্দ্র ঘটক ও শ্রীনির্মল সরকার দু'জনে। প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন কলেজ য়ুনিয়নের সহঃ-সভাপতি মহাশয়। বিভাগীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ ভট্টাচার্য প্রতিযোগিতাটির উচ্চ-মানের কথা উল্লেখ করে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন। তাঁ'র অনুরোধক্রমে সর্বশেষে শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র মহাশয় কবিতাটি আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করেন।

আর্টস্ লাইব্রেরিতে ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল গত ৬ই ডিসেম্বর। বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর সহায়তায় অনুষ্ঠানটি চিত্তাকর্ষক হয়। কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীও যোগ দিয়েছিলেন। লাইব্রেরি কক্ষটি সুসজ্জিত করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান-শেষে কলেজের অধ্যক্ষ এবং য়ুনিয়নের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ শিল্পীবৃন্দ এবং উপস্থিত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অমলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, সেক্রেটারি

ডিবেট সেকশন ঃ

অত্যন্ত সংকোচের সংগে বলতে হচ্ছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক-সমিতি পৃথক করে সৃষ্টি করা হ'ল, তা'র অনেকটাই এ বছরে সফল হ'য় নি। এ কলেজের বিতর্ক-বিভাগ একটি প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক প্রতিষ্ঠান। বস্তুতঃ গত কয়েক বছরের দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যা'বে বাংলা তথা ভারতের কলেজগুলির মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজই বিতর্কে অধিকাংশ সময়েই পেয়েছে সব-উঁচু আসন।

উঁচু আসন অবশ্য এবারেও যে না পেয়েছে তা নয়। মাস কয়েক আগে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার দল হিসাবে আমাদের কলেজ হয়েছে দ্বিতীয়। এ ছাড়া সেপ্টেম্বর মাসে স্কটিশ-চার্চ কলেজ আহূত প্রতিযোগিতাতেও শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর সম্মান পেয়েছে আমাদেরই কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅনিন্দ্য দত্ত।

কিন্তু বিতর্ক-সমিতির বিশেষ কাজ হ'ল যতগুলি সম্ভব বিতর্কের আয়োজন করা। সেদিক থেকে বিশেষ কাজ হয় নি। মোটামুটি মাসে একটি করে বিতর্কের আয়োজন করা গেছে মাত্র। তা'তেও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে খুব বেশী সাড়া পাওয়া যায় নি। আমার মনে হয়, এর কারণ সহরের অনিশ্চয়তা-জনিত চিত্ত-চাঞ্চল্য। এ ছাড়া অনেক সময়ে গোলমালের দরুণ নির্ধারিত বিষয়ে বিতর্কের আসর করা সম্ভব হয় নি।

সুখের কথা, দুঃখের দিনের অবসান ঘটেছে। তাই আশা রইল, এর পর থেকে আরও নিয়মিতভাবে বিতর্ক-সমিতির বৈঠক বসতে আর বাধা হবে না এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও এ দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়ে এ বিভাগটিকে আবার চিত্তাকর্ষক করে তুলবেন।

নীলমণি লাহিড়ী, সেক্রেটারি

খেলা-ধুলা সমিতি ঃ

মাত্র এক বছর হোল, য়ুনিয়ন কাউন্সিল থেকে এই সমিতি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ শুরু করেছে। তবে কাউন্সিলের সংগে সংযোগ না থাকলেও এর গঠন-প্রণালী কাউন্সিলের অনুরূপ। সংক্ষেপে বলতে গেলে সাধারণ ছাত্রদের প্রত্যেক শ্রেণীর নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাদের ভিতর থেকে সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদক নির্বাচিত করেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় পদাধিকার বলে এই সমিতির সভাপতি। অধ্যাপক-মণ্ডলীর ভিতর থেকে কয়েকজনকে তিনি বিভাগীয় সম্পাদক মনোনীত করেন। এ ছাড়া প্রত্যেক বিভাগেই একজন করে অধিনায়ক থাকেন। বলা বাহুল্য অধিনায়ক হওয়ার যোগ্যতা কেবল ব্যক্তিগত পারদর্শিকতা।

এ বছরে সহরের অস্বাভাবিক অবস্থা এ সমিতির প্রত্যেক বিভাগের কাজ-কর্মকেই ক্ষতিগ্রস্ত ও পংগু করেছে। এই জন্যেই এ বছরে যথাবিধি নির্বাচনের সুযোগ পাওয়া যায় নি, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনোনয়নের আশ্রয় নিতে হয়েছে। যা হোক, এখন আশা করা যায়, পরিপূর্ণ নির্বাচনী প্রথায় এর পর থেকে কাজ চালিয়ে যাওয়া যা'বে। এ বছরের কাজ-কর্মের সংবাদ সংক্ষেপে এই—

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ

সাধারণতঃ জানুয়ারি মাসের শেষ দিকেই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এবারও তদনুযায়ী ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নি। ২১শে জানুয়ারি প্রতিযোগিতার দিন ঠিক হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'ভিয়েৎনাম-দিবস' পালনের জন্য সেদিন ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং পুলিশের গুলিচালনার দরুণ সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৮ই ফেব্রুয়ারি প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি বিষয়ই বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। অধ্যাপকদের দৌড়-প্রতিযোগিতা বিশেষ উপভোগ্য হয়। স্থানাভাব-হেতু বিজয়ী প্রতিযোগীদের নাম এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ কুদ্‌রৎ-ই-খুদা।

ক্রিকেট ঃ

সভাপতি—অধ্যাপক ডাঃ নির্মলকুমার সেন
সম্পাদক—শ্রীকমলেশ দেব
অধিনায়ক—শ্রীঅমিত মুখোপাধ্যায়

সাধারণতঃ শারদীয়-অবকাশের পর থেকেই শুরু হয় ক্রিকেট খেলা। এ কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই এই খেলায় বিশেষ উৎসাহী। এ বছরে অন্যান্য কলেজের সংগে অনেকগুলি প্রীতি-মূলক খেলা হয়েছে। এর কোনটিতেই আমাদের কলেজের দল পরাজিত হয় নি। রাজসাহীতে স্থানীয় কলেজের সংগে আমাদের দলটির খেলা সত্যই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। সেখানেও আমরা পেয়েছি বিজয়ীর সম্মান। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃ-কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতাতেও আমরা যোগ দিয়েছি। প্রাক্-প্রতিযোগিতান্তিক (Sami-final খেলায় আমাদের কলেজ বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে পরাজিত হয়।

ফুটবল ঃ

সভাপতি—অধ্যাপক ডাঃ যতীশ সেনগুপ্ত
সম্পাদক—শ্রীহিরণ্ময় ঘোষ
অধিনায়ক—শ্রীশান্তিপ্রিয় ঘোষ

এ বছরে ফুটবলের অনুশীলনী এক রকম হয়নি বলা চলে। তা' সত্বেও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছি। এ ছাড়া প্রীতি-মূলক কয়েকটি খেলাও হয়েছে।

হকি ঃ

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্তী
সম্পাদক ও অধিনায়ক—শ্রীসৌম্যেন্দ্র দত্ত

হকি-র অনুশীলনী মোটের উপর ভালই হয়েছে এবং একাধিক খেলায় আমরা বিজয়ী হয়েছি। আন্তঃ-কলেজ হকি-প্রতিযোগিতায় আমরা বি-ঈ-কলেজকে হারিয়ে প্রতিযোগিতান্তিক খেলায় উপনীত হই। সে খেলায় অবশ্য সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের কাছে পরাজিত হই।

উপরে খেলা-ধূলার যে বিবরণ দেওয়া হ'ল তা'ছাড়া আমাদের আরও বিভাগ আছে। আমাদের টেনিস-ক্লাব একটি আকর্ষণীয় বিভাগ। আগে আমাদের টেনিসের দু'টি মাঠ ছিল। যুদ্ধের সময়ে একটি দখল করে সামরিক বিভাগ। তারপর থেকে একটি মাঠেই আমাদের খেলতে হচ্ছে। এর ফলে অনেক ছাত্রকেই এ খেলা থেকে বঞ্চিত হ'তে হচ্ছে।

ভলি-বলেরও ঐ দশা। একটি মাঠই এখন সম্বল। কোনও রকমে এতেই কাজ চালাতে হয়। বাস্কেট-বলের মাঠটি অবশ্য অক্ষত আছে।

এ কলেজের নৌ-চালনা সমিতি সুপরিচিত। পর পর তিনবার সর্ব-দল-বিজয়ী হয়ে বহুবার বিশেষ সম্মানের অধিকারী হ'য়েছে এ কলেজের দল। এবারে অবশ্য নিয়মিতভাবে এ বিভাগের কাজ চালানো সম্ভব হয় নি। কারণ আগেই বলেছি।

ব্যায়ামাগারের কাজ-কর্ম অব্যাহতভাবে চলেছে। সাধারণতঃ ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসের ছেলেরাই এখানে বিশেষভাবে ব্যায়ামের সুযোগ পান।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই যেমন পরবর্তী জীবনে হয়েছেন বিদ্যাবত্তায় সুবিখ্যাত পণ্ডিত কিংবা দেশবরেণ্য জননায়ক, তেমনি খেলা-ধূলার ক্ষেত্রেও এ কলেজের দান কম নয়। আজকের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এই গৌরবের অনেকখানিই প্রাপ্য এ কলেজের খেলা-ধূলা বিভাগের।

মনসুর জিলানী, সেক্রেটারি

ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাস সংবাদঃ

প্রায় দেড় বছর হ'ল আমাদের 'ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাস সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সুসংহত চেষ্টায় ছাত্রাবাস জীবনকে নানাদিক দিয়ে উন্নত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছি আমরা। আমাদের পাঠাগারটি ক'লকাতার অন্য যে কোন ছাত্রাবাসের পাঠাগারের চেয়ে কম সমৃদ্ধ নয়; এখানে বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়, তাছাড়া এবার কিছু বইও কেনা হয়েছে। সংস্কৃতি-সংসদের উদ্যোগে নববর্ষ উপলক্ষে এবং বিদায়ী ছাত্রদের সম্বর্ধনা উপলক্ষে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। এ ছাড়াও এই সংসদের উদ্যোগে শরৎ-সাহিত্য, নজরুলের কবি-প্রতিভা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা-সভার আয়োজন হয়েছে। আমাদের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয় "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা" সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। এ ছাড়া বিতর্ক-সভা হয়েছে অনেক বিষয়েই।

ছাত্রকল্যাণ-বিভাগ প্রত্যেক ছাত্রের সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সটি কাজে লাগে প্রায়ই। অসুস্থ ছাত্রদের সেবার ব্যবস্থাও আছে। খেলা-ধূলা বিভাগের সাফল্যই সবচেয়ে প্রশংসনীয়। ব্যাডমিন্টন্, টেনিস্, কয়েটেস্, টেবিল-টেনিস্, হকি এবং ফুটবল খেলা নিয়মিত হয়েছে। ফুটবলের সময়েই সবচেয়ে বেশী উত্তেজনা এবং উৎসাহ আমরা লক্ষ্য করেছি। আমাদের সমিতির তরফ থেকে একটি আন্তঃ-ছাত্রাবাস ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা হয়। নয়টি দল যোগ দেয়, এবং আমাদের দলটিই বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। এছাড়াও আমাদের ফুটবল দল বন্ধুতামূলক খেলায় অন্যান্য হোষ্টেলকে পরাজিত ক'রেছে।

আমাদের খাদ্য-সমিতি অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে আমাদের রান্নাঘর পরিচালনা করেছে। দুর্মূল্যের বাজারেও আমাদের মাসিক আহার্যের ব্যয় ৩০ টাকার উপর উঠ্‌তে দেওয়া হয়নি, এবং কমিয়ে ২৪৷৷০ টাকা পর্যন্ত নামানো হয়েছে। রান্নাঘরে ও খাওয়ার ঘরে অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে লড়াই অনেকটা সফল হয়েছে। সম্প্রতি খাদ্য-সমিতির উদ্যোগে সকাল-বিকালের জলযোগের জন্য একটি সুলভ খাদ্য-ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। আমাদের ইচ্ছা একে আধুনিক সমবায় পদ্ধতিতে দাঁড় করানো। ব্যয়-সংকোচের দিকে নজর থাকায়, খাদ্য-সমিতির মাসে দু'এক বার ভূরি-ভোজনের যে সনাতন ব্যবস্থা ছিল, তা প্রায় তুলেই দিয়েছেন। এবার বোধ হয় তা' আবার চালু করা সম্ভব হ'বে।

বহির্জীবনের সংগে আমাদের ছাত্রদের যোগসূত্র বরাবরই অটুট ছিল এবং এখনো আছে। বিভিন্ন সময়ে আমরা স্বাধীনতা-দিবস, লেলিন-দিবস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দিবসে রাজনৈতিক আলোচনার আয়োজন করেছি। ১৫ই আগষ্ট সামরিক কায়দায় স্বাধীন ভারতের পতাকাকে অভিবাদন করা হয়। এই উপলক্ষে একটি আলোচনা সভায় স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে ছাত্রদের সামনে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী উপস্থিত করা হয়। গত বছর সরস্বতীপূজা ও ও আজাদ্-হিন্দ্-সরকার প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে দুইটি বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল।

আমাদের ছাত্রবাসের ছাত্রদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ লিপিবদ্ধ ক'রে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই আমরা নিজেরা এ বিষয়ে সরকারী দপ্তরে খোঁজ-খবর করেছি। ছাত্রাবাসের দু'শ ছেলের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা নেই। অবিলম্বে একটি নলকূপ ও বৈদ্যুতিক পাম্প্-এর দরকার। তা-ছাড়া আমাদের টেলিফোন, বিজলীপাখা এবং বিরাম-পীঠিকার দাবী ত রয়েইছে। আমাদের দাবীগুলি নাকি মঞ্জুর হয়েছে ; কিন্তু সরকারী লালফিতা খুলতে অত্যন্ত দেরী হচ্ছে।

সর্বশেষে আমরা আমাদের গঠনতন্ত্র অনুমোদন করার জন্য এবং উন্নততর ছাত্র জীবন গঠনের অনুপ্রেরণার জন্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশকে ধন্যবাদ জানাই। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহের সহানুভূতির জন্যও আমরা কৃতজ্ঞ। ছাত্রাবাসের কর্তৃপক্ষ ও সমিতির সহযোগিতার ভিত্তিতে আমাদের ছাত্রজীবন সবদিক দিয়েই সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে,—অমোদের সমিতির সার্থকতা এখানেই।

অমলেন্দু গুহ, সহঃ সভাপতি ; ও মনোরঞ্জন দত্ত, সেক্রেটারি

ইংরেজি সেমিনার ঃ

ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা ছাড়া সেমিনারের কোন বিশেষ আলোচনা এ-বছর হয়নি। তবে আশা করা যায়, এই ধরণের কয়েকটি আলোচনার আয়োজন শীঘ্রই করা সম্ভব হবে।

ইংরেজি অনার্স লাইব্রেরি ছাড়া সেমিনারের কোন লাইব্রেরি ছিল না এতদিন। এ-বছর থেকে সেমিনারের একটি পৃথক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হল। বর্তমানে এই লাইব্রেরিতে বই আছে৩শ খানার ওপর। অধ্যাপকবৃন্দ এবং এম-এ ও অনার্স ক্লাসের ছাত্ররাই মাত্র এই লাইব্রেরি ব্যবহার করবার অধিকারী।

ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র এই সেমিনারের সভাপতি।

সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত, সেক্রেটারি, নিরুপম সোম, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি

ইংরেজি অনার্স লাইব্রেরি ঃ

স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের প্রেরণায় ও উদ্যোগে গত ১৯২৬ সালে এই ইংরেজি অনার্স লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এটা ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ছাত্রদের একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এবং এর পরিচালনাও করেন তাঁরা। কলেজ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে লাইব্রেরিটি স্থান পেয়েছে কলেজেরই একটি কক্ষে এবং কলেজেরেই দেওয়া একটি আলমারীতে। তাছাড়া অন্য কোন রকম সরকারী সাহায্য এতে নেই।

প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীসুধীরকুমার সেনের কাছ থেকে মোট ২৮২ খানি বই বুঝে পাওয়া গেছে। এ বছর নতুন বই কেনা হ'য়েছে ১৪ খানি এবং এই কলেজেরই কৃতী প্রাক্তন ছাত্র স্বর্গীয় অবনীকুমার সরকার, এম, এ-র নিজের সংগ্রহ থেকে পাওয়া গেছে ৭৮ খানি। এই প্রসংগে আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও অধুনা সিটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি ; তাঁরই চেষ্টায় বইগুলি আমরা পেয়েছি। এজন্য অনার্স ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রতিষ্ঠানটির এ বছরের আয়-ব্যয়ের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হ'লো—

আয় ঃ—		ব্যয় ঃ—	
প্রাক্তন সম্পাদকের কাছ থেকে পাওয়া গেছে—	৬২॥৴১০	টিকিট, ষ্ট্যাম্পের কালি, ন্যাপথলিন প্রভৃতি বাবদ—	৶০
হারাণো বই-এর ক্ষতিপূরণ—	।৶০	নতুন বই কেনা বাবদ—	৩৯৸৴৫
ছাত্রদের কাছ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত চাঁদা	২৮॥০	অবশিষ্ট—	৫০৸৴৫
		মোট—	৪০৸৴৫
মোট—	৯১॥৵১০		৯১॥৵১০

চিরঞ্জীব কবিরাজ, সেক্রেটারি

বাংলা সেমিনার ঃ

ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মিলিত চেষ্টায় আমাদের সেমিনার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। নিয়মিত সাহিত্যালোচনার জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে একটি 'সাহিত্য-চক্রে'র সৃষ্টি করেছি। এর সভাপতি, সম্পাদক

এবং আহ্বায়িকা যথাক্রমে শ্রীদেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, শ্রীশুভেন্দু চক্রবর্তী, শ্রীসুরভি রায় চৌধুরী। সাহিত্য-চক্রের সাপ্তাহিক আলোচনায় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি পাঠ করা হয়। শরৎচন্দ্র এবং বংকিমচন্দ্রের জন্মতিথিও পালন করা হয়েছে। আলোচনায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেছেন শ্রীরমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু, শ্রীসুধাংশু মণ্ডল ও শ্রীঅমর মল্লিক।

আমাদের উদ্দেশ্য যা' ছিল তার অনেকখানিই কাজে পরিণত করা সম্ভব হ'ল না। আশা করি ভবিষ্যৎ ছাত্রবন্ধুদের হাতে তা' সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সেক্রেটারি

রাজনীতি ও অর্থনীতি সেমিনার ঃ

বছরের গোড়া থেকেই আমাদের অনিশ্চিত সময়ের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। তাই বিশেষভাবে কোনও বক্তৃতার আয়োজন না হ'লেও সময়ে সময়ে ঘরোয়া বৈঠকে সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ও বিতর্কের আসর হয়েছে। এই প্রসংগে শ্রীদিলীপ কর, শ্রীধ্রুব ঘোষ, শ্রীনীলমণি লাহিড়ী এবং শ্রীগোবিন্দ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

অর্থনীতি সেমিনারের সম্পাদক মোয়াজ্জেম-উল হকের বিদায় গ্রহণোপলক্ষে বারো নম্বর ঘরে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মিঃ হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়েছেন।

লাইব্রেরির কাজ যথারীতি হয়েছে। এ বছর লাইব্রেরিতে দশ খানা অর্থনীতি বিষয়ক এবং চোদ্দ খানা রাজনীতি-বিষয়ক বই যোগ করা হয়েছে।

অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিভাগের সভাপতি যথাক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি চট্টোরাজ এবং অন্যান্য বিভাগীয় অধ্যাপকদের কাছ থেকে যে অমূল্য উপদেশ এবং সাহায্য পেয়েছি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, সেক্রেটারি, অর্থনীতি সেমিনার ;
অশোককুমার মুস্তাফি, সেক্রেটারি, রাজনীতি সেমিনার

দর্শন সেমিনারঃ

সহরের অস্বাভাকি অবস্থার দরুণ এ বছর বক্তৃতা বা আলোচনী-সভার অয়োজন একটির বেশি করা সম্ভব হয় নি। সভাটিতে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মোহান্তি 'Intuition & Reason' নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন, সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম।

আমাদের সেমিনারে বহু মূল্যবান্ ছবি ও প্রতিকৃতি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেগুলির জীর্ণ অবস্থার দিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ নজর দেন নি এতদিন। ছবিগুলি আজকাল দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ছবিগুলি সংস্কারের জন্যে এক আবেদন করা হয়েছে। আমরা আশা করি, কলেজ কর্তৃপক্ষ অগৌণে এদিকে নজর দিবেন।

সেমিনার লাইব্রেরিতে বর্তমানে একাত্তর খানা বই আছে। বই-এর সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে চেষ্টা চলছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হোড়, সেক্রেটারি

সংস্কৃত সেমিনার ঃ

আনন্দের সংগে জানাছি, সংস্কৃত সেমিনারের জন্য এ বছর থেকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। এবছর সংস্কৃত সেমিনারের কোন নির্দিষ্ট ঘর না থাকায়, পঠন-পাঠন এবং সেমিনার-সংক্রান্ত কাজ-কর্মের অসুবিধে হয়েছে প্রচুর। সেমিনারের অভাব-অভিযোগ আরও আছে; সেগুলি আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি এবং তাঁরা প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপকগণের কাছ থেকে যে অমূল্য সাহায্য পেয়েছি তা' কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি।

বর্তমানে সেমিনারে প্রায় ৭০ খণ্ড বই আছে। বইগুলি ছাত্র এবং অধ্যাপকগণকে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়।

মঞ্জুবিকাশ বসু, সেক্রেটারি

ভূবিদ্যা পরিষৎ ঃ

গত বিয়াল্লিশ বছর ধরে এই পরিষৎ ভূবিদ্যা-বিষয়ক অনেক কাজ করেছে। এবছরেও যথারীতি কাজ চলেছে, যদিও মাঝে মাঝে ব্যাঘাত কিছু হয়েছে।

এ বছর পাঁচটি বিশেষ আলোচনা হয়েছে। খ্যাতনামা ভূবিজ্ঞানবিদ্গণ এই সব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ক্যানাডার ট্যান্টম্, ডিগবয়ের ডাঃ কোট্স, পাকিস্তানের ভূবিজ্ঞান-নির্দেশক ডাঃ গী-র

নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। টেনিসি উপত্যকা সম্বন্ধে একটি ছায়াচিত্র দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া প্রত্যেক ক্লাসে আলোচনার আয়োজন হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। লাইব্রেরির কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলেছে।

ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা খনিজ পদার্থ, জীবাশ্ম বা শিলার মূল্যবান্ সংগ্রহ দিতে পারবেন পরিষদের তরফ থেকে তাঁদের প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে 'মিনারাল ক্লাব' গঠিত হয়েছে। এ বছর এর সম্পাদক আছেন শ্রীরাধানাথ দত্ত।

পরিষদের প্রকাশনী-বিভাগ থেকে সম্প্রতি 'ভূ-বিদ্যা'র একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর এই পত্রিকাটির সম্পাদক আছেন শ্রীঅজিতকুমার সাহা। পত্রিকাটি এবার নবম বর্ষে পদার্পণ করলো।

পরিষদের অন্যান্য কাজের মধ্যে ইস্তাহার-প্রকাশের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইস্তাহারে ভূবিদ্যা-বিষয়ক সংবাদ, ছাত্রদের কাজকর্ম, টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি খবর প্রকাশিত হয়। সময়ে সময়ে ভূবিদ্যা-সংক্রান্ত ছবির প্রদর্শনীও হয়ে থাকে।

সত্যেন্দ্রকুমার দে, সেক্রেটারি

আবেদন

এই সংখ্যার অন্যত্র আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীউল্লাসকর দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং প্রতিকৃতি প্রকাশিত হ'ল। তাঁর আর্থিক দুর্গতির কিছু আভাস সেখানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবের তুলনায় সে বিবরণ সামান্য। শ্রীযুক্ত দত্তের ঘটনাবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং ছাত্রাবস্থার ছবির জন্যে কিছুদিন পূর্বে তাঁর নিকটে যাই। বহু সন্ধানের পর ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজ-প্রদত্ত একটি ছোট অন্ধকার ঘরে তাঁর দেখা পাই। ঘরের দরজায় টাঙানো চটে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক লেখা ছিল। ভিতরে ঢুকলে শ্রীযুক্ত দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জন্যে আসা হয়েছে?" আমি আমার উদ্দেশ্য জানালাম। তিনি হেসে বললেন, "আমার ছবি আমার কাছে নেই, আছে পুলিশের হেপাজতে"। আমাকে বসতে বললেন। সামনে একটি চেয়ারে ছোট্ট একটি কাঠকয়লার উনুনে তাঁ'র ভাত ফুটছিল পাশে একটি খাটিয়া ছিল। তা'র ওপরে টাঙানো দড়িতে একখানা ধুতি, একটি মলিন কোট এবং একটি জীর্ণ শার্ট ছিল। অন্যদিকে একটি তাকে কয়েকটি ভাংগা টিনের কৌটা, একটি অব্যবহার্য কুকার একটি চটের থলি ও জঞ্জাল ছিল। শ্রীযুক্ত দত্ত একটি ছোট ভাংগা টেবিলের কাছে বসেছিলেন। সেদিন দু'একটি কথা বলে চলে আসি। তার পরদিন আবার গিয়ে বসলাম। সেদিনও তাঁর ভাত ফুটছিল আগের দিনের মত, অনেক কথা হ'ল। তিনি তাঁর আত্মজীবনী থেকে অনেকখানি পড়ে শোনালেন আমাকে। সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁর জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হলাম। তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতামত পড়ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সখেদে বললেন, "টাকার অভাবে এই জীবনী প্রকাশ করতে পারছি না"।

বিপ্লববাদী উল্লাসকর এখনও এইভাবে নিসংগ দরিদ্র জীবন যাপন করছেন, জাতীয় সরকার এবং বংগীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কি স্বাধীনতার পূজারী এই বীরের প্রতি কোনও কর্তব্য নেই? প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণও (প্রাক্তন ও বর্তমান) কি শ্রীযুক্ত দত্তের এই অবস্থার প্রতি উদাসীন থাকবেন? আমরা আশা করি, ছাত্রগণ এ সম্বন্ধে অবিলম্বে তাঁদের কর্তব্য নির্ধারিত করবেন।

—সুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত, সহঃ সভাপতি, প্রেসিডেন্সি কলেজ স্টুডেন্ট্‌স্ য়ুনিয়ন।

Presidency College Magazine

For Our Non-Bengali Readers

[illegible] Magazine [illegible] past issues. [illegible] It is needless to say that [illegible] in our Magazine. [illegible] in the College. But this [illegible] an indication of an early [illegible] give Bengali the [illegible] English [illegible] the playground of our imagination.

[illegible] with in the Editorial is Education and the [illegible] to show that [illegible] system of education [illegible] proper [illegible] spirit of [illegible] education [illegible] moral, physical and, above all, [illegible]

[illegible] special [illegible] the present issue. We have [illegible] of their descendants and past [illegible] Bankimchandra. [illegible] to speak about more than one of them [illegible] will continue this [illegible] till the list is completed. [illegible] issue with Bankimchandra, [illegible] Rabindranath, [illegible] Saratchandra, [illegible] and Prafulla Chandra [illegible]

PRESIDENCY COLLEGE
CALCUTTA
LIBRARY.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] একটি [illegible] ছিল। [illegible] সেদিন, দু'একটি কথা বলে চলে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] COLLEGE CALCUTTA

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

For Our Non-Bengali Readers

AFTER a lapse of five long years we are fortunate in being able to revive the publication of our Magazine. The present issue marks in many ways a departure from past issues. The most notable change is the occupation by our mother-tongue of that place in the Magazine which was held so long by English. It is needless to say that this has not been done in a spirit of vengeance: this innovation is only the natural consequence of the broad change that has come over our national life. Once upon a time, the Bengali language had no place in our Magazine. Later on, after insistent demands by the students for a place for their mother-tongue in the organ of their academic life, it was given a corner to itself. Today the forces of history have brought our mother-tongue to the foreground. But this fact need not be interpreted as an indication of an early exit of English from the Magazine. To give Bengali the recognition that is its due is not necessarily to bid good-bye to English which 'still presides over our thought and holds the background of our imagination'.

The subject dealt with in the Editorial is—Education and the New Set-up. There we have striven to show that a thorough and immediate overhauling of our system of education is necessary for the proper regeneration and progress of our country. We have specially stressed that our educational reforms must infuse amongst students a new sense values and a spirit of hopefulness. We have expressed the opinion th the new scheme of education must provide for an all-round training of tl individual—mental, moral, physical and, above all, national.

Lastly, we take special pride in mentioning a new feature that ha been introduced into the present issue. We have given short life-sketch and portraits of those ex-students and past members of the staff of o College who have rendered invaluable services to the cause of our freedo since the days of Bankimchandra. We are sorry, our limited space doe not allow us to speak about more than ten of them, but we hope succeed ing editors will continue this narrative till the list is completed. We have dealt in this issue with Bankimchandra, Chittaranjan, Acharya Prafulla-chandra, Rabindranath, Ullaskar, Sarat Chandra, Rajendra Prasad, Subhas Chandra, Santoshkumar, and Prafulla Chandra Ghosh.

Are We ?

ANINDYAKANTI MAJUMDAR—*Fourth Year, Science*

THE atom bomb is here to stay—but are we? This is the question that faces mankind today.

Of course, the human race cannot be wiped out completely; the individuals are too small, too numerous, and too scattered to be destroyed by atomic bombs. But, as things stand, President Truman was wrong in saying that the *next* war using atomic bombs would end our civilization. This civilization is already ended. The next few years will either herald in the dawn of a new era or will witness the complete devastation of the world. For, unless an adequate defence against the atomic bomb is perfected or there is a revolutionary change in our ways of thought—there is a very real chance of an atomic war breaking out.

Why?

Basically, our whole political pattern is rooted in the firm and oft-proven belief that a good big nation can beat a good little nation any day of the week. Japan made a try at disproving it—the results are well-known. The San Francisco United Nations Charter accepted that as a basic fact of life; the Council of the Big Five has special prerogatives for the perfectly obvious reason that a good big nation can beat a good little nation.

Once upon a time a good big man could beat a good little man at any time, so a man who stood four-foot-eleven had to be very careful of his manners in talking to a man who stood six-foot-four and made his living by wielding a twenty-pound hammer. Then somebody invented the revolver and the six-foot-four man had to have just as good manners to the four-foot-eleven man, as the little man needed round the big man. The good little man was just exactly as deadly as the good big man. Our present social set-up involves the background proposition that extremely deadly, handy weapons make all individuals equal.

The atomic bomb will also make all the nations approximately equal in size. Belgium, for example, will be considered several sizes larger than Russia or the United States, because Belgium owns most of the world's known Uranium. At present, Belgium does not have atomic bomb plants, but Belgium is a highly industrialized and a thoroughly technical nation, and the secret of the atomic bomb is not an American secret. It is Nature's secret—and Nature is loose-mouthed. She will tell anyone who asks the right questions.

So the situation is that within ten or twenty years all the industrialized nations of the earth will probably be equipped with the atomic bomb. That

will call for a total reorganization of thinking. The smallest nation so equipped must be handled with the same high regard as is displayed to the largest; each is equally deadly. If the hot-headed, emotional, illogical, greedy, egoistic, prideful members of the human race succeed in weathering that time of crisis without somebody, somewhere, getting abnormally excited and shooting off a few rocket-driven, robot atomic bombs at somebody else —it will be a first grade miracle.

Today we stand at the cross-roads of history, and the steps that we take in the next few years will determine whether we are to continue in the path which leads to sure destruction, or whether we can divert the flow of events to bring in an era of far greater prosperity than we have ever known.

If we are to advance, one thing is certain—our ways of thought must change. The days of the loud-mouthed politicians, the strutting generals and the fabulous magnates of industry are gone for ever. The atomic age can have no place for them. Other things will also have to change. The so-called virtues of patriotism and aggressive nationalism, cherished so long —they too must be uprooted from the mind of the human race. We can no longer think of the world as independent, watertight compartments, all hostile to one another. We are too close together. The imperceptible forces of History have long been weaving the peoples of the earth into a single homogeneous fabric. Two great wars have ripped open this fabric and now the atomic bomb threatens to blast it away completely—leaving mankind as it was two thousand years ago. We must prevent this calamity.

The only body of men capable of undertaking this stupendous job are the scientists, they are the only true internationals in the world today. They, and they alone, can understand what must be done for the good of the human race and carry out the task intelligently. Moreover, the real power does not lie in the Army or the Navy or even the Air Force—it lies in the hands of the scientists. So they should start organizing now to take over the control of the world.

Their first task would be to re-educate the people. During the last hundred years, the physical sciences have advanced by leaps and bounds, but the social sciences have not progressed much. The animal instincts in man are still dominant. The result is that a tremendous source of power has been placed in the hands of the people who are completely unfit for the responsibility. The position of the human race is like that of a child playing with matchsticks in a room filled with nitro-glycerine. The matchsticks cannot be taken away, so the child must be taught how and where to use them.

The ruins of Hiroshima stand as a monument of warning before the peoples of the world. That is what may happen one day to London or New York, to Paris or Moscow, to Calcutta or Tokyo. Let us imagine that day, if we can—and then take care.

India and the Machine Age

NIRUPAM SHOME—*Fourth Year, Arts*

THE title of the essay may at first appear rather misleading. Though India may have many characteristics peculiar to herself, neither her tradition nor her way of life is hostile to the introduction of machines which have done a world of good to humanity at large. If it is agreed that the machine has conferred many benefits upon the world, it follows automatically that it will confer many benefits upon India too.

Poets and saints and philosophers have condemned the machine to extol poverty. They maintain that people before the advent of the age of machines were simple, honest and straightforward. It is the machine that has worked a fatal change in their mental outlook and made their life so very complicated. Our poet Rabindranath once wrote—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর।"

But why should the machine be condemned on the ground that it will not let us remain poor which is, in effect, what these people want us to? Poverty is not something to be proud of. Bernard Shaw in the preface to one of his plays says that phrases like " holy poverty ", "poor but honest", " the respectable poor " are as intolerable and as immoral as " drunken but amiable ", " fraudulent but a good after-dinner speaker ", " splendidly criminal " and so on. According to him, the greatest of our evils and the worst of our crimes is poverty, and our first duty to which every other consideration should be sacrificed is not to be poor. And if the problem of poverty is to be tackled successfully, machines are of invaluable help. The world cannot do without them and least of all can India.

A section among the sociologists have laid much emphasis on the evils of excessive mechanization. According to them the machine merely helps a few to ride on the back of millions and the impetus behind it is not philanthropy to save labour but greed. It kills the individuality of the workers. The workman is dehumanized and brutalized until he becomes a crippled monstrosity. His intellectual and moral development becomes stunted. Lemontey has put these evils of machinery in a classical phrase, " It is a sad confession for a man to make that during his whole life he has done nothing more than make the eighteenth part of a pin".

While these sociologists have not been bold enough to advocate the total abolition of machines, Gandhiji has gone to that length. He firmly believes that the machine has been the bane of our civilization and especially in a country like India where a decentralized economic system once prevailed,

it is a curse. Though he has somehow reconciled himself to the machineries needed for the defence of the country he is dead against the introduction of anything beyond this minimum. He advocates a return to the village republics of pre-British India. In the future the economic system in India will be based on the principle of decentralization and an ideal form of agriculture and industry will be developed. Agriculture will, of course, be carried on without the help of machines like tractors, threshers, or winnowers. Cottage industries will be given preference as far as practicable.

Do not all these sound very curious and run in flat contradiction to commonsense? Those who are so eloquent on the evils of the machine are, however, conspicuously silent on its benefits. The history of human civilization is largely a record of inventing better machines. To-day we live, move and have our being in a world of machines. There is no corner of a man's life where it has not its sway. He owes his necessaries, comforts and luxuries all to the machine. It is with the help of the machine that he performs to-day the wonders which his forefathers could not have dreamt of a hundred years ago. To-day reclining in an easy chair in Tokyo, he may hear Paul Robeson singing in New York or see Don Bradman at the Lords sending ball after ball to the ropes amidst wild cheers from the galleries. The machine has enabled him to round the world in four days, to fly over the highest mountain, to scan the sky, to link up the distant parts of the globe with one another, to conquer most of the diseases and to peep into the mysteries of Nature. He is no longer the helpless toy of the mysterious forces of Nature, but the proud lord of the three worlds of land, air and water. Even if it has not been an unmixed blessing it is man who is entirely responsible for this, and we cannot on that account resolve to do without the machine. It is impossible for a fish to deny the existence of water. And surrounded as we are with hundreds of different machines, if we intend to abolish them altogether, surely we would be guilty of acting unwisely.

Therefore, once we put our feet through the picture and touch reality, we shall find that neither the world nor India can do without the gigantic, high-powered modern machines. Even if their introduction in India means a total break with the past, we cannot help it. To-day India presents a sordid picture of filth, squalor, disease and ignorance. It is a picture of millions of ill-clad starving peasants working at their tiny holdings from sunrise till sunset with a pair of bullocks and never making a hearty meal. It is a picture of village craftsmen leaving aside their tools and implements and taking to cultivation, thereby increasing the pressure on the soil and accelerating the tendency towards sub-division and fragmentation. It is a picture of men and women with faces haggard with toil and underfeeding, but compelled to sit idle for at least six months of the whole year. It is a picture of children underfed and clad in rags, growing up without the barest

necessaries of life, and living only up to the age of about twenty. If any country of the world stands in urgent need of machines, it is India.

Russia, before the Proletarian Revolution of 1917, presented the same gloomy picture. But since then there has been a phenomenal rate of advance of Soviet industry and agriculture. The following table taken from a semi-official account of the achievements of the Soviet Government shows that in Russia the introduction of up-to-date machines has gone hand in hand with increasing national income and consequently a marked rise in the standard of living of the masses.

	1913	1940
POPULATION	139 millions	193 millions
COAL	29 million tons	164·6 million tons
ELECTRIC POWER	1·9 billion kilowat Hrs.	39·6 billion kilowat Hrs. (1938)
OIL & GAS	9·2 million tons	184 million tons
STEEL	42 million tons	184 million tons
TRACTOR	Nil.	523 thousand
GRAIN	801 million centners	1195 million centners
COTTON	7·4 million centners	25·2 million centners
HOSPITALS (beds)	175 thousand	840 thousand
EDUCATION (Schools)	7·8 millions	35 millions
BOOKS	85 millions	701 millions
THEATRES	153	825
NATIONAL INCOME	21 billion roubles	125 billion roubles
BUDGET EXPENDITURE	6670 million roubles (1928)	173,259 million roubles

The same tale will be told of India. Indian agriculture is at present in a hopelessly primitive conditon. We hope, in no distant future, the

system of collective farming on a large scale will be introduced and proper irrigational facilities and systems of drainage will be offered to the cultivators. Machines and labour-saving devices like tractors, winnowers, seeders, sacrificers, compound threshers, self-delivery reapers, flax-brakes and so on will be offered to the collective farms by the state. We are told by an economist of no less eminence than Sir M. Visveswaraya that if the system of agriculture is thus revolutionized agricultural production will increase at least three times. The cultivator will then have a far better standard of living than he has at present.

Let us turn to the introduction of machinery in the sphere of industry. Gandhiji once wrote, "What is industrialization but control of the majority by a small minority?" (*Young India*, 6-8-1925). He obviously referred to industrialization under a capitalistic economic system. Whatever may be said against large-scale industry it is a fact that the wealth of individual nations is practically commensurate with the extent of their industrialization. To-day hardly 11% of our working population is engaged in industrial occupations and of these only 12% work in the big factories. The result is that in the year 1937-38 we imported 108 crores worth of manufactured goods and exported 81 crores worth of raw materials. And the pity is that a good part of the imported manufactured goods was merely our own exported raw materials worked up into finished products by foreign industrial concerns. No wonder our per capita income should be as low as less than three annas a day.

Industrial production of any substantial magnitude involves above everything else the introduction of high-powered machines. There are only three industries in India which have made any headway. They are the Cotton Industry, the Jute Industry and the Iron and Steel Industry. Comprehensive economic planning in the sphere of industry is of the highest national importance and will have to be adopted at the earliest convenience. Of the various industries that can be developed in India, special mention should be made of the following: air-craft, ship-building, motor-cars, aluminium, tanning and leather, heavy chemicals especially sulphuric and hydrochloric acids, glass-manufacture, paper, railway wagons and engines.

The benefits of mechanization in India can hardly be over-estimated. It will raise the standard of living. It will relieve the excessive pressure on soil making the economic system of the country more stable. The state will prosper because of the increasing taxable capacity of the people. It will give scope to a diversity of aptitudes and talents and will make the people more intelligent and progressive. It will solve the problem of unemployment to a large extent and have an important bearing on the military efficiency of the people. And agriculture and industry being nationalized, the evils of machinery will become conspicuous by their absence.

Now that we have achieved our political freedom, we should pool every bit of our national energy to extend that freedom into economic and social spheres. We are looking forward to the economic regeneration of our country which will inevitably take the shape of introducing better and more up-to-date machines. It remains to be seen whether the Indian Dominion Government can successfully tackle this colossal problem.

The Way to the Good Society

AMLAN DATTA—*Ex-student*

This article, with the exception of some minor changes, was written in 1944 when I could still count myself among students of the Presidency College. As I look through the article again I feel a temptation to make a number of important changes. I choose, however, to resist that temptation. I make a present of this article as if a student in the past could hold out his hand over the intervening years and offer his written thoughts to students at present.

THE reformers who claim to hold the key to the new world may be divided for analytical purposes into two classes. Some say that in order to improve man and the conditions of his life we have to change only the material environment in which he is brought up. Man is a tool of his environment, and the substance of his life is determined by the forces which act on him from the outer world. Mental change follows, not precedes, change in the material environment. The only effective way of improving man's mode of living is to operate on the circumstances in which he is placed. For example, in order to bring exploitation to an end we have only to abolish private property which is the material instrument and cause of exploitation. Thus the 'materialist' argues. If we stretch sufficiently the meaning of the term 'environment' we may indeed bring a great many, if not really all, groups of reformers under this class. But 'materialists', as we have used that term, represent a certain point of view which justifies us in narrowing down the meaning of 'environment'. And in that narrowed sense we are justified further in regarding the Marxist as the fittest representative of the materialistic school. Reformers of the opposite school believe that we must re-make the mind of men before we can effectually re-make the world. Social institutions work as they are worked by man. They grow in response to the totality of impulses that move men. So long as human nature remains what it is at present, the society of man will not substantially change. There may be changes, apparently revolutionary, in its outward forms, but none in its inner soul. Among the reformers of this class some emphasize the importance of training the intellect of man, others emphasize moral reform, still others spiritual awakening. Such differences

are important, and they often indicate vital differences of emphasis. But for the present, we may bring all ' mental reformers ' under one group so as to distinguish them from the other group of which we spoke earlier. For the present let us take the moral and spiritual reformers as the fittest representatives of the group of mental reformers. The moral reformer believes that it is through each man striving after a higher moral standard in life that the collective morality of society can improve and social institutions permanently adjust themselves to the needs of this improved morality. The materialist challenges this belief. He points out that the failure of the spiritual leaders of the past to change and improve society proves the error of their guiding principle that mental reform is primary.

The broad difference between those who regard external circumstances more important and those who believe that internal reform is primary has stood out in history whenever man has been called upon to pass judgment on his past and decide on a course for the future. An example may help understanding. In the sixteenth century, when corruption lived in the heart of the Church, Erasmus urged his fellow men to live a Christ-like life as at once a step towards and the goal of true reform. Luther believed in institutional changes and was, in common terminology, more 'revolutionary'. Those who belong to the group of materialists will point out that Luther got what he wanted and Erasmus did not. Those who belong to the other group may retort that the institutional changes which Luther secured did not lead to the establishment of the ideal he had in view. In our age, again, we have been called upon to pass judgment on the relative merits of the two contending views. Gandhi, in this age, is the truest representative of those who have faith in the moral and spiritual means of reform. The gospel of non-violence exhorts the individual to prepare himself for sacrifice and secure the freedom of the soul. The fight for political independence must not conflict with but openly assist and be assisted in turn by this incessant struggle for inward freedom. The Marxists, on the other hand, constitute the largest single body of men who do not believe in the sanctity of means. For them the end justifies the means. A surgical operation, though it inflicts immediate pain, is good because its aim is the well-being of the patient. The same analogy holds everywhere. The only significance of a means lies in the consequences of its adoption.

It is highly probable that neither of the two points of view presented above is wholly correct. We shall explain below the difficulties of accepting either of these two points of view.* To begin with, we shall note the Marxist case. We shall then take note of some of the important elements

* Actually, no group—neither the Gandhian, nor the Marxist—accepts in practice either of these two points of view in its pure form. The practical distinction lies in differences of emphasis.

of truth in the Marxist contention. Finally, we shall try to explain the inadequacy of the materialist prescription.

* * * *

Marxists urge that if society is to be effectively reorganized the present competitive basis of production must be abolished and with it private ownership in the means of production must go. The means of production should be socially owned and production should be reorganized on a co-operative basis.

Before we set out to discover the important elements of truth in the Marxist case against capitalism we must be careful to distinguish the strictly Marxian case from the 'moral' case against capitalism ably presented by many socialists whom Marxists ridicule as utopian. It is easy to see that the 'moral' arguments against the competitive system are overwhelming. The general principle in a competitive system is that one man's success is another man's failure. Once we accept this principle we are speedily led to a position where wisdom becomes synonymous with constant distrust of the motives of other men and ruthless pursuit of what we feel to be our self-interest. We begin to kill sympathy and all our finer impulses better to equip us for 'the struggle for existence'. The so-called 'scientific' socialists disdain, however, to make use of these moral arguments against the competitive system. They prefer to build their case on the contention that the existing system is economically wasteful.

We shall not concern ourselves here with the precise Marxist exposition of the causes of waste and instability under the capitalist system. It is clear that the charges brought by Marxists against the existing economic system are largely correct whether or not these charges have been framed by them in the context of the soundest theory. Capitalism supports inequality on a scale that cannot draw justification from a naive appeal to considerations of so-called 'incentive'. It is attended with unemployment of a magnitude that cannot be explained simply by frictional forces that any economic system must inevitably contain. It has also failed to provide a solid basis for utilizing science for common welfare. Under capitalism scientific innovations are adopted in the method of production only if such innovations hold out a clear promise of increased profits for the private businessmen concerned. Thus social interests are taken account of only to the extent that they coincide with the interests of private businessmen. But it is only in a state of general economic equilibrium attained under conditions of perfect competition and unhampered mobility of resources that the interests of private businessmen coincide, even in the limited sense which classical economists had in mind, with the interests of society as a whole. These conditions are not fulfilled in actual life. Perfect competition, for example, is contradicted by the very scale on which production is being organized in a growing sector of the economic system. The truth that the

interests of private businessmen come into violent conflict with social interests in a period of economic instability has been driven home to millions in this country who have witnessed the paradox of increasing hoarding of foodstuff proceeding simultaneously with the mounting number of death from starvation. It is clear from these and other similar considerations that the economic interests of society are bound to suffer heavily under a system which leaves production in the care of private producers.

We may note here another aspect of the problem. Abolition of certain important forms of private property is essential for a rational readjustment of social relations. The Marxists offer one of their most valuable conclusions when they insist that real power in society lies with those who own (or, better, control) the important means of production. The reason for this is simple. The so-called free contract is the basis of our competitive economy, and a contract between two parties reflects always the relative bargaining power of the parties involved. Now, obviously enough the bargaining power of those who control the tools of production is superior to the bargaining power of those whose only chance of earning a livelihood lies in the opportunity to work with these tools. The owners of capital hold a strategic position in our economic system, and they take advantage of this position to dictate terms of contract which are unfavourable to the working class. At this point we may pass on to a more general proposition of far wider import. Social life will, in the main, continue to be built on contracts, open or tacit, of different time-dimensions (love that seeks no return forming only a small part of it), and if these contracts are to be fair to all who are bound by them, the abolition of ownership in the important means of production followed by a radical readjustment of productive relations is urgently called for.

* * * *

Will such institutional changes as the abolition of competition and private ownership of the means of production suffice to bring in the good life? It is difficult to answer this question completely in the affirmative. Private property may be the main instrument of exploitation in our society, but abolition of private property will not, by itself, offer any inducement to man to change his nature for the better, to conquer his love of exploitation and transfer his aggressive spirit into more fruitful channels. Yet if this change in human nature is not accomplished, the closing down of particular outlets for the baser impulses of man will only lead either to devitalization, or, more probably, to the opening up of newer outlets for these destructive impulses. The reply of the Marxist to such arguments may well be anticipated. He will fall back on his general theory and argue that as the cultural superstructure of a society is determined chiefly by the productive relations which lie at the basis of society, there shall occur an automatic change in the mental habits of man when production comes to be organized

on a co-operative basis. Continuing, he may quote and defend Madison's proposition that 'property is the only durable source of faction', and from this he may derive that when property is abolished man will shed his pugnacious habits. At this point it may be brought to the notice of the Marxist that in a socialistic state where all power is centralized, there may be some working co-operation in the economic sphere, but bitter struggle for power in the political field. It may be hinted to him that propety is not the only object that excites the possessive instinct of man: the lure of political power may be as potent a source of faction as property itself. The Marxist will perhaps answer with the same naivety that characterized his earlier arguments that in an economy based on co-operation the comradely spirit will rule supreme and that to think of struggle for power in such a community is to judge the wholly dissimilar situation in a collectivist society in terms of our common experiences in a capitalistic world. The 'materialist' who is fighting for his new order with the zeal of intense idealism may be excused if he feels an instinctive tendency to slur over real difficulties and cling to easy optimism. All thoughts which lighten our burden of fear or responsibility have an attractiveness entirely out of proportion to their purely rational content. It is an attractive thought that human wickedness is properly regarded as a product of existing institutions and once these institutions are broken down wickedness will disappear as readily as an effect in the physical world disappears when its cause ceases to function. Unfortunately, human wickedness seems to have an origin underivable from existing institutions, and human habits have a tenacity all their own which has no obvious parallel in the physical world. It is not suggested here that social institutions have no influence on the moral life of man. What is suggested is that human instincts are not 'derived' from the external environment, but interacting with that environment they create historical situations. It is true that in the process of adjustment with environment man changes his 'character' as he instinctively surrenders the satisfaction of some weaker impulse whether in blind or in deliberate expectation of obtaining in return the satisfaction of some stronger and more insistent demand of his nature. But the most fundamental tendencies do not easily change. History reveals that such desires as love of power and domination have an abiding tendency to express themselves in human activities through changing time and environment except when these desires are temporarily dominated or radically transformed by still more powerful motives and impulses. Such powerful motives and impulses can be released only by a newly born spiritual movement which, while it responds to the deeply laid spiritual cravings in men, does not put itself in uncompromising hostility to men's elementary material needs and the means of fulfilment of such needs.

* * * *

I conclude that such institutional changes as Marxists prescribe will not suffice to bring in the good society. Institutional changes are necessary. But added to these we need a new awareness of the higher values in life. Conflict is inherent in the scheme of things whenever several parties strive for some common object the very nature of which makes it inevitable that the gain of one means the loss of some other. Property is one such object. But it is not the only one. Every object of desire, whether it is wealth or power, which by its very constitution is limited possesses this common characteristic that the more one gets of it the less is left for others. Only such objects as are not limited through possession can be sought together by different men without provoking conflict. Knowledge, appreciation of beauty, these are among such objects. Where knowledge is sought for its own sake, where beauty appeals by its inherent virtue without depending on the aid of any external allurement, where love is robbed of the spirit of possessiveness, a man can strive for the good life without fear or jealousy for those who have similar ideals as his. It is clear from what we have stated above that the problem of social reform is two-fold. We have to remould existing institutions and create new avenues along which it is possible to serve the interests of the self in consonance with the interests of society. But we should recognize that it is impossible to build a social structure the very mechanism of which rules out the possibility of any conflict between personal interest and social interest. We have, therefore, to create new spiritual interests which can be relied upon to prevent the pursuit of personal interests in opposition to social interests even where the opportunity of such pursuit exists 'objectively'. Our devotion to higher values should not, however, stop at the point where it gains just sufficient force to put a check upon hostile anti-social desires. The value of the good life far transcends the value of any such negative ideal as the elimination of conflict or violence in the social sphere.

Recent Developments in the Theory of Value

ANIL ROY CHAUDHURI—*Sixth Year (Examinee), Economics*

THE title of the article is an imposing one. But it is impossible to do justice to the subject within the brief compass here available. The literature on the subject is so large that even a mention of the more important works will reduce this article to a mere catalogue of names. Selection raises the difficult question of assessing the value of contemporary

writings; opinions must widely differ. The heterodoxies of to-day may be the major tributaries to the stream of economic science in the future. Nevertheless, a broad selection may be generally agreed upon. And I shall attempt to indicate these broad lines with a historical perspective.

1. I shall maintain the thesis that the development of economic thought cannot be viewed apart from the development of the economic situation itself. It is the widening gap between the facts of economic life and the teachings of economic theory that produces a dissatisfaction with the theory itself. This dissatisfaction gives an impetus to the new quest, and the new theory is born in consonance with new facts of economic life. But this new theory is not the mere tail-end of the new situation; it promises to react upon the situation in turn.

2. It is helpful to begin with the Marshallian analysis of value. As a preliminary to Marshall's ideas it is necessary to indicate the economic environment that prevailed in England at his time. Nineteenth century was a period of prosperity and expansion of industrial capitalism. Production was carried on in small, individual firms under private initiative. Commodities were not so widely differentiated (really or artificially) as they are done to-day. Each firm produced only a very small proportion of the total out-put of any commodity. In short, the character of production was private, atomistic and competitive. In such a world, the assumption of perfect competition did very little damage to reality. And the Marshallian analysis of value is founded on this assumption of perfect competition between small, individual producing units. Not that Mrashall was altogether unaware of the existence of imperfection in the competitive situation; he even mentions the phenomenon of imperfect markets. He mentions that each individual producer has a market of his own. But he considered these phenomena to be minor exceptions; his faith in the immutability of perfect competition continued unabated. He remains content with an analysis of value under perfect competition on the one side and perfect monopoly on the other. The intermediate field has been left unexplored by him on the plea that the analyses of value under perfect competition and perfect monopoly present the two extreme models; any intermediate situation can be explained by its degree of approximation to the one or the other. It is here that the Marshallian analysis appeared to the moderns most unsatisfactory.

3. Meanwhile interesting developments were taking place in the economic world itself. The era of flourishing capitalism came to an end with the advent of the twentieth century. The growth of big firms facilitated by new technical developments and methods of organization, rise of trust and cartels, artificial monopolistic situations created by either real or imaginary differences between products, advertising and cut-throat competition, duopoly and oligopoly became the dominant features of the new situ

tion. The hey-day of capitalism was at an end. The very qualities which inspired its apostles to defend that system now appeared to be imperfectly present—even non-existent. Perfect competition disappeared from the scene and monopoly dominated the field.

Side by side, fundamental developments were taking place in the corpus of "Pure" theory itself. There were many loose ends in the Marshallian system of equilibrium of demand and supply. Particularly his analysis of individual firms, increasing and decreasing cost, external economies appeared to be ambiguous. Attempts to clarify these concepts caused dissatisfaction with the Marshallian analysis. In a large number of cases experience showed that a threatened onset of diminishing returns was not the real obstacle to an expansion of production by the individual firm. More often than not, costs decreased as output expanded. It is the imperfection of the market that formed the barrier to expanding output, not the character of the firm itself. Indeed, as Kaldor has shown, in the long period static state there is no fixed factor at all for the firm which may set a limit to its expanding production. I shall turn to Mr. Kaldor's argument later on.

These recent developments in the theory of the market and individual firm exemplify both the interplay of theory and facts and the dialectical development of thought itself. Of course, it would be incorrect to say that the actual study of monopolies like Standard Oil Company and Imperial Chemicals promoted this type of thought. But still it is the failure of "Pure" theory to correspond to reality that gave stimulus to the new quest. And, as a result, "Pure" theory drifted away from perfect competition moorings and turned to monopoly analysis for anchorage. The rediscovery of Cournot's work corresponded to these developments. Marshall himself pointed to the possibility of cut-throat competition due to the operation of increasing returns.

4. Amidst this growing discontent with "Pure" theory, Piere Sraffa published his celebrated article in the Economic Journal of 1926 which is, indeed, a land-mark in the history of the development of economic thought. In this article Sraffa shows the unsatisfactory character of the laws of return in the Marshallian system. An analysis of demand and supply quite independent of each other was possible only in a very small number of cases while the existence of decreasing cost due to "internal" factors presented a veritable conundrum. Sraffa proposed to tackle it by abandoning the facile assumption of perfect competition. He suggested that the individual firm finds the limiting factor in the market, not in the conditions of production.

Sraffa made a bold start and on that foundation Prof. Edward Chamberlain and Mrs. Joan Robinson built up an imposing structure. Both Prof. Chamberlain and Mrs. Robinson used their apparatus in such a manner as to include all types of market phenomena—whether competition, monopolistic

competition or pure monopoly. The entire approach is based upon the average-marginal relationship so well known to readers of economics. It is on this relationship that the analysis of individual sellers' output is based. The degree of competition exerts its influence only in moulding the cost curves and revenue curves of firms. The structure of analysis or the tools used are equally applicable to all sorts of market phenomena. This generalized approach opens up newer possibilities. It is now possible to compare monopolistic and competitive output by using the same technique of analysis. This comparison has a very important bearing on the maximization of welfare of the community. It enables us to compare the results of monopoly and competition and to frame policies to interfere with the increasing degree of market imperfection in order to achieve the optimum allocation of resources and maximum total output for the community. Prof. Pigou, writing in 1920, was faced with the same problem. But he had not the requisite apparatus in hand to reach definite conclusions. Mrs. Robinson's work eminently fulfils this requirement and furnishes the theory for which practical men had been groping for long. Attempts are being made to frame policies to interfere with imperfect market conditions in order to achieve optimum allocation of resources. But the topic cannot be pursued any further as we are encroaching upon welfare economics.

5. These developments in the theory of markets indicate a sharp swing to microcosmic analysis. Marshall's analysis of supply does not proceed from the analysis of firms to the supply curve of a commodity, but the other way round. His main preoccupation was with the demand and supply curves. He had primarily these two-dimensional curves in mind from which he proceeded in search of the ultimate determining factors. In his system, these ultimate factors are utility on the demand side and disutility or cost on the side of supply. It is on the balancing of these two motives that the Marshallian equilibrium is based. But the difficulty arises because utility and cost conditions are not identical. The ultimate determinants of utility are individuals. Hence an analysis of the individual's utility function may be clue to the determination of the demand curve. But not so with supply. Production is not carried on by individuals, but by firms. It is the firms that translate the disutility resistances into costs. An analysis of supply, therefore, is inadequate without an analysis of the firm. Marshall leaves one uncomfortable on this subject. The vagueness that surrounds his concept of "Representative Firm" arises out of his attempt to find out a firm that will suit his supply curve, not the analysis of firm equilibrium itself. This is why Mr. Robertson remarks, "In my opinion, it (representative firm) is nothing more than a small-scale replica of the cost curve of the industry as a whole." This only accentuates, without solving, the neecessity of firm analysis as such.

Modern tendency has been to analyse the cost conditions of firm primarily, and then to deduce the supply conditions from that analysis

This indicates an extension of microcosmic analysis to cover the phenomenon of supply.

The debate on firm analysis began with Lionel Robbins's article in the Economic Journal, 1928 where he severely and somewhat unfairly criticizes the Marshallian concept of Representative Firm. This was followed by a " Symposium on Increasing Returns and Representative Firm " in the Economic Journal, 1930 in which D. H. Robertson, P. Sraffa and G. F. Shove participated. An attempt was made by Mr. Robertson to justify Marshall on the latter's own ground. But the debate helped a great deal to reveal the unsatisfactory character of firm analysis. Mr. E. A. G. Robinson in his " Structure of Competitive Industry " reached several stable conclusions regarding the firm's equilibrium. Under perfect competition, each industry will consist of just the number of firms that can produce at the minimum average cost. The size of each firm will be determined by the efficiency of the entrepreneurial unit that manages it. From this standpoint, there is not one optimum, but several optima. This analysis has been given a geometrical formulation in Mrs. Joan Robinson's book where she uses the U-shaped cost curve of the firm to indicate the firm's output. In 1934 Mr. Kaldor carried forward this line of analysis to a further step. Mr. Kaldor shows that in the long period static equilibrium there is no factor whose supply is fixed for the firm. Entrepreneurial ability might have been such a fixed factor; but in the static state, co-ordinating function of an entrepreneur is unnecessary because in such a state uncertainty is absent. Hence, enterpreneurial factor is unlimited for any industry in the static state. There is no reason whatsoever why the cost curve of the firm should rise at all. In the long period static equilibrium, therefore, there is no reason why competition should persist. Hence, Kaldor concludes, " Long period static equilibrium and perfect competition are incompatible assumptions ". Perfect competition is thus dealt another death blow.

6. Throughout the above account I have been concerned almost wholly with conditions of supply. But another interesting development was taking place contemporaneously in the body of "Pure" theory. The utilitarian approach to demand has been very seriously questioned in recent years, notably by Prof. Hicks.

Hicks's approach to the problem of value has been altogether different from the English tradition. He is more concerned with the phenomenon of inter-relation of markets and general equilibrium of exchange than is the tradition with English economists. His analysis, as he himself admits, is in itself a following and further advancement of the general equilibrium analysis of Walrus. In 1934, Prof. Hicks and R. G. D. Allen published their approach to the theory of value. It was something unfamiliar to English tradition, more in line with Lausanne School and the Austrians. Later on in 1939, was published Hicks's book " Value and Capital " which

tries to approach the entire problem from a new angle. It proceeds in a single chain of argument from the problem of markets to the theory of trade cycle. A novel venture, no doubt.

Prof. Hicks dispenses with the concept of utility and introduces us to the marginal rate of substitution and the principle of the diminishing marginal rate of substitution. Preferences are represented by indifferen curves of an ascending order of magnitude; we may know that a given posi tion C is preferred to A and that there may be an intermediate position B. But there are no means of—and perhaps no meaning in—attempting to measure the distance of C from B compared with that of B from A. Prof. Hicks in effect issues a challenge to the economic world to do nothing less than abandon once for all the concept of utility, so familiar in the clas room. Marshall obviated the difficulty by assuming the marginal utility of money to be constant. And Prof. Hicks admits the largeness of truth in this assumption. Still, in order to be precise, he puts forward his alternativ approach. Of course, there is not much harm in keeping alive alternativ methods of approach; too hasty a scrapping would probably be injudicious. Indeed Prof. Bernard has attempted to give a mathematical precision to th Marshallian approach. The intricate mathematical nature of the argumen withholds me from attempting to indicate its nature. The matter may b left to individual discretion for the time being; only a rather length experience can be decisive in what is fundamentally a matter of expediency

But what is most unfortunate about Hicks's approach is his neglect o the phenomenon of imperfect competition even in 1939! He ignored this on the plea that the consideration of imperfect competition involves a wre and " the threatened wreckage is that of the greater part of econom theory". But perhaps there is no reason for such gloom. Recent analys of imperfect competition has opened up newer horizons for the theory value and perhaps has left economics less unseaworthy than this senten suggests. Prof. Hicks has been violently criticized by Eric Roll for th deliberate omission. While Roll somewhat overstresses the point, it mu be admitted that Hicks's failure to recognize the importance of imperfe competition as late as 1939 is unfortunate.

7. Lastly, a few words must be said on the method of approach the theory of market equilibrium. Marshall's analysis proceeded by tackl the problem part by part, commodity by commodity. The phenomena interrelated markets received rather scant attention from him. His meth is known as the "Partial" equilibrium method as contrasted with "General" equilibrium method of Walrus which looks upon the problem one of equilibrium of the whole system of exchange. Statically viewed, is very simple. The number of equations must be equal to the number unknowns in the economic system, thus rendering the system a determin

one. Prof. Hicks alone among English economists has carried forward this method of approach.

In Marshall, one finds a curious mixture of static and dynamic elements. Dynamics is that part of economics "where every quantity must be dated". Marshall's consideration of the time element is an attempt to introduce dynamic elements in his analysis which is fundamentally static. Marshall had an abhorrence of static analysis because of its unreality to the world of existence. But static analysis is in itself useful if the dynamic determinants are discussed in their proper place. Prof. Hicks follows the method of first discussing the problem of market equilibrium in a rigid static state and then introducing elements of dynamic change, like expectations and capital accumulation.

There has been very little dynamic analysis in economic theory so far. Prof. Hicks's attempt is a bold one. New horizons lie ahead of economists of the coming generation to explore the possibility of dynamic analysis. There has been a lull in this sector of economic theorizing for some years past. This is mainly due to another important and far-reaching change that has been taking place in the sphere of microcosmic theory. I mean the Keynesian economics. It has obsessed the economists of our generation in a sharp degree. The possibility of equilibrium of the system below full employment has opened up the need for new theorizing in the sector of value. Attempts should be made to connect the theory of market equilibrium to the cyclical income and output changes of the capitalistic economic system. That is the sphere to which the attention of the new generation of economists should now be directed.

Is the Universe Finite?

PROBHAS KUMAR MUKHERJI—*Second Year, Science*

WE are at the threshold of the most exciting period in the history of Science. In the brief space of a few decades the vast field of man's discovery, thought and belief has received such revolutionary re-orientation that its resultant structure retains only the barest resemblance to that which had hitherto been accepted. Modern Science has in recent years outgrown the mediæval limitations which had restricted its sphere to the dispassionate, dry-as-dust statements of facts and experiments. It now recognizes a sphere of thought as its own, on which has come to be raised a super-structure of scientific philosophy. It is paradoxical that the people of civilized countries in this scientific age should be kept out of the knowledge of the mysteries of Universe itself!

The question naturally arises: Is there a limit to the Universe? Or, does it extend infinitely into infinite space? The common run of men believe that the Universe is infinite. But this notion has always been attended by certain difficulties. Consider, for instance, the distribution of the stars. Are we to suppose that the stars are scattered more or less uniformly throughout the space? Or, are we to suppose that they will exist within a limited volume of space and that empty space spreads out to infinity in all directions about them? Each of these alternatives has its own difficulties. If the stars are scattered more or less uniformly throughout the infinite space, it can be shown that the night sky should be very much more luminous than it is. If the stars form an island in infinite space, then under the influence of their mutual attractions, some of them should attain very great velocities. Such velocities have never been observed. Such difficulties are among the reasons that led Einstein to formulate the theory that the Universe is finite but unbounded!

The theory that the Universe is finite is now accepted on all hands and the theory is proved with the help of "four dimensional continuum". We are aware of only three dimensions, e.g., length, breadth and height or wholly "space". But Einstein placed before us "four dimensional" adding "time" to space. But the question naturally arises: Why should we agree to four dimensions? This needs an explanation like this:

Let us suppose that a flattish caterpillar is moving in two dimensions on the skin of an orange. It burrows its way in all directions but fails to cut its way out. So ultimately it will remark: "Poor I am! I am moving straight ahead day after day but I have not found the least hint of an end. Does this not mean that I am moving in an infinite space?" Obviously the creature speaks accurately, for it has knowledge of only two dimensions. Moreover, the creature may think that he is moving in a straight line, whereas to an outsider, the path seems to be constituted of the arcs of a circle. Now this caterpillar when, in course of time, became a butterfly, it came into possession of the knowledge of three-dimensional space. Then it would doubtlessly detect its fallacy and would say: "What I should have inferred is that the orange was unbounded. It is after all a very finite orange, for I can now realize that I repeatedly made tours of what seemed to us to have no end". And so for ourselves, if we could get free from the trammels of three-dimensional experience we should perhaps find no difficulty in thinking of a Universe boundless but finite! Let us now see what the theory speaks of:

The theory tells us that the space itself is curved. Of course, this curvature is not so vivid, not so graphic as that of a tennis-ball or of our earth. Obviously, the latter cases are of three-dimensional space, and their curvature confines the material in them with definite dimension and shape. But, on the other hand, the heavenly space is not to be comprehended so easily,

as it involves factors beyond our normal experience. The Relativity mathematician tells us that the cause of the curvature out in the space is the presence of matter in its vicinity; much as the waves on the surface of a pond are related to a pebble thrown in it. Similarly, the matter in space causes a permanent change in the properties of space near it, which, for lack of a better name we call curvature. With the movement of matter in space, the corresponding curvature also moves. So that the curvature in space is an indissoluble concomitant of matter. Now, this curved space in the vicinity of the sun, and not gravitational force, asserts the theory of Relativity, is the cause of planets revolving round the sun. The planets follow the path of least resistance in following the groove carved out by the curvature of space in the neighbourhood of the sun. Not only matter but radiation also passing near a heavenly body, would follow the path of least resistance and in its straight passage would get bent round in the vicinity of a heavenly body. During an eclipse of the sun this bending of light has been successfully observed.

Now, therefore, the more matter there is in the Universe, the more curved space is, the more readily it bends back on itself and, in consequence, the smaller is the size of the Universe. In this way, it can be definitely asserted that the Universe is unbounded yet finite, but not infinite in extent. It would be infinite only when totally devoid of matter.

Burma—India's Little Neighbour

BIDYUT NIYOGI—*Fourth Year, Science*

AS soon as we enter Burma, directly we will see that the people of the land are all followers of Buddha. Wherever one goes to, be it town or village, one will come across the Pagodas (temples), the pongyis (monks) and the Burmese monasteries, all of which are constant reminders of Buddhism. Buddhist teaching, Buddhist law and Buddhist religion seem to govern everything in the lives of the people.

This beautiful 'Land of Pagodas' has the most wonderful natural feature in the River Irrawaddy; this great river runs from the North to the South, almost throughout the whole length of the country, and has served the Burmese people since the beginning of their history and is still doing so with its regular service of river steamers. It serves as a cheap means of movement over the country, for travel by the Burma Railways is rather expensive.

High mountain ranges, thickly covered forests, shut in the deep valleys

of the River Irrawaddy, the Sittang, the Salween and their tributaries. The thick forests are still the home of the wild elephants, the haunts of the tiger and the leopard. In these forests can be seen patches of land, cleared and cultivated, with small Burmese villages around. The huts built on stilts are familiar sights all over the country. We now come down from the hills, over the plains on to the port of Rangoon.

The cosmopolitan city and the ' big front door ' of Burma is Rangoon. This town stands at the southern end of the Pegu Yomas, the little hill on which the Shwe Dagon Pagoda is built, being the last spur of those hills. Rangoon is Burmese enough, though it has its Indian quarters, its rice-mills, saw-mills, oil-refineries and numerous other things. This war-torn city can still show a Hindu Temple, a Christian Cathedral, a Chinese Joss House, and the inevitable Buddhist Pagoda in a single street. Walking along the strand, we can also come across people of most of the trading nations of the world.

The Burmese people are happy and cheerful and have a habit of speaking with marked politeness. They dwell mostly in the valleys and the plains along the rivers, growing rice and fruits in their own villages, leading an easy life in that fertile country where the hot sun and the heavy summer rains ensure good crops without much labour. The hill-tribes, however, have a much harder time, for they must clear the forests and cut terraces, if they want to grow crops. Of these hill-folks the Shans are the best known. History tells us of the Shan kings, and of their mighty deeds, but now things are different with them, they are only labourers and raftsmen. They wear very little clothes, and protect their heads from the Tropical sun with the aid of large straw hats. We then come to the 'Chins' and 'Kachins', who live in the valleys of the mountains of the middle and north Burma. They do not, however, follow the Buddhist religion, but worship the spirits of nature. Then come the 'Palaungs' and 'Was' who inhabit the North Eastern Frontier, who have hardly left their abode and come out. We know very little of them, but all that we have gathered is that they resent the intrusion of strangers and waylay them whenever the opportunity presents itself. In some parts they are still head-hunters. Their women-folk have one peculiarity—they wear brass-rings tightly encircling their necks and keeping their heads erect. Of other hill-tribes the best known are the Karens; they occupy the valley of the Karenni Hills and are a timid and silent people.

We can, therefore, see that Burma has people in every stage of civilization, from primitive, savage head-hunters and folks who are still in the Stone-Age, to highly educated and cultured men and women.

As soon as we stream up the Rangoon River past the tall pointed Pagoda on a hill rising from the North-West, we would pass ships of numerous sea-faring nations of the world. As we come to the bombed-out

Rangoon water-front, we would see the gilded spire of the Shwe Dagon Pagoda, the wonder of Burma and a sacred place of worship to all Buddhists, for in it lies eight hairs from the head of Gautama Buddha.

Rangoon which was only a village some seventy years ago is now a great modern seaport; with its bombed wharves fronting the strand for many miles along the river. Teak-yards, rice-mills and oil-refineries tell us plainly whence the wealth to which Rangoon owes its growth and prosperity comes; for teak, rice, and petroleum with its tin and tungsten, lead and rubies are its chief products. Down the streams come the great teak rafts, the laden rice-boats and the little steamers with all kinds of produce to the port. Directly we enter the city we can look at the Shwe Dagon Pagoda which sits on its hills like a great bell, on the other side of the Royal Lakes. Only some two thousand years ago, there was a simple village shrine on this hill; it was in the 16th century that the great and glorious Pagoda was built. Its dome is heavily gilded with the gold leaves brought by pious Buddhist monks. Its top is like most other temples,—with an umbrella-like structure. Around the base of this Pagoda are numerous other shrines outside which is a kind of paved courtyard, shut in by halls and canopies, screens and arches, altars and shrines, and adorned with many images of Buddha. I do not remember the exact number of steps leading up to the image of Buddha, but I think it was somewhere in the vicinity of 400. The eastern slope of this Pagoda is the centre of Burma's political activity, for mass gatherings are addressed here.

The Burmese seem much shorter than us (the people of India), some, especially the women almost doll-like in their coloured silks. They are an idle race,—the men spending their time gossiping at home, and the women-folk doing whatever work must be done. These people live in villages which are a collection of little brown houses perched on stilts to avoid the damp. The space below is generally used as a store-house or a hen-coop, or perhaps as a rubbish heap. All around the village stretch the paddy-fields and around them are the ugly water buffaloes. These dangerous animals work all day in the ploughing season, also they are dangerous to strangers though they answer to the lightest word of the village boys. A village home has very little furniture; a mat, a pillow for each person; a few food vessels of earthenware or lacquer work, one or two round tables, a few inches in height, around which the family members squat for their meals and tea, some water-pots, and of course the family betel box, and cheroot (cigar) case, for everyone chews betels and smokes cheroots.

Other towns of repute are Mandalay, the capital of the ancient Burmese King Thebau. with its palace, the Dufferin Fort with its large moat all around, the 450 white Pagodas encircling the gilded one in the centre, and lastly the Arakanese temple with its large brass image of Buddha. Then

in the Shan States is the hill station of Maymyo, the official summer residence of His Excellency, the Governor of Burma. The waterfalls here are splendid as also are the hills.

A Study of the Naga Hills

[PREPARED FOR THE ASSAM STUDENTS' CULTURAL SOCIETY, PRESIDENCY COLLEGE, CALCUTTA]

CHALLIE IRALU—*Fourth Year* (1945-46), *Science*

YOU have heard much about this tract of land, lying between India and Burma, during the last few years. Yet it is quite possible you did not have the opportunity to get a first-hand knowledge about the country as well as its people, on account of these aspects being left out by the newspapers which were mainly interested on reports of military operations. But we feel that a better knowledge of these in relation to our Free India's defence in the near future is very desirable.

This is the only region in India which was directly invaded, and which bears the scars of a major battle fought on Indian soil, in the last Great World War II, with the then victorious Nipponese Army; this is the region where also the Indian National Army came to liberate India. This goes to prove how important this tract of land may mean to India again, strategically. Several months ago there was an agitation in Assam protesting against the formation of an Eastern Frontier Province to be retained under the British Government, even after Swaraj is granted to the rest of India. Evidently, our leaders saw plainly that independence of India will be a farce, if not a mockery, with both the eastern and western frontiers in alien hands, and the navy a long way to standard. It would be like granting a country self-government with complete right to self-determination, after disarming her first. The result will be obvious,—remote control, shaping things after the designs of the benefactor.

The Naga Hills lie on this side of the Indo-Burma Frontier formed by the natural wall—the Patkai Range. This range starts from the easternmost point of the Himalayas and runs towards the Bay of Bengal, linking up with the many nearly parallel "Yomas" of the Burma mountain system. This natural barrier of high land, so effective in the past, to guard off the entry of ambitious neighbours into India, may at first seem to have lost its utility as a barrier now in this age of Science. But we have recently learnt that this is not necessarily so. It is still of great value as a frontier

and a line of demarcation. Whoever possesses it possesses the command of the frontier. To support this statement, we have only to think of what would have happened to India in 1942-44 had this territory been under Burma: the Japanese would have come right up to the railway lines of Assam, and immediately that portion of the country would have been given up for lost. We daresay that the conquest of India after that would have been child's play.

It is on these grounds that an intimate knowledge of this region and of its people will be of great consequence to those who later in life enter responsible jobs for the defence and welfare of our motherland Bharat. These border Indians, the Nagas, consist of about a dozen or so different sub-tribes each speaking its tribal tongue, distinct from others. The major tribes are: Angamis, Semas, Aos, Lothas, Nziemas, Sangtams, Tangkhuls, etc. There is the greatest variety of costumes ranging from the heavily clad Mao around the high altitude belt to the almost naked Semas at lower levels. The kind of work a person does determines his or her dress. But usually the men wear a thick "chaddar" made at home from the cotton grown in the fields. It is a very durable material and variously coloured. Hand-looms are not used, the women weave it with primitive methods. Yet one can proudly say here is real *khadi* from real *deshi charkha* for the real children of the soil.

The women dress something like this. A long skirt worn like the Burmese ladies forms the lower garment. The body is covered with a black cloth tied at the neck and going beyond the waist and below the lungi just described. When not at work, they put on the shawl or chaddar just like their men-folks do.

All the Nagas have a weakness for ornaments, both men and women. The men go after beads for the neck, armlets for the arms, usually wear ear-rings and love to give a border of sea-shell to their skirts which reach down to the knees. The women-folk fall under the spell of crystals, brass, gold and silver ear-rings; faceted, round, oval or any beautifully made beads to adorn their necks. Otherwise, their tastes are simple and unsophisticated.

The Nagas are casteless and classless, the clan system being enough. All the different tribes can and do intermarry. Communal problems are negligible, there being only two religions. They are: the old native religion, a form of Animism but not a shade of Islamism or Hinduism, as badly informed people have claimed with various aims behind, at various times; the other is Christianity which claims about half a lac of followers, i.e., about a third of Assam's Christians are to be found here.

Festivals are frequent and during these times the people really enjoy themselves with music, dance, meat, wine and all the good wishes exchanged

with friends and relatives. The chief beverages are the country-made beer called "Zu" and tea. The former is prepared by fermenting rice, or millet—an interesting native chemistry; and the latter brought from the tea gardens of Assam about which you all know well.

A study of the Naga people is not complete without making some comment on the much-talked-about head-hunting, and the hush-hush whisper about cannibalism by the foreigners who visit them. Of these, the latter is completely false and the writer does not know of its existence.

To the present generation head-hunting is a forgotten art and is referred to, only when folk-tales are being related, or stories of exploits performed by their grandfathers, nay fathers. We can say fathers, because it is only 80 years since this area was brought under the Government of Assam. Eighty years ago their fathers thought it was noble, exhilarating, and manly to pursue this pastime. Removal of heads from their torsoes have got two possible significances. By removal of the head from its owner, the spirit of the unfortunate one is supposed to be unable to come back and haunt the warrior in his sleep. Some say the removal is necessary as the head is presented before the village chiefs for a testimony. In either case, the trophy is given its due ceremony and the hero gets his title. The practice of head-hunting must have been just the result of tribal feuds which existed eternally then, as they still do across the border now.

Well, a new era has come into existence, and a new generation has grown up. Their demand for education and for good roads for communications are persistent and these are the prime requisites for an enlightened nd firm border of India. They did their bit for India well in the last war nd they can effectively guard the border in future if you give them your ympathy and co-operation with real understanding.

Stray Thoughts on Religion and Mankind

MANOJKUMAR BARUA—*Fourth Year, Arts*

I

WHAT is religion?

Martineau defines religion as " the belief in an everliving God, rulin the Universe and holding moral relations with mankind". But there is n God in Buddhism or Jainism. Should we, then, exclude these two philo sophies from the domain of religious concsiousness? Let us discuss an examine the problems in detail and inquire whether God is at all necessar for religion.

II

Xenophanes observed that the origin of religion is in man's frailty. "It is men who have created the gods, for in these latter they find again their own shape, their feelings, their speech; the Negro thinks of them as being flat and black-nosed; the Thracian as fair and blue-eyed. If oxen knew how to depict they would give to their gods the form of oxen."

III

The origin of religion and of the idea of an all-powerful all-comprehensive, omnipotent and omniscient God, is in fear. As man is imperfect he has many shortcomings. But man, by the proper exercise of his intellectual powers, could go far to remove these imperfections. The Poet Tennyson in this same vein sings,

"Self-reverence, self-knowledge and self-reliance
These three alone lead man to sovereign power".

If man could realize his potentiality, he would declare in great ecstasy, as some have done, "I am the monarch of all I survey; I have none to fear".

Similarly we find in Dhammapada,

"Attā hi attano nātho, ko hi nātho paro siyā |".
attan'eva sudantena nāthaṃ abhati dullabhaṃ||".

[Self is the Lord of self; what higher Lord could there be? When a man subdues well his self he will have found a Lord very difficult to find.]

IV

Man generally believes in or prays to God (I am not considering the cases of a few really devout and sincere religious-minded men who believe in and pray to God not for any material gain but for the realization of their own self and to elevate the mind to a sublime consciousness) not because sincerely he feels it necessary, nor spontaneously, but only for the sake of his own material gain or to bring about the downfall of his rival.

V

An eminent writer in the true philosophic spirit observed, "There are prophets each prophesying his religion to be true and all others false; but how does he know he is right and all others false?" The question for ever remains unanswered. We have seen enough of bloodshed in the name of religion, in the name of the superiority of one's God over the others. It is said, religion is for the good of mankind, for the elevation and sublimation of the human soul to a blissful consciousness, and lastly for the salvation of mankind from the sorrows and sufferings of life. But we have seen

Crusades termed holy, we have seen sanguinary battles to subjugate the weaker by the stronger. All these are perpetrated in the name of religion. Moreover, often we find religion standing as a great barrier against the rapid progress of science and society. Jesus was crucified, Spinoza was excommunicated, Socrates and Galileo had to suffer the same lot—all in the name of and also for the sacred cause of religion. If we consult the history of the world, we will find thousands of instances where religion is found to play a reactionary role against the rapid progress of science and culture—being not only indifferent but also actively hostile.

VI

Man is by nature a peace-loving rational animal. He wants peace—peace of mind and peace of soul. He has got enough of religion. If religion is at all necessary for man, then ethics must form its basis, not God or belief in God. We must first realize that if one is really sinful, no power on earth or heaven can make him sinless, simply by praying to it or offering homage to it. On the contrary if one is upright, honest and sincere, no power on earth can make him unhappy or dare to send him to hell on the day of final judgment.

VII

Ethics should take the place of the Holy Bible, the Koran, the Tripitakas, etc. In Christianity there are the Ten Commandments. In Buddhism there are eight moral precepts. Similarly in other great religions also. We should first dispense with religion and try to amalgamate, systematize and universalize these ethical codes, if at all we believe that equality, fraternity and liberty should reign in the world.

We need ethical consciousness as our guide and torch of life, not religion. In fine, I appeal and pray, not to unknown, mysterious God but to my fellowmen. Let there be peace and progress on earth; may all living beings be happy!

A Glimpse into Statistics

INDRAMOHAN CHAKRAVARTI—*Fourth Year, Science*

TO most of us in this College the sound of the word 'Statistics' conjures up the dim dingy ground floor of the Baker Laboratory—some people strumming computators or poring over squared papers full of tables of numbers, or a batch of students with flat files under their arms. I crave your permission to put before you the experience of my one year's desultory and interrupted study of the subject.

Statistics as an independent science is of recent origin. It comes from the Latin word '*Status*' which means *State*. In ancient Europe, Statistics meant information regarding the state, collected by government for administrative purposes. But that concept has suffered a seachange in later years, so much so that it is hard to link it up with its present-day meaning.

We first come across the seeds of Statistics in the works of Laplace and Gauss's 'Normal Law of Errors'. Since then many scientists, great and small, have carried on research on this line and the valuable results of their research have widened its scope and added to its importance. Works, valuable and scattered, there had been; but they required the genius and labour of a Karl Pearson to build them up into one whole, placed on a solid basis, and set it before the world as a science having an independent existence.

Statistics.deals with numerical data obtained from "natural phenomena" whether they are human or not. The 18th and 19th centuries witnessed a series of triumphs of the so called exact sciences like Physics, Chemistry and Mathematics. In these sciences experiments were planned treating experimental materials as homogeneous units. As such every experiment was expected to yield, at least theoretically, the same result. But in the last quarter of the 19th century, side by side with those exact sciences, grew up the theory of probability (originally in connection with games of chance, gambling etc.) which conceded that results might differ in different trials even under same circumstances. This gave rise to the concept of aggregates which found application even in the so-called sciences —Physics and Chemistry—where laws were no longer exact but only statistcal. The object of study was the property of the aggregates rather than the individual as in the Kimtic Theory of Gases, Quantum Theory and the like.

But Statistics found a ready application in the social sciences like Biology, Agriculture and Psychology on account of the heterogeneity of the materials with which these sciences deal. These experimental materials on account of their lack of homogeneity have so long successfully withstood all attempts at mathematical approach. Pioneering attempts of Galton followed by the monumental labour of Karl Pearson saw the young science safe through the maze of difficulties and the solid foundations of modern analytic statistics were truly laid.

Now about the subject itself, it may be defined as collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data.

The first Stage in Statistics is collection of data. Numerical data may be obtained from published and unpublished reports such as Government Agencies, Trade Associations, Research Bureaus, Magazines, Newspapers, individual research, etc. Investigators with scheduled forms may be sent

out to collect data from desired persons in possession of the information required.

When the data has been collected it is always the look-out of a statistician to present it in a form which tells something of itself and whose broad significance may be grasped without any visible effort. If the original schedules of the investigator—say the daily allowances which you get from your parents for your tiffin—be presented to you as they are, the numbers will only make your head dizzy and you will be able to make neither head nor tail out of those abominable numbers. If instead, they are presented in a tabular form (say, in a frequency table to use a technical term), you will at once see what is the maximum amount of allowance a student gets, what is the amount which majority of students get and the like. This is what is called presentation of data.

In the analysis of data statisticians calculate various mathematical measures like averages, dispersion, etc. We have got, for instance, weekly wages of wage-earners of a factory. A statistician's endeavour will be to find the average amount of wages and what are the values which are in excess and in defect of this average value—are these values sufficiently close to the average value or very much dispersed. Sometimes it is found that two sets of statistical data, rainfall and production of rice, for instance, show a definite relation so the statistician sets himself to finding out the degree of association between them.

The most difficult and at the same time the most important part of a statistician's job is to interpret data—what are the conclusions growing out of the analysis, what do the figures tell us.

Individuals, whether human or not, possessing a particular characteristic form what is technically called a 'population' or a "universe". A group of individuals taken from this 'population' under certain conditions is called a 'sample' of this 'population'. Population may be theoretical or observed. The results of a coin tossed, for instance, will form an observed population and the 'expected' number of heads or tails will form a theoretical population. There are several theoretical populations due to Karl Pearson and Gram Charlier characterized by distinct mathematical functions. The observed data at hand are regarded as a sample from any of these populations and the statistician determines the particular population from which the observed data have come. Knowing the population, he can make important predictions.

An example perhaps will be illuminating. Suppose Dr. Rajendra Prasad, Minister-in-charge of Food and Agriculture, in his anxiety to increase the productivity of our soil, wants to import manures from foreign countries. He therefore asks the Indian Statistical Institute to tell him what manures are to be imported. Statistical Institute, therefore, designs

suitable experiment. As it is impossible to deal with every possible specimen of soil in India, the Institute divides the whole of the country into homogeneous zones. In each of these zones areas are chosen at random (choosing at random means selecting in such a way that the unit areas in the particular zone are given equal chance of being included in the sample). The results of experiments carried on these areas which are truly representative of all varieties of soil in India after proper statistical treatment enable the statisticians to inform Dr. Prasad of the requisites of Indian soil.

In Statistics, as in every other science, an advance of knowledge, *e.g.*, forecasting in Statistics and 'Determinism' in Nuclear Physics, is based upon Inductive and Deductive methods. A hypothesis is conceived—natural results from it by deductive arguments are applied to observed data. If our conclusions drawn from the hypothesis hold in the case of the observed data, the hypothesis is "not rejected".

Let us take the height distributions of the Bengali as our 'population'. If we can express this population in mathematical language, we can by deductive arguments guess the properties which may be found even in the samples of that population within certain clearly defined limits.

The other aspect is based on inductive methods. A sample is drawn from a population, following a particular procedure which gives every member of the population of being included in the sample. Such a sample is called a 'random sample'. Studying the sample we infer the characteristics of the population. Inferences are all expressed in probability language together with the error which we are liable to commit in accepting the inference about the population as true. For example, in the previous example of height distribution of Bengalis, if different samples are drawn at random, we can by studying a particular measure say the mean of each sample and predict what will be the mean height of Bengalis in general. This is arguing from sample to population. This is, to say the least, no mean achievement. On the contrary it has placed at the hands of scientific works of all descriptions a most powerful tool.

Let us suppose that a cotton mill turning out '*dhoties*' of fixed widths requires the information what proportions of the total outturn will suit the people of Bengal. The Indian Statistical Institute is entrusted with the job. So the Institute takes a random sample from the people of Bengal and obtains measurement of each individual of the sample, from waist to heel. Now the statistician's endeavour will be to assign this sample of readings to a theoretical population. Knowing the form of the population, he can easily make necessary calculations and accordingly furnish the mill with the necessary information.

Statistics as a branch of science is still in the making. In advanced countries like the U.S.A., the U.S.S.R. and England, statistical methods are being used with advantage in every sphere of life. In India, we have also

got a school of eminent statisticians who have made valuable contributions to the development of the science. Though it has not found as yet a wide range of application in business, industry, agriculture and biological experiments in our country, there are reasons to believe that our countrymen are growing increasingly conscious of its utility and scope of application. It is a good augury which promises a bright future for the young free state of India.

A Letter From U. S. A.

Mrs. Pearl Buck wrote a series of articles in The Amrita Bazar Patrika about her country and its people. The object of those articles was to familiarize the Indian people with everyday life in America. She invited her readers to ask questions and the following letter was received by the Editor. In reply to questions put by him to her. It is hoped our readers will find the letter quite interesting as it contains information regarding many common things in America of which we know very little.—EDITOR.

4505 North Whipple Street,
Chicago 25, Illinois, U.S.A.
October 14, 1946

MR. SUDHINDRANATH GUPTA,
130, Keshab Chandra Sen Street,
Calcutta, India

DEAR MR. GUPTA,

MRS. Pearl Buck received so much mail in response to her magazine article that she has asked some of her friends to help her answer them, myself among them. I am going to try to reply to the questions which you ask in your letter of February 18th, which was apparently forwarded about for some time before it reached me. When it did I had to put it aside, I am sorry to say, until the press of business and many engagements allowed me this moment to answer. I hope you will understand and forgive me for the long delay.

First of all, though your questions concern every-day life in America, you know, I'm sure, how deceptively simple and elusive of complete answer they are. Your fable about the frogs confirms this; and, as the fable relates: " Poor, simple, plain—these are relative terms best understood in comparison ", I am going to try to tell you about the lives of the poor in America, so that you may at least in a small measure make comparisons with the lives of the poor in India.

No, the poorest of us do not die of starvation. We sometimes die of an illness brought about by a diet which is perhaps filling but completely

lacking in body-building and sustaining quality. There are negroes and whites in our Southern states who must subsist on a daily fare so unvarying and so unhealthful that they are gradually debilitated and the bodies and powers of intelligence of the children they bear are weak and failing. These people often die of a *kind* of starvation, more slowly if less painfully, than if starved entirely.

There are people of low-income group in the United States who while they do not live in the streets, are forced to live in five or six floor tenement houses, in incredibly crowded and unsanitary conditions, where disease becomes rampant and where only ineffectual help is offered. Our shame I believe to be considerably greater than India's, for Americans have the means at hand to correct these ills.

I would like to tell you here how the majority of Americans live but there are so many vividly clear pictures of America's middle-class readily available, that I am going to refer you to a book called "Middletown" by Robert S. Lynd, or perhaps to "Babbitt" by Sinclair Lewis. These books are not new but will give you a very representative idea of the life of the average American.

You wanted to know what the initials C. I. O. stand for:—these are the initials of the Congress of Industrial Organizations, a central body composed of various industrial trade unions, with a total membership of six million. To this Congress belong unions organized along industrial as well as craft lines. It was first formed in 1935 when several unions belonging to the American Federation of Labor (A. F. of L.) became dissatisfied with its policies and broke away to begin their own parent union. Among these were the miners' union, the garment workers' union and later the automobile and steel workers' unions. The C. I. O. now competes for leadership with the older organization. It is estimated that the combined membership of both central bodies has reached fourteen million.

The letters, G. I., stand for Government Issue. They came to have their present meaning when civilians entering army service were given lists of the clothing they would need. Most of the items were stamped "Government Issue", meaning that they were furnished or would be furnished by the United States Government. The new recruit continued to discover this marking on the boxes containing his food, his reading material, all his equipment, and ultimately he applied the term to himself and his fellows.

I do not know who Swami Vivekananda is nor anything about the difficulties he encountered entering this country, but I can tell you that were an ordinary Indian to come to this country and ask for help, he would certainly receive some measure of assistance. There are immigrant and traveler aid societies which would supply him with food and shelter,

possibly secure an interpreter for him if necessary, and put him in contact with relatives or friends if he so wished.

I wish we did know more about India. Our country for over two decades after World War I, buried its head in the sands of isolation, thinking to avoid difficulties by avoiding dealings with the other nations of the world in so far as possible. We have perhaps been taught a lesson by World War II for we are presently, all of us, I think, curious and anxious to learn something of the myriad peoples of the earth. I hope we continue so. And we know much about the United Kingdom, mostly, I surmise, because we speak the same language and found each other's lands easily accessible. I feel sure you know a great many of the other reasons.

You inquire about the differences between great metropolitan papers and small local newspapers. Great metropolitan papers are those of large circulation published and distribted in such cities as New York, Chicago and San Francisco. You may have seen copies of the New York Times or the San Francisco Chronicle. Small local papers are those of perhaps 2 to 15 pages published and distributed in small towns and carrying news of interest chiefly to the inhabitants of such towns, although world and national affairs receive much attention. A good many small town dwellers do habitually subscribe to the metropolitan papers, as well as to the local. Metropolitan papers carry a much greater variety of news, cover world as well as national and city news, naturally to a far greater extent than the limited budget and circulation of a small town newspaper permit.

I can assure you that a good number of newspapers and magazines told the story of Mr. Subhas Chandra Bose and the Indian National Army, many of them in a fair and sympathetic manner; and I have read with sorrow of the firing upon of students in November, 1945 and since. I wish that Indian newspapers had a share of the freedom of expression that American newspapers have—and I wish that the American papers had still more, placed in hands which prize truth.

I know Mrs. Buck would want me to thank you for your thoughtful and enjoyable letter, and I hope this reply has given you the information you wanted.

Yours sincerely,
ESTHER JOSEPH

Kuruvila Zachariah[1]

DR. NARENDRA KRISHNA SINHA

Department of History, Calcutta University

ABOUT a quarter of a century ago I first saw Mr. Zachariah. He was then Head of the Department of History in the Presidency College. As one of his pupils in his History honours classes I naturally became closely acquainted with him. From that time until his sudden departure from Bengal in December, 1946, I was never out of touch with him. I saw him quite frequently and corresponded with him on many occasions. During the last few years I collaborated with him in the work of advising the Government of Bengal on historical records. This was, however, the only official link between us during these years.

Kuruvila Zachariah is remembered in Madras by most University men for his brilliant academic career. He was born in 1890. He passed the Matriculation Examination of the Madras University in 1906 standing first in order of merit. In the F. A. Examination of the Madras University he was second in order of merit. In the B. A. Honours Examination three years after he was first in the first class in History and first in the first class in English. As a Government of India Scholar he read in Merton College, Oxford, during the years 1912-15 and got a first in Modern History in August, 1915.

An extract from a testimonial given him by that distinguished Oxford historian, Prof. A. H. Johnson, his teacher at Merton College, would best illustrate the impression he created at Oxford:—"Not only was he placed in the first class.........the examiners considered that he was the best candidate who presentd himself for examination.........the senior examiner described his work as sound, well-balanced and thoughtful....... He is a man of strong Christian principles which he carries into his life. He is, I understand, a Nestorian, one of the earliest Christian sects in the East. But there is no

1. We are grateful to Dr. Narendrakrishna Sinha (ex-alumnus) for this account of his old teacher, Mr. Kuruvila Zachariah, M.A. (Oxon.), I.E.S. (Retd.). Present-day students of Presidency College may welcome this opportunity of learning about a former professor of the College—one of those of whom the College will ever be proud. To those who read History in Presidency College between 1916 and 1930, Mr. Zachariah's culture and scholarship, his charming manners, and the beautiful English he spoke and wrote must still be memories to cherish. It was a real pleasure for them to learn last year that Mr. Zachariah had been appointed a member of the Federal Public Service Commission.

narrowness about him. This testimonial may appear flattering but I give it with confidence. He is one of the best students I have had under me during my career as a tutor for the last forty-five years." Mr. Zachariah was appointed to the Indian Educational Service when Indians had to face the full competition of Englishmen. The remarkable tribute of Arthur Johnson made the task of the selectors rather easy.

Mr. Zachariah came to Bengal in 1916 and he taught in the Presidency College and later also in the Post-graduate Department of the Calcutta University till 1930. But he was not fit for our factory methods of instruction. His general lectures were above the heads of ordinary students. He was at his best, as he himself frequently said, in the honours classes of the Presidency College. He was not a skilful popularizer, not a glib professor, nor a specialist and lonely scholar. He never attempted to transform his students into fountains of information. He tried to increase their equipment for seeking knowledge. He was never tired of teaching us the dangers of eloquence. In our tutorial classes he always ridiculed rhetoric and frequently reminded us that recollection should not take the place of thinking. He had the command of ironic phrase when he chose to use it but he chose only when he must. He did not withdraw into the lazy recesses of a sheltered occupation, serving at the minimum level like some other members of the Indian Educational Service. The student learnt from his association with his teacher that the intellectual conscience is not far removed from the moral. The atmosphere in government service—elaborate rules and regulations, frequent transfers, promotions that lead to changes in the nature of work—weakens the influence of personality on a single institution. Mr. Zachariah's departure from Bengal cannot create a sense of void in the mind of the present students of the Presidency College, because he had no share in shaping their intellectual life.

We read occasionally in those days in the Presidency College Magazine very excellent articles written by him with only his initial "K" at the end to indicate authorship. I wondered before my close acquaintance with him why any one who had such an easy flow of thought and such a cultured English style should be so eager to be inconspicuous. This feeling was very natural because I had and even now have the greatest difficulty in working in this reluctant medium. I later understood that this modesty was a part of his mental make-up.

Mr. Zachariah became Principal of the Hooghly College in 1930. His stay at Chinsura deserves to be remembered for his work in connection with the centenary celebration of that College. His history of the Hooghly College published in the centenary year should be read by all students of the history of education and by all research-workers in the field of modern Indian History. The book gives much more than the title suggests. It shows the affectionate and exquisite diligence of a scholar who combine

Mr. Kuruvila Zachariah

On their way to the market-place

—Photo : SATYENDRAKUMAR DE
Sixth year, Geology

Nature Study

the closest attention to minutiae with large ideas. I have not studied fully the works of Maitland or Vinogradoff. But I have some knowledge of Indian historical records. I do not know anybody who has utilized them with better historical sense and with greater capacity to interpret them. I would do well to give some extracts from his book as specimens. Referring to the educational records of the period from 1835 to 1850 when the control of education was not in the hands of professional administrators or professional politicians, he writes: "The General Committee and Council of Education let few Principals leave without placing on record a generous appreciation of their work. After 1854 the teacher is regarded as a hired mercenary without human feelings and official commendation is rarely, if ever, forthcoming. Not Principals alone but teachers and even students won praise from the Council when they deserved it. Even at this day one cannot read without emotion such speeches as those delivered by the President J. E. D. Bethune at the Krishnagar and Dacca College prize distributions in February and March, 1851....... Such a speech was never made and never could have been made after 1854. The flowers of human charity and generous praise wither in the arid clime of departmental administration." About the records of the education department between 1887 and 1906 Mr. Zachariah writes, "Materials are more abundant but there are singularly little of any individual interest....... The college is one of a number of government institutions and clothed in this prison garb all that is distinctive in its physiognomy is gradually effaced."

I do not know much about Mr. Zachariah's work as Principal of the Islamia College. On one occasion after my return from a fortnight's stay at Madras I went to see him at Islamia College. I told him that during my stay at Madras I had gone one day to Tamboram to see his old college, the Madras Christian College, in its ideal suburban surroundings. He was very glad, his eyes sparkled, and he said with enthusiasm that he hoped Islamia College would be exactly like that in future. I do not know how decisions are made in the Secretariat, but I do know that Mr. Zachariah drew up an excellent plan for the development of Islamia College into a residential institution—a plan which educational authorities might still study with advantage with regard to the development of colleges in India.

About Mr. Zachariah's work as Director of Public Instruction and later as Special Officer, Post-War Educational Planning, I do not presume to know anything. I know only of his disinterested aims, his exceptional ability, his brilliant ideas, and I feel that with his retirement this unfortunate province has lost the services of an experienced educationist of exceptional endowments.

As I think of Mr. Zachariah, this distinguished product of Madras and Oxford who served Bengal for thirty years with devotion though at times with a sense of frustration, I feel the truth of a remark made by one of the

greatest administrators in history: " The most difficult art is not to choose men but to give to the men whom one has chosen all the value that it is possible for a man to have ".

Book Review

(I)

INDIA'S STRUGGLE FOR FREEDOM—By Major-General A. C. CHATTERJE

Published by Chuckervertty, Chatterjee & Co., Ltd., Calcutta. Price Rs. 8/8/-

Undoubtedly the most glorious chapter in the history of British India is the fight for freedom associated with the name of Netaji Subhas Chandra Bose and the Azad Hind Fauz. If greatness depends on purity of motive, magnitude of self-sacrificing effort and the loftiest reaches of idealism in conduct, then the work of Netaji stands in the highest rank among heroic achievements in the annals of the world. Mere outward success and failure are no correct measure of the real greatness of an event, which rests primarily on the quality of the inner urge and inspiration. Netaji apparently failed in what he sought to achieve; but such failures are far richer in spiritual contents, and contain greater promise for the future than a victory based on brute force and for the furtherance of an ignoble spirit of domination. Moreover Netaji did not fail; we are what we are to-day because of him. 15th August, 1947 points the way straight back to the date when Netaji assumed leadership of the I. N. A.

The thrilling account of the campaign for liberation. is now made available to us in the book " India's Struggle for Freedom " written by Major-General A. C. Chatterjee, a colleague and co-worker of Netaji and a major actor in the eventful drama unfolded to us in its pages. Major-General Chatterjee's book is very fascinating study, marshalling a vast array of facts and details in an eminently lucid and presentable form. The result is a narrative of absorbing interest, which we follow with rapt attention from start to finish, with never a dull moment or a gap of monotony. We watch the fluctuating fortunes of India's army of liberation from the first inception of the movement to its splendid climax, followed by a gradual set-back and decline in which the heroic temper, the unflagging resolve never gives way, as we do the rapidly unfolding action of a drama which passes from triumph to defeat without any impairing of the high, heroic spirit. We follow fascinated the splendid response of thousands of our countrymen to the call, their all-out sacrifice, their ungrudging acceptance of privations, the flaming ardour of their patriotism, their uncontrollable impatience to come to grips with the enemy and prove their mettle, above all their exemplary sense of discipline and loyalty to their beloved chief and ask with wonder whether they are of the same stuff of which ourselves, with our petty squabbles and sordid pursuit of self-interest, are made. They reveal the true soul of India, grown conscious of itself after a long lapse of forgetfulness and striving to translate its age-long dreams into shining and resplendent action.

From the scrappy, disjointed and censored bits of news filtering down to us through newspaper reports, we had at the time but brief and broken glimpses of

the epic fight that raged in the Imphal-Manipur area in those hectic mid-summer weeks when India waited in tense suspense for the first break-through of an invading army. We had our suspicions even then that it was no foreign army that was knocking at our doors with such persistent, resounding blows, though our masters made every effort to make us believe that it was the hateful Japanese that was on the other side of the frontier. The grim tenacity of the fight, the consummate strategy, the lightning rapidity of progress, the incisive vigour of the thrusts, the variety and resourcefulness of the harassing tactics—all these pointed to a master brain at work and a motive that lay much deeper than the pursuit of a temporary tactical advantage. What we guessed afar off we now know for a certainty. We now know the story in all its heroic proportions,—its boldness of conception and vigour of execution, the feverish, all-sacrificing intensity of purpose that lay behind the drive and alas! the narrowness of the margin that thwarted its ultimate fruition. Independence through victory in the battle-field has been denied to us; and independence through negotiations has come instead. And we all feel the difference!

There is one figure that emerges from the book with the stature as of an Immortal—Netaji Subhas Chandra Bose. We realize how great he is, towering head and shoulders above his contemporaries, great beyond the adulation of admirers and the detraction of enemies, great even beyond the reach of exaggeration. Ever since the days of Shivaji and Rajsinha, India has not had the chance of witnessing heroism in action. We have had heroism in plenty, but it is heroism diluted in thought, muzzled and furtive, denied the outlet of sustained effort, making itself heard in muffled, under-ground mumbles. Subhas Chandra belongs to the direct line of heroic succession. He has had his part in the great movements of the world, rubbing shoulders with makers of history, obtaining a direct glimpse into that laboratory of Destiny where fates of countries and nations are forged and fashioned. He was not an idealistic dreamer, no mere exponent of a humanitarian or philanthropic programme which qualifies for leadership in this land of ours. A bloodless revolution, which we are so apt to idolize, is a revolution which has half achieved its purpose and is truncated in its results. It is the impact of war that is necessary to shake a nation out of its age-long slave-mentality. And in the long run and in retrospect it is not so bloodless after all—what we spare in the lump, we lose in driblets spread over a long stretch of years. Subhas Chandra did not haggle and compound over the necessary price of freedom: he offered the whole amount, subject to no rebates or reductions.

The stamp of greatness is writ large on everything he said and did. Credit for the first idea and the earliest efforts at organization in respect of the I. N. A. is certainly due to Rashbihari Bose, who must be hailed as the pioneer of the movement. But it was Subhas who lent life and soul to a languishing and disorganized effort. He raised the army from a state of atomic disintegration into a fighting machine of first-rate cohesiveness and efficiency. He roused civilian enthusiasm to an unprecedented height and brought about an all-out mobilization of effort in which thousands gave their all and pledged themselves to dedicated lives. Never before in Post-Mohammedan Indian history had such moral heights been reached and kept on a nation-wide scale. And all this was done by loving persuasion, by appeal to the best elements of human nature, unadulterated by the faintest tincture of force or coercion. All glory to a leader, who could evoke such loyalty and devotion to himself and the cause he serves! We talk glibly of miracles, but all apparent miracles are not really so, most of them betraying on close scrutiny a subtly disguised vein of calculated self-intrest. What Subhas Chandra achieved was the real, the authentic miracle.

The greatness of Subhas Chandra showed itself no less in the moral than in the sphere of military and administrative organization. He vindicated the honour of his country in his uncompromising stand against Japanese attempt at domination. He firmly put his foot down on all efforts on the part of Japan to play the role of the senior partner and to indulge in a patronizing pat on the back. All the arrangements he entered into, all negotiations he concluded evince an exquisite sensitiveness on the score of national honour, a jealous guarding against the slightest encroachment on the dignity and status of his country. No cajolery, no personal flattery, no bait of dictatorship in liberated India could make him swerve an inch from his path. Wooing Japanese support and dependent largely on Japanese bounty, he never sank into the position of a suppliant and never struck a dishonourable bargain. Major-General Chatterjee's pages reveal a personality of rare grace and charm that in its exquisite combination of tenderness and strength, love and fellow-feeling for the meanest of his soldiers and the magnetic spell cast upon colleagues, is hard to parallel among the great leaders of history.

The broadcast speeches of Netaji reveal still another aspect of his many-sided greatness. They are marvels of broad statesmanship and of persuasive pleading. The homage that he pays to Mahatma Gandhi and other leaders of the Indian Congress, and the readiness with which he recognizes their services and offers to place himself at their disposal provide instances of an almost superhuman humility and self-effacement and withal a spirit of noble requital. There is no trace of bitterness for his personal humiliation, not a hint of grievance, no harbouring of rancour, not even an attempt at showing himself in the right when the Congrss in the course of its negotiations came to grief. He hails Mahatmaji as the father of Indian nationalism and in accents of transparent sincerity urges upon him for a collaboration of efforts. The "Quit India" resolution of Mahatmaji awakens in him an enthusiastic appreciation bordering almost on idolatrous worship. He pleads passionately with the Congress for rejecting the Wavel negotiations and in words of prophetic insight warns it against future consequences. History records few examples of such transcendent generosity, and exalted patriotism in which self is utterly effaced before the good of the country. We are deeply grateful to Major-General Chatterjee for his full reproductions of these broadcast speeches, which in their tone and temper, their moral elevation and political insight, their fervent and stirring appeal and utter selflessness rank high among the great political utterances of the modern age.

Netaji vanishes from our sight, wrapped in impenetrable mystery, on which Major-General Chatterjee's book has not been able to shed any any new light. The last words that the book has to say about him is that he started on a plane to some unknown destination without having taken any of his most trusted lieutenants into his confidence as regards his intentions. This unsolved mystery regarding his final movements deepens the gloom round the tragedy of his disappearance. Millions of his countrymen have been left speculating about his fate and they cannot settle down either to fixed hope or downright despair. At any rate Netaji has passed out of the horizons of history and nobody knows if he is to emerge again. One fondly wishes that it were only given to him to know that his great fight and unequalled sacrifice have not been all in vain!

We must conclude with a tribute of appreciation to the writer of the book for giving us an authentic, connected history of India's last struggle for freedom, and particularly for drawing a picture of our beloved Netaji that more than fully satisfies the highest ideals of leadership. Major-General Chatterjee's personal contributions to the movement are by no means negligible. He filled some of the most responsible offices in the Provisional Government of Free India and gave ungrudg-

ingly of his best. One of the most pleasing features of the book is the utter want of any vein of egotism on the part of the writer. His references to himself and to his great leader are marked by an innate modesty, and a quiet, unostentatious account of the parts they were called upon to play; while in mentioning his colleagues he always speaks in terms of generous appreciation. We congratulate Major-General Chatterjee on his book, in which ease and limpidity of style and clearness of narration are the distinguishing features, and we hope that the ideal he has imbibed from his great leader will inspire him in his service to the country in a spirit of utter disinterestedness and devotion to duty.

SRIKUMAR BANERJEE

(II)

CREATURES OF CIRCUMSTANCE—By SOMERSET MAUGHAM. Published by Heinemann.

Mr. Somerset Maugham's latest collection of short stories shows the master at his usual level—the highest. His imagination has not flagged with age, nor has his hand lost any of its cunning. The sixteen stories in this volume rank with his best: they are, that is to say, on a par with his "Jane", or "The Human Element", or that terrible masterpiece "Rain". In the realm of the short story there can hardly be any higher achievement than that.

The greatest merit of Mr. Maugham's stories is that they are interesting apart from the narration. The incidents are varied and the dramatic element in them conspicuous: we must not forget that he was a very successful dramatist before he began to write short stories. Each plot is carefully constructed, the incidents being deftly woven together to form a compact whole with no loose ends. The author's experience of the world and his knowledge of men and things—including the strange and the out-of-the-way—are surprisingly wide and deep, lending to his stories the stamp of authenticity and the charm of variety. What a diverse and fascinating world do the stories in this single volume open up before us! The English countryside, the rubber-plantations of Malaya, the malaria-stricken wilds of Borneo, the boulevards of Paris, the slums of Seville and the gardens by the Guadalquivir, a tuberculosis sanatorium in Scotland, San Francisco and Florence, a German cargo-boat plying between Hamburg and Cartagena on the Columbian Coast, Algeciras, the war-torn French countryside—such are the varied backgrounds to these stories. And against these backgrounds we see enacted the drama of the lives of a strange variety of men and women. The retired English Colonel, bewildered by the revelation of the highest poetic talents in his wife and of the unsuspected tragedy of her life; the strolling actress who had hoped to settle down to a quiet domesticity with her rubber-planter husband but who discovered, when it was too late, that there was no escape save through death from the hell of her life with a man whom she had grown to fear and hate with her whole soul; the French business magnate who cheerfully acquiesced in the marriage of his shop-girl mistress with the commercial traveller because he thought it would be much more fitting to his position that his mistress should be not just a little mannequin in a dressmaker's shop but a respectable married woman; the terrible woman in a Seville slum whose passionate love for her handsome son prompted the strange jealousy which led her to murder her son's lover; the inmates of a tuberculosis sanatorium in Scotland with their pathetic ambitions and bickerings and loves, with death waiting for them round the corner;

the sober matron of fifty happily married to a teacher in one of the smaller universities in America who, in her radiant youth, had played havoc with the lives of an Italian nobleman and his son in Florence: these are some of the characters that come to life in these pages so vividly that they seem to be persons we have actually met and known.

I have already said that the stories are all excellent, but of them two have impressed me most: "The Unconquered" for its extraordinary power in depicting a poignant tragedy, and "A Winter Cruise" for its humour, a quality which readers have usually missed in Maugham and which he has himself confessed he lacks. The first story is of a young French girl living on a farm a few miles from Soissons who has been ravished by a German soldier during the occupation and who, to her infinite shame and loathing, finds herself with child. The German—a good-looking and rather likeable youth, by the way—comes often from the town where he is stationed to the farm where Annette lives with her parents whom he has won over by presents of precious food; and though she remains coldly aloof and bitter in her hatred for him, he falls passionately in love with her when, in an unforgettable scene, she reveals her condition to him. He offers to marry her and, believing that the German occupation would continue for ever, promises to settle down in the farm with her family, and help in every way to make her happy. The parents are agreeable and try to reason with Annette, but she remains unconquered to the last, for when her child comes she kills it, lest she be conquered by attachment to it and, through it, to its father. A more moving story it is difficult to conceive, or one that more effectively refutes the oft-heard criticism of Maugham as a heartless cynic pitilesssly indifferent towards the characters he creates. The other story which I have selected for special mention—"A Winter Cruise"—is a delightfully humorous story, such as one would hardly expect from the pen of Maugham. It is the story of an English spinster of uncertain age who had gone out on a cruise in a German cargo-boat. She was a crashing bore, and would miss no opportunity to inflict her inane conversation on the captain, the doctor and the crew, till a point was reached when they felt they had come to the limit of human endurance. A conference was held to devise ways and means to prevent her from spoiling the Sylvester Abend—New Year's Eve—which is an occasion that means a great deal to a German and to which they had all been looking forward. The doctor suggested a plan: she should have a lover. "Her inordinate loquacity", he said, "that passion for information, the innumerable questions she asks, her prosiness, the way she goes on and on—it is all a sign of her clamouring virginity. A lover would bring her peace." After careful consideration the young and handsome radio-operator was selected to fill the role. His objections were ruled, he was primed with helpful advice and instructed to act naturally. The expected happened, Miss Reid became a different and a subdued person and, for the rest of the voyage all was quiet on board. But the reaction of Miss Reid's change on themselves was something that neither the captain nor the sagacious doctor had reckoned with. She was admittedly a good old soul, and it somehow made them feel highly uncomfortable to think that they had played a trick on her. This uneasy conscience pricked them into vying with each other to show her consideration in everything till she got down at Plymouth, happy, though a little perplexed. Miss Reid's conversation, the hatching of the plot to silence her, and the unexpected effect of her change on the conspirators—are all described with delicious humour.

It is the present reviewer's conviction that Somerset Maugham is one of the great short-story writers of the world. Experience, observation and imagination work together in him to produce the most fascinating patterns of events. His stories, as he has often said, have a beginning, a middle and an end. He does not believe in beginning just anywhere and with anything and trusting to luck or inspiration to see him through. In his youth he had carefully studied Maupassant and had learnt

therefore, the value of discipline in the selection and careful ordering of facts, and of precision and clarity in narrating them. He admires Chekov for his gifts, but he avoids the methods Chekov followed. Chekov, more often than not, had no story to tell. His anecdotes, stripped of their trimmings, are insignificant and sometimes inane; whereas Maugham by nature and nurture is, above all, a story-teller. His other great merit is his power to individualize his characters. He seems to be frightfully interested in them as persons. They are not, as in Chekov, strange, groping ectoplasms that melt into each other, but distinct, and very much alive.

The force and precision of his style have elicited admiration even in votaries of other gods. His prose is a model of clarity, vigour and grace, which it is exhilarating to read after the looseness and obscurity of many modern experiments in technique. The simplicity and directness of his narration proceed from his absorbing interest in his theme. He is not interested in experiments in technique. As he puts it himself: "The artist is absorbed by his technique when his theme is of no pressing interest to him. When he is obsessed by his topic he has not much time to think of the artfulness of his presentation."

It is difficult even for Mr. Maugham to add to his already great reputation as a story-teller, but "Creatures of Circumstance" will certainly not detract one whit from it.

Somnath Maitra

(III)

SARAT CHANDRA: MAN AND ARTIST—By S. C. Sen Gupta. Published by Saraswaty Library, College Street Market, Calcutta. Price Rs. 5/-.

The hours of study devoted to 'Sarat Chandra: Man and Artist' by Dr. S. C. Sen Gupta were spent both agreeably and profitably. A companion volume to the author's Bengali work on Saratchandra which appeared sometime ago and at once claimed attention, the present work makes delightful and stimulating reading, carrying its reader smoothly through its 127 pages, written in fascinating and felicitious English. As a distinguished student and Professor of English literature, as an Indian interpreter of George Bernard Shaw, and as a literary critic who is read and quoted extensively by our students of literature, Dr. Sen Gupta naturally rouses great expectations when he speaks—expectations which, to a large extent, have been fulfilled in the present neatly written monograph. Those who are widely and deeply read in Saratchandra and those whose ideas on Saratchandra are based more upon a conventional regard or disregard than upon a close first-hand acquaintance with all his works will be equally benefited by this work and roused to active and wholesome musings and searchings of value. The masterly analysis of Saratchandra's short stories and novels contained in the present volume has really been very helpful, refreshing and illuminating. One thing we feel, however, should be noted while recording our appreciation of Dr. Sen Gupta's work. That much of the life-history of Saratchandra which has been public knowledge by now has been utilized very cleverly in this work for the purpose of interpreting his literature, some of the well-known heroes and heroines of the novelist having been traced back to their originals in life. But an over-emphasis laid on Saratchandra's comparatively uneventful life

for the understanding of his literature and the interpretation of his philosophy of life, if he has any, is likely to be disappointing and misleading, sometimes. One more point. The foundations on which has been laid the greatness of Saratchandra as a humanist and literary artist are perhaps deeper than his powers and achievements as a clever analyst of forbidden feminine love, as the learned author of the present work is himself very well aware. With these few words we commend to the reading public this highly instructive and entertaining volume from the distinguished literary critic of our days.

JANARDAN CHAK

Miscellaneous

FAREWELL TO DR. SRIKUMAR BANERJEE

A LARGE and distinguished gathering of present and past members of Presidency College met in its Physics Theatre on January, 1947, to bid farewell to Dr. Srikumar Banerjee, till lately Head of the English Department of the College, and now Ramtanu Lahiri Professor of Bengali, Calcutta University. The feeling that Dr. Banerjee's departure marked the end of an epoch in the history of the College lent an unusual solemnity to the occasion. The proceedings started with 'Mangalacharanam' by Prof. Gaurinath Shastri and a song by girl students of the College. The Hon'ble Mr. Justice Phanibhusan Chakravarti, an old pupil of Dr. Banerjee, presided. High tributes to Dr. Banerjee's scholarship, his critical acumen, his literary contributions, his inspiring teaching of English poetry and his many-sided accomplishments were paid by the President, Mr. W. C. Wordsworth, Mr. S. N. Guha Roy, I.C.S., Prof. P. K. Guha and Prof. Hirendranath Mukherji on behalf of ex-members of the College; by Dr. M. Q. Khuda and Prof. S. N. Maitra on behalf of the staff; and by Mr. Sudhindranath Gupta on behalf of present students of the College. Dr. Banerjee made a fitting reply in course of which he deprecated the growing tendency among students to judge studies purely by their utilitarian value and warmly supported the remark made by Mr. Wordsworth that English was no longer an alien tongue but one of the Indian vernaculars. A farewell address and a set of Bengali books were presented to Dr. Banerjee as a token of their esteem and regard by the staff and students of the College.

Again the Post-Graduate and Honours students of English of the College met Dr. Banerjee on February 15, 1947 to pay their homage to him on the occasion of his departure. The meeting was carried on in a homely atmosphere, only the studentes concerned and the professors of the English Department attending. An address, embroidered on silk, was presented to Dr. Banerjee. Two songs of Rabindranath befitting the spirit of the occasion were sung, and there were light refreshments. In course of his reply, which he made in Bengali, the venerable professor recountd the ideal relation amongst professors and students of this College in the old days and said that just as those professors inspired the students, the students were devoted to them. He advised the students not to dissipate their energies in frivolous pursuits and never to forget the principal avocation of their student-life. Dr. Banerjee ended by saying that he had learnt as much from the students of this College as the students said they had learnt from him and thus the relationship had been one of reciprocal gain. A photograph, taken after the meeting, appears elsewhere.

The copy of the two addresses is given below.

(I)

To

Professor SRIKUMAR BANERJEE, M.A., B.L., Ph.D.,

Until recently, Head of the Department of English,
Presidency College, Calcutta

At Present, Head of the Department of Bengali,
Calcutta University, Calcutta

Sir,

On the occasion of your departure from our College after a long and distinguished period of service, we offer you our sincere tribute of love and esteem.

Sir, your great reputation as a teacher and a scholar has reached to the ends of this Province and beyond. For long it has drawn to this College from distant pupils whose eager expectations have been more than fulfilled. In the years to come we shall remember with feelings of pride and pleasure that we were students of Presidency College when you were teaching here—a privilege which those who come after us will, alas, not enjoy. We shall recall the delight of listening to you as you revealed the riches of English poetry and imparted to us a perception of values in literature, and an appreciation of the beauty of words. Our hearts are heavy at the thought that you will teach us no more, and that a glory has departed from this College that will not soon return.

Sir, you have left this College only to assume higher responsibilities. The sadness of parting is somewhat lightened for us at the thought that all the powers of your mind, and your unflagging enthusiasm for work, will now be turned from the teaching of an alien tongue and a foreign literature to the great task of encouraging and directing the study of our own glorious language and literature in our noblest temple of learning.

As we regretfully bid you farewell, Sir, we pray for your long life, and continued health and pace of mind.

Calcutta,
January 11, 1947

Your grateful and admiring pupils
of
PRESIDENCY COLLEGE, CALCUTTA

(II)

To

Professor SRIKUMAR BANERJEE, M.A., B.L., Ph.D.,

On his retirement as Head of the Department of English,
Presidency College, Calcutta

Sir,

This is a sad day. We assemble here to bid you farewell. It is both our privilege and our misfortune. Privilege, bcause, as the last batch of students who

Row I (Seated, L. to R.) : B. N. Ghosh, N. M. Majumdar, Prof. S. K. Indra, Prof. S. N. Maitra, Dr. Srikumar Banerjee, Dr. S. C. Sengupta, Prof. T. P. Mukherji, Prof. T. N. Sen, A. Dutt, S. Gupta.

Row II (Standing, L. to R.) : R. N. Chakrabarti, A. Chatterji, S. K. Das, S. Das, D. Mustaphi, B. Bose, J. Bhattacharya, R. Sen, R. Chakrabarti, G. D. Mukherji, C. Poddar, S. K. Basuroy, B. N. Mandal, M. Sengupta.

Row III (Standing, L. to R.) : S. Sen, M. Chatterji, H. Hossian, K. Bose, R. Chaudhuri, B. Banerji, S. Bhattacharya.

Row IV (Standing, L. to R.) : G. P. Ghosh, N. S. Thapa, Mahabub-uddin, K. Poddar, C. Kaviraj, N. Shome, R. Roy.

Row I (Standing, L. to R.) : Dwarkanath Mitra, Tarit Baksi, Nipendra N. Sircar, Prafulla Dutt, Dakhmina Ranjan Ghosh, Jnan Saran Chakravarti.

Row II (Sitting, L. to R.) : Charu Dutt, Dwijendranath Gupta, C. C. Ghosh, P. C. Mitter, Surendranath Mookerjee.

Row III (Sitting on floor, L. to R.) : Bhupendranath Mitra, Brajen Bose, B. L. Mitra.

[*See the last page*

had the enviable opportunity of studying at your feet, we were not denied that unique experience. Misfortune, because it fell on us rather than those who should follow us to witness the snapping of an association of more than thirty years.

It never occurred to us that such a day would or might come. You have been with Presidency College for so long a time that we would never think of you as something apart from it. To us you always seemed an inseparable part of it, a necessary element in its cultural structure, a formative influence on its admirable tradition. To us you were always associated with that brilliant series of luminaries, with professors like Derozio, Richardson, Tawney, Mann, Percival, James, Manomohan Ghosh, Prafulla Chandra Ghosh and Rabindranarayan Ghosh—men who made Presidency College what it is. It is our pride that we knew intimately at least one of them; in fact, the last of the giants. It has been as we said, a unique experience, something we shall always be glad and grateful to look back to.

Sir, as we part from you, we remember, with shame, how unworthy we have been of you, and, with gratitude, the charity with which you treated our numerous failings.

We beg to remain,
Sir,
Ever yours indebtedly,
HONOURS & POST-GRADUATE STUDENTS
OF ENGLISH LITERATURE,
Presidency College

Presidency College,
February 15, 1947.
CALCUTTA

ACKNOWLEDGEMENT

We are grateful to Mr. Rabindrachandra Ghosh, Barrister-at-Law (alumnus 1915-19) for the gift of two pictures of great interest, prepared from two old photographs in his possession and mounted and framed at his own expense. Both the pictures have been hung up in the Arts Library Hall. One of them shows a group, a particularly brilliant one, of Presidency College alumni of the year 1894. The group includes the following:—Dwarkanath Mitra (afterwards Judge, Calcutta High Court); Taritkanti Baksi (afterwards Principal in the Indian Educational Service, College of Science, Nagpur); Nripendranath Sarkar (afterwards Knight, Advocate-General: Calcutta High Court, and Law Member with the Government of India); Prafullachndra Datta (afterwards Judge, Small Causes' Court, Calcutta); Dakshinaranjan Ghosh (afterwards, of the Bengal Civil Service); Jnansaran Chakravarti (afterwards Dewan Bahadur and Accountant-General, U. P.); Charuchandra Datta (afterwards District and Sessions Judge, Bombay); Dwijendranath Gooptu (afterwards a doctor); Charuchandra Ghose (the donor's father; afterwards Knight and Judge, sometime Acting Chief Justice, Calcutta High Court); Pravaschandra Mitra (afterwards Knight and Member of the Executive Council, Bengal); Surendranath Mukherji (afterwards Vakil, Alipore Court); Bhupendranath Mitra (afterwards Knight, Member of the Viceroy's Executive Council, and High Commissioner for India in the U. K.); Brajendralal Basu (afterwards Vakil at Ranchi); Brajendralal Mitra (afterwards Knight, Law Member with the Government of India, Advocate-General: Federal Court, Dewan: Baroda State, and, lately, officiating Governor of Bengal). This picture, incidentally, throws interesting sidelight on student-fashions in dress of

those days.[1] The other picture shows the same group nine years later in 1903, barring four absentees, *viz.*, Taritkanti Baksi, Brajendralal Basu, Dwijendranath Gooptu, and Brajendralal Mitra (then away in England for higher studies). In 1903, Dwarkanath Mitra, Prafullachandra Datta, Charuchandra Ghosh, Pravaschandra Mitra and Surendranath Mukherji were practising lawyers at different places; Nripendranath Sarkar was a Munsif at Barasat; Dakshinaranjan Ghosh, a Deputy Magistrate at Howrah; Charuchandra Datta, a member of the Indian Civil Service; Bhupendranath Mitra, an assistant in the Accounts Department, Government of India; and Jnansaran Chakravarti, an Enrolled Officer (he had come out first in the Indian Audit and Accounts Examination in 1898).

OUR CONTEMPORARIES

We acknowledge with thanks the receipt of the following periodicals since January, 1947:—

1. Journal of the Benares Hindu University
2. Allahabad University Magazine
3. The Beacon (Government College Magazine, Lyallpur)
4. The Presidencian (Madras Presidency College Magazine)
5. The Ravi (Government College Magazine, Lahore)
6. The Dyal Singh College Magazine, Lahore
7. The Union Magazine; D. A. V. College, Lahore
8. The Murray College Magazine, Sialkot
9. The Meerut College Magazine
10. St. Xavier's College Magazine, Calcutta
11. The Scottish Church College Magazine, Calcutta
12. The Ashutosh College Magazine, Calcutta
13. City College Magazine, Calcutta
14. Vidyasagar College Magazine, Calcutta
15. The Bangabasi College Magazine, Calcutta
16. St. Paul's College Magazine, Calcutta
17. Fazlul Haq Muslim Hall Annual, Dacca
18. Serampore College Students' Chronicle
19. *Nirnaya* (Bengali)
20. *Banglar Katha* (Bengali)

---

[1] This picture is published elsewhere.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15 Pramatha Nath Banerjee, B. A.
1915-16 Mohit Kumar Sen Gupta, B. A.
1916-17 Mohit Kumar Sen Gupta, B. A.
1917-18 Saroj Kumar Das, B. A.
1918-19—Amiya Kumar Sen, B.A.
1919-20 Mahmood Hassan, B. A.
1920-21 Phiroze E. Dustoor, B. A.
1921-22 Syama Prasad Mookerjee, B. A.
1921-22 Brajakanta Guha, B. A.
1922-23 Uma Prasad Mookerjee
1923-24 Subodh Chandra Sen Gupta
1924-25 Subodh Chandra Sen Gupta, B. A.
1925-26 Asit Krishna Mukherjee, B. A.
1926-27 Humayun Z. A. Kabir, B. A.
1927-28 Hirendra Nath Mukherjee, B.A.
1928-29 Sunit Kumar Indra, B. A.
1929-30 Taraknath Sen, B. A.
1930-31 Bhabatosh Datta, B. A.
1931-32 Ajit Nath Roy, B. A.
1932-33 Sachindra Kumar Majumdar, B. A.
1933-34 Nikhilnath Chakravarty, B. A.
1934-35 Ardhendu Baksi, B. A.
1935-36 Kalidas Lahiri, B. A.
1936-37 Asok Mitra, B. A.
1937-38 Bimal Chandra Sinha, B. A.
1938-39 Pratap Chandra Sen, B. A.
1938-39 Nirmal Chandra Sen Gupta, B. A.
1939-40 A. Q. M. Mahiuddin, B. A.
1940-41 Nanilal Banerjee, B. A.
1941-42 Arun Banerjee, B. A.
1942-47 No Publication Due to Govt. Circular Regarding Paper Economy
1947-48 Sudhindranath Gupta, B. A.

Printed by P. C. Chatterjee at the Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta.
Edited and published by Sudhindranath Gupta, Presidency College, Calcutta.

০৭৩·১/০৮

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

পৌষ, ১৩৫৫ :: ত্রিংশ বর্ষ :: জানুয়ারি, ১৯৪৯

সুবীরকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত

সূচী পৃষ্ঠা

শুভকামনা ১
সম্পাদকীয় ২
কলেজ প্রসংগ ৫
মহাত্মা গান্ধী ৯
পূজারী চারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩
ইংরেজি শিক্ষা ২১
ভারতের কবি-মানসের প্রতিভূ ও ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ ২৮
ভারতের মুক্তি-সাধনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অবদান ৩৬
"হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ" ৪২
অস্ত চাঁদের পথে ৪৩
পাগল ৪৮
বাঙলার শিশুসাহিত্য ৫৪
চলিষ্ণু মুহূর্ত ৫৭
চলার পথে ৫৮
কলতান ৫৯
তিরিশে জানুয়ারি ৬১
পুস্তক পরিচয় ৬২
আমাদের কথা ৬৩

GREETINGS 1
READING HISTORY 2
PROFESSOR F. J. ROWE 4
SOME ASPECTS OF THE PHILOSOPHY OF MAHATMA GANDHI 10
THE ATOM BOMB 19
PAHARPUR AND ITS REMAINS 23
DUSK AND DAWN 29
IN MEMORIAM 30
PROFESSOR PRAPHULLA CHANDRA GHOSH ... 33
ADDRESS 38
BOOK REVIEWS 41
MISCELLANEOUS 47

চিত্র-সূচী

'এলো মহাজন্মের লগ্ন···', রাসবিহারী ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরদিন্দু দাশগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, নর্মদা প্রপাত, একাকী, ফেরার পথে।

Mahatma and the Poet
Remains at Paharpur
Victoria Memorial
Professor P. C. Ghosh
College Union Council, 1947-48
Festival Cricket Match, 1948

বিজ্ঞাপন

প্রতি সংখ্যার জন্য চাঁদার হার :—

ভারতের মধ্যে (ডাকমাশুল সহ)	২॥০ টাকা
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের জন্য—	১॥০ "
ভারতের বাহিরে	৪ শিলিং

প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক বা কলেজ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে রচনা আহ্বান করা হচ্ছে সাদরে। সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী এবং এই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত পত্রাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। উপযুক্ত ডাক-টিকিট-যুক্ত শিরোনামা-লিখিত লেপাফা সংগে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

রচনা কাগজের একপিঠে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। রচনার সংগে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা পাঠাতে হবে।

পত্রিকা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদকের সংগে পত্রালাপ চলবে।

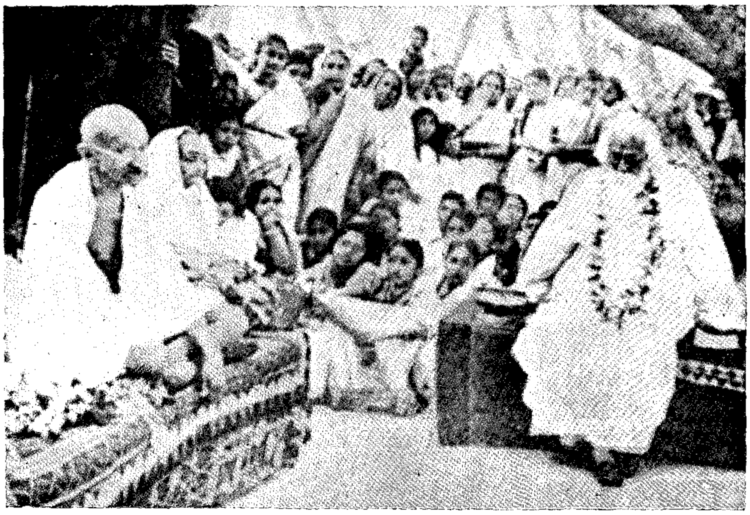

Mahatma and the Poet

Dear Mr Gandhi,

That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India has given me real pleasure – and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shanti Niketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the sādhanā of both of our lives.

Very sincerely yours
Rabindranath Tagore

'এলো মহাজন্মের লগ্ন......'

[শিল্পী : বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—তৃতীয় বর্ষ, আর্টস

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

পৌষ, ১৩৫৫ ঃঃ ত্রিংশ বর্ষ ঃঃ জানুয়ারি, ১৯৪৯

শুভকামনা

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

স্বাধীনতা লাভের পর প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার মুখবন্ধরূপে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্বের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে এবং উহার গুরুত্ব ও গভীরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যে দেশকে আমরা পাইয়াছি, তাহাকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসিতে হইবে। আমরা পিতামাতাকে যেমন ভালবাসি, ভ্রাতাভগিনীকে যেমন ভালবাসি, স্ত্রীপুত্রকন্যাকে যেমন ভালবাসি, তেমনি করিয়া দেশকে, দেশের ভাষাকে, দেশের সংস্কৃতিকে ভালবাসিতে হইবে। ইহার পশ্চাতে কোন সূক্ষ্ম বা স্থূল যুক্তি নাই। যুক্তিদ্বারা ভালবাসা যায় না।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উচ্চতম আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কর্মসাধনার পাথেয় হইবে সুদৃঢ় চরিত্র, বলিষ্ঠ কল্পনা, অদম্য উৎসাহ ও অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা। বহুযুগসঞ্চিত যে দাসত্ব-বিষ আমাদের মনুষ্যত্বকে, সামাজিক কল্যাণবুদ্ধিকে, নৈতিক আদর্শবাদকে জড় ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে হইবে। অন্তরে ও বাহিরে সর্বতোভাবে শুচি হইতে হইবে।

এই আদর্শ, এই কল্পনা, এই সাধনা আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র ও ছাত্রীগণের মনে সঞ্জীবিত হউক, ইহাই আমার একান্ত আশা ও কামনা।

সম্পাদকীয়

নতুন দৃষ্টিভংগী

বহুদিন পরে ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে। তার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হতে চলেছে। তাঁবেদারির পালা আজ শেষ, এবার থেকে সে তার নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারবে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তার প্রতিভার উপযুক্ত স্ফুরণ এখন হবে অব্যাহত। নিজের পথ নিজে করে নেওয়াতে আছে আনন্দ ও তৃপ্তি; কিন্তু সে পথ বড় বন্ধুর। মানুষ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয়, সামনের পথের নিশানা তার জানা নেই। পথপ্রদর্শক কেউ নেই। তাকে একান্তভাবে নির্ভর করতে হবে নিজের উপর। যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সে এগিয়ে চলবে তার উপর নির্ভর করছে অগণ্য নরনারীর সুখদুঃখ। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই গুরুদায়িত্বের ভার আজ গ্রহণ করেছেন। দুর্জয় সাহস ও কঠিন ব্রত নিয়ে তাঁরা এই পথ দেখানোর কাজে অগ্রণী হয়েছেন। কিন্তু জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে তাঁদের সকল প্রয়াসই হবে ব্যর্থ। যে জনসমর্থন তাঁদের পথ চলার ছন্দে আনবে নতুন প্রাণ, তাকে পেতে হলে তাঁদের নতুন দৃষ্টিভংগী নিয়ে কাজ করতে হবে।

একথা কেউ আজ অস্বীকার করবেন না যে বর্তমানে আমাদের খুবই দুরূহ ও সংকটপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। আজ পৃথিবীর সর্বত্রই অর্থনৈতিক সমস্যা লোকের প্রাণশক্তিকে রাহুর মতন ধীরে ধীরে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। সামান্য ভাত-কাপড়ের জন্য, মাথা গুঁজবার মতন একটু আশ্রয়ের জন্য আমরা আজ এতই চিন্তিত যে অন্য সব বিষয়ে আমরা উদাসীন। দিনের পর দিন অভাব অনটনের সংগে যুঝে আমরা ক্লান্ত; যে স্বাধীনতা মানুষের মতন বাঁচবার পথ নির্দেশ করে দিতে পারে না, সে স্বাধীনতা জনসাধারণের কাছে অর্থহীন, সুন্দর সুন্দর কথার ইন্দ্রজাল মাত্র। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তারা প্রস্তুত নয়। স্বাধীনতার সম্যক্ রসোপলব্ধি করতে তারা আজ অপারগ।

অর্থনৈতিক সমস্যার পরেই ওঠে আদর্শ সংকটের কথা। বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের মনোজগতের অনেক রুদ্ধ দুয়ার আজ উন্মুক্ত করেছেন। আবহমানকালের ভাবধারা এতদিন আমরা বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করে এসেছি। কিন্তু আজ আমরা প্রতি পদে তাকে বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার জন্য ব্যগ্র। অতীতের জীবনাদর্শ, অতীতের দর্শন আজ আমাদের আর উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। যে নৈতিক ভিত্তির উপর আমাদের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা আজ গেছে শিথিল হয়ে। কিন্তু তার স্থান

নিতে পারে, নতুন যুগের, নতুন পারিপার্শ্বিকের উপযোগী এমন কোন জীবনাদর্শ এখনও গড়ে ওঠে নি। এর ফলে অনিশ্চয়তা আমাদের কর্মশক্তিকে পদে পদে ব্যাহত করেছে। প্রত্যেকের ভেতর যে সৃজনীশক্তি আছে তার স্বাভাবিক স্ফুরণ না হলে যে ব্যর্থতা আসে মনের পক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানুষ তখন হয়ে ওঠে নিরুদ্যম, অবিশ্বাস ও নিরাশার মূর্ত প্রতীক।

এই ব্যর্থতাকে এড়িয়ে যেতে হলে জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ সম্প্রসারিত করতে হবে। রাষ্ট্রনায়কদের আমাদের মন সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে জীবনের অসম্পূর্ণতার বিচলিত না হয়ে আমরা জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শিখি। এই গঠনমূলক কার্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে। জীবনের প্রারম্ভে মানুষের মনের যে স্বাভাবিক ঔদার্য থাকে তার সুযোগ যদি ঠিকমত নেওয়া যায় তাহলে শিক্ষাদানের কাজ অনেক সহজ হয়ে আসে। কিন্তু তার জন্য চাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

প্রত্যেক শিক্ষাব্যবস্থার দুটি দিক আছে। একটি তার দার্শনিক ভিত্তি, অন্যটি তার কার্যকরী পরিকল্পনা অথবা কাঠামো। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বৈদেশিক রাজশক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য ইংরাজ এক বিশেষ কেরানী-শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। তার পিছনে কোন দার্শনিক ভিত্তির নাম গন্ধও ছিল না, আর তার কাঠামো ছিল অসংলগ্ন ও নড়বড়ে। তার পরে অবশ্য যখন ভারতবাসী নিজেদের দুর্দশা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠল, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা যখন কতকগুলি অত্যাবশ্যক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন, তখন কিছু কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হল। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগের সংগে বর্তমানের তুলনা করলেই সেটা ধরা পড়বে। জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতীয়দের দান আজ নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়। সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান—প্রত্যেকটি বিভাগ সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে তারা সাহায্য করেছে।

কিন্তু আসল যে অভাব সেটা আজও মেটানো হয় নি। ইংরাজ ভারত ছেড়ে চলে গেছে, যে শিক্ষাব্যবস্থা সে চালু করেছিল তাকে জিইয়ে রাখার আজ আর কোন মানে হয় না। শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তির প্রতি উদাসীন থেকে যদি পুঁথিগত বিদ্যা, অর্থাৎ তার বাইরের রূপটার দিকে নজর দেওয়া হয় বেশী, তাহলে শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্যই যাবে ব্যর্থ হয়ে।

বিশিষ্ট ইংরাজ শিক্ষাব্রতী জন্ সার্জেণ্ট মহোদয় এই সত্যটি অনুভব করে, পারিপার্শ্বিকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে একটি পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। এতে কতকগুলি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করা হয়েছিল। এই কার্যে তিনি প্রধানতঃ গান্ধীজীর 'নয়ী তালিমের' আদর্শ ও ডক্টর জাকীর হোসেনের বনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্বভাবতঃই তিনি গোড়াকে, ভিত্‌কে শক্ত করার দিকে ঝুঁকেছিলেন বেশী। কিন্তু আমরা

এখানে আলোচনা করব তাঁর পরিকল্পনায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই নিয়ে।

বর্তমানে দেখা যায় অধিকাংশ ছাত্র কলেজে আসে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাপ নিয়ে বেরোতে পারলে চাকরীর বাজারে কিছু সুবিধা হতে পারে, এই আশা নিয়ে সে আসে। উচ্চশিক্ষার জন্য তার কোন স্পৃহা নেই, সেদিকে কোন প্রবণতাও তার নেই। শুধু অন্নসংস্থানের প্রয়োজনেই তাকে আসতে হয়। এর ফলে সময় ও শক্তির যে অপচয় হয় তা আমাদের দেশ আজ কখনই সহ্য করতে পারে না। এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় শিক্ষিত বেকার সমস্যায়।

জাতীয় শক্তির এই অপরিমেয় ক্ষতি রোধ করার জন্য এই পরিকল্পনায় উচ্চতর শিক্ষাকে দুই ভাগ করা হয়েছে। সাধারণ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের প্রবেশাধিকার থাকবে না। বিশেষ প্রবণতা না থাকলে এদিকে আসতে ছাত্রদের কোন উৎসাহ দেওয়া হবে না। তাদের জন্য এক নতুন ধরনের কলেজের প্রবর্তন করা হবে। সেখানে হাতের কাজ, যন্ত্রপাতির কাজ ও অন্যান্য কার্যকরী শিক্ষা বা vocational-technical education-এর ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেকে এমন একটি বৃত্তি গ্রহণ করবে যা তাকে ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। জীবনের আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলেই সে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োগ করতে পারবে। একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণতা থেকে সে মুক্তি পাবে। বৃহত্তর সমাজগোষ্ঠীর সুখদুঃখের কথা সে ভাবতে শিখবে। তার দৃষ্টিভংগীও হবে প্রসারিত।

এখানে বলে রাখা দরকার যে অনেক শিক্ষাব্রতীর অভিমত এই যে, সমাজসেবাকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা উচিত। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাইতে All India Conference of Social Work-এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভার পর সম্মেলনের কয়েকটি বিভাগীয় সভার আয়োজন করা হয়। একটি বিভাগে 'সমাজ সেবা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব'—এই নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন শ্রীমিনু মাসানী। নানা কথার ভেতরে সমাজসেবার কাজ কী করে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত নাইডু বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে ছাত্রদের এই কাজে লাগাতে পারলেই সমস্যার সত্যিকারের সমাধান হতে পারে। আমাদের দেশ গরীব দেশ। তার সাত লক্ষ গ্রাম আজ ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়ে আছে। তাদের হৃত শ্রী ফিরিয়ে আনবার জন্য অর্থব্যয় করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যদি স্বেচ্ছায় তাদের জীবনের একটি বৎসর এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনে অতিবাহিত করে তাহলেই এই অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। শ্রীযুক্ত নাইডুর এই কথায় কতিপয় প্রতিনিধি আপত্তি তোলেন এই বলে যে, ছাত্রদের উপর ছেড়ে দিলে কাজ বেশী দূর

এগোবে বলে তাঁদের মোটেই ভরসা নেই। তার প্রত্যুত্তরে স্থানীয় Progressive Association-এর তরুণ সম্পাদক বলেন যে তাহলে ছাত্রদের অধ্যয়নের কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে অবসরপ্রাপ্ত পেন্সনভোগীদের এ কাজে লাগালেই ল্যাঠা চুকে যায়। শ্রীযুক্ত নাইডু প্রতিনিধিদের আপত্তি মেনে নিয়ে বলেন যে, প্রথমে সমাজসেবা ছাত্রদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করতে হবে। যেমন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত করেছেন যে, উপাধি পাবার আগে প্রত্যেক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে কিছুদিন গ্রামসেবার কার্যে ব্যয় করতে হবে। এ ছাড়া ছুটিতেও অধ্যাপকেরা ছাত্রদের ছোট ছোট দল নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন গ্রামাভিমুখে। গ্রামবাসীদের সংগে সংযোগ স্থাপন করাই হবে তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রসংগক্রমে জেরুসালেমের ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনশিক্ষা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বাধীন ভারতে আমাদের দৃষ্টিভংগী কী রূপ হওয়া দরকার সেই নিয়ে কিছু আলোচনা করলাম। গান্ধীজীর নয়ী তালিমের পরিকল্পনায় এই বিশেষ দৃষ্টিভংগীর ছায়া পড়েছে। ডক্টর জাকীর হোসেন নিজে নয়ী তালিমকে বাস্তবে রূপায়িত করার কার্যে ব্যাপৃত আছেন। তিনি স্বাধীন ভারতে যে নতুন সমাজের কল্পনা করেছেন তা শ্রেণীবৈষম্য বা ধনবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পারস্পরিক সহযোগিতা, সদিচ্ছা, ও মানসিক ঔদার্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে তার আসল স্বরূপ। এই দৃষ্টিভংগী নিয়ে অগ্রসর হলে নতুন সমাজ গঠনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলবে। অজানা পথের বাধা সে অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না। ভয়মুক্ত মন ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় সাফল্যকে আবাহন করে আনবে।

কলেজ প্রসংগ

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০শে জানুয়ারী আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস। যাঁরা কলেজের গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করেছেন তাঁরা এই দিনটিতে নতুন করে কলেজের সংগে প্রীতির যোগসূত্র রচনা করেন। অতীত ও বর্তমানের মিলনে প্রতি বৎসর সভাস্থল আনন্দমুখরিত হয়ে ওঠে।

এবারেও প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উপলক্ষে কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান বিভাগের প্রত্যেকটি শাখা থেকে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রদর্শনীগুলি দর্শকদের কৌতূহল উদ্দীপিত করে। এ বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। একটি প্রদর্শনীতে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজ, অংকন ও চিত্রণ, আলোকচিত্র, সূচিশিল্প, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি দেখানো হয়। সকলে এটি

দেখে খুব প্রীত হন। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে একটি ক্রীকেট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী বিজয়ী হন। তিনটি ছায়াচিত্র দেখানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

২০শে জানুয়ারী প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের এক মিলিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী কলেজের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করে শোনান। তারপর সভাপতি মহাশয়, অধ্যক্ষ যোগীশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ মহাশয় কলেজের সংগে তাঁদের নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাসের সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে অনুরোধ করেন।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

২২শে জানুয়ারী বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। পৌরোহিত্য করেন ডাঃ এস, কে গুপ্ত। শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবীশ পুরস্কার বিতরণ করেন।

গান্ধীজী

৩০শে জানুয়ারী সায়াহ্নে গান্ধীজীর জীবনাবসান হয়। ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার প্রধান রচয়িতা তিনি। ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিলিত এক প্রার্থনা সভায় তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ভারতের ইতিহাসের একটি সংকট-পূর্ণ অধ্যায়ে তিনি ছিলেন এক অত্যুজ্জ্বল দীপশিখা। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা আমাদের পথপ্রদর্শককে হারিয়েছি।

অধ্যক্ষ মহলানবীশের অবসর গ্রহণ

১৮ই এপ্রিল অধ্যক্ষ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় অবসর গ্রহণ করেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি কলেজে অধ্যয়ন করতে আসেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে কলেজের সংগে তাঁর যোগসূত্র ছিল অক্ষুণ্ণ। তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক সভা হয়। অধ্যক্ষ যোগীশ চন্দ্র সিংহ ও অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র অধ্যক্ষ মহলানবীশের অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ মননশীলতার প্রশংসা করেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে য়ুনিয়নের সম্পাদক তাঁর উপদেশ ও উৎসাহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ মহলানবীশ তাঁর ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করে ছাত্রদের নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী হ'তে উপদেশ দেন। জাতির সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাকে সার্থক করে তোলার দায়িত্ব দেশের যুবকদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। তার জন্য চাই দৃঢ়তা, মনোবল, ও ক্লান্তিহীন কর্মযজ্ঞ।

অধ্যক্ষ মহলানবীশ প্রেসিডেন্সি কলেজের 'এমেরিটাস প্রফেসর' নিযুক্ত হয়েছেন।

ছাত্র সংবাদ

প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু এবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তার ব্যতিক্রম হয়েছে। আমাদের ব্যর্থতা এতই অপ্রত্যাশিত যে সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কৃতীছাত্র এঁদের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ সর্বদা গর্ব অনুভব করে। কিন্তু কিছুদিন ধরে দেশজোড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে দ্রুত পরিবর্তনের আলোড়ন চলেছে তা আমাদিগকেও নিষ্কৃতি দেয়নি। ফলে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা সব সময়ে সম্ভবপর হয়নি, পর্যবেক্ষণেও ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে। অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীরা যদি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হন তাহলে হয়ত আগামীবার আমরা পুনরায় সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারব।

আমাদের অভাব অভিযোগ

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে প্রায় বারোশ'। কিন্তু সাধারণ সভার উপযুক্ত কোন 'কলেজ হল' আমাদের নেই। বহুদিন ধরে আমাদের কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অভাব পূর্ণ করার জন্য আবেদন করেছি, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের ঔদাসীন্য কিছুমাত্র শিথিল হয়নি। একটিমাত্র বিরাম-পীঠিকাতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছাত্রের স্থান হয়। অন্যান্যদের বিষয়ে যে কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব আছে তা মনে হয় না। সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় লাইব্রেরীর সদ্ব্যবহার করার কোন সুযোগই আমাদের নেই। কলিকাতার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরতলির ছাত্র ও ছাত্রীদের পক্ষে যাতায়াত করাও এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজের নিজস্ব যানবাহনের কী কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়? এ সমস্ত অভাব অভিযোগ কিছু নতুন নয়। প্রতি বৎসরই পত্রিকার মারফত আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এবারেও আমরা তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি প্রেসিডেন্সি কলেজের উন্নতিসাধনে মনোযোগী হতে।

অধ্যাপকমণ্ডলীতে পরিবর্তন

অধ্যক্ষ মহলানবীশ অবসর গ্রহণ করায় তাঁর স্থান পূরণ করেছেন ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ। ডাঃ ঘোষ পূর্বে এই কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ও গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

অধ্যাপক দুর্গাগতি চট্টোরাজ ১লা মার্চ অবসর গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সরল অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী অবসর গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপনায় তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। গুণমুগ্ধ ছাত্রেরা তাঁর শিক্ষা ও উপদেশের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন।

সাম্প্রতিক পরিবর্তনের একটি হিসাব

আর্টস বিভাগ : ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়তোষ বাগচী দার্জিলিং কলেজে বদলী হয়েছেন। তাঁর স্থানে এসেছেন অধ্যাপক শ্রীদিলীপ কুমার সেন। বাংলায় এসেছেন অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র। ইতিহাসে অধ্যাপক ডাঃ চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত যোগদান করেছেন। আরবীর অধ্যাপক মহীউদ্দিন কার্যে ইস্তফা দিয়েছেন। দর্শন শাস্ত্রে এসেছেন অধ্যাপক চারুশশী চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক মজুমদার এ বিভাগে সম্প্রতি যোগদান করেছেন। অধ্যাপক নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন।

বিজ্ঞান বিভাগ : গণিত শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক কেরাওয়ালা লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ নিয়ে চলে গেছেন, অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন কুশারী কার্যে ইস্তফা দিয়েছেন, অধ্যাপক শ্রীসনত কুমার বসু ও অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সরকার যোগদান করেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীকালীপদ ঘোষ অবসর গ্রহণ করেছেন। রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ সুবোধ কুমার মজুমদার দার্জিলিং কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীসরোজ রঞ্জন চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমার চট্টোপাধ্যায় এসেছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এসেছেন অধ্যাপক শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য। শরীর বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে এসেছেন ডাঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লাইব্রেরী

৩১শে মার্চ কলেজ লাইব্রেরীতে মোট ৬২,১৭২টি বই ছিল। স্থানাভাবে বইগুলির উপযুক্ত যত্ন নেওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মচারীর সংখ্যাও অপ্রতুল। লাইব্রেরীর আর্থিক বরাদ্দ না বাড়ালে দেশ বিদেশের সাহিত্য সৃষ্টির সংগে পরিচয় রাখা কঠিন হবে।

বিয়োগ পঞ্জী

অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি স্মৃতি-উজ্জ্বল অধ্যায়ে যতি পড়ল। ছাত্র ও অধ্যাপক হিসাবে তিনি ক্রমান্বয়ে পঞ্চাশ বৎসর এই কলেজের সংগে যুক্ত ছিলেন। অধ্যয়ন ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন তা ভুল্‌বার নয়। তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ছাত্রমনের উপর তাঁর প্রভাবের কিছু পরিচয় অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

২রা মার্চ তিয়াত্তর বৎসর বয়সে শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গুহের মৃত্যু হয়। সুদক্ষ 'এডভোকেট' বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট।

কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচীর তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি সহজেই অনুমেয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের সংগে তাঁর সম্পর্ক ছাত্রাবস্থায় সুরু হয়েছিল।

শ্রীসত্যানন্দ বোস পরলোক গমন করেছেন। স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্মী হিসাবে তিনি সকলের কাছে সুপরিচিত। 'বি, পি, সি, সি'র কোষাধ্যক্ষ পদে তিনি বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে আমরা একজন খ্যাতনামা দেশসেবক-কে হারালাম। প্রাদেশিক আইন সভার তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হিসাবে বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের তিনি একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন।

পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে প্রেসিডেন্সি কলেজ তার এক শুভাকাঙ্ক্ষীকে হারিয়েছে। ছাত্র ও অধ্যাপক হিসাবে তিনি এই কলেজের সংগে যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সকলেরই সুবিদিত।

অধ্যাপক ললিত কুমার রায় পরলোক গমন করেছেন। তিনি কিছুকাল আমাদের কলেজে গণিত শাস্ত্রে অধ্যাপনা করেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র, ভারতীয় রাজকীয় বিমান বাহিনীর 'ফ্লাইট লেফ্‌টেনাণ্ট' শ্রীশরদিন্দু দাশগুপ্ত কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। গত মহাযুদ্ধে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৮ বৎসর।

আমরা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ও তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

"আমাদের এমন লোক হতে হবে যারা দুঃখ দুর্দশা অত্যাচার সমস্ত শুনেও অসহিষ্ণু চঞ্চল হয়ে উঠবে না। এ যে অহিংসার লড়াই। ছেলেবেলা থেকেই শিখেছি, কাঁদবে কেন—যদি কিছু করতে না পার তবে ছেড়ে দেও। কিন্তু ছাড়তেও তো পারো না—কিছু করতেই যে হবে। যে অহিংসা পালন করে তার মন ফুলের চেয়েও নরম আবার লোহার চেয়েও কঠিন।"

"ঈশ্বর তো প্রকৃত কথা বলতে গেলে নির্গুণ, গুণাতীত—হিন্দুস্থানে পুরাণ কথা চালানো হয়েছে লোককে বোঝাবার জন্য। রামরাবণের কাহিনী লোকশিক্ষার জন্য। আমাদের প্রভু তো রাম। রামায়ণের কাহিনী মানুষের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত তো করেই না, বরং হিন্দুধর্মে রামনামে যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা করা হয়েছে, প্রতিশোধ শুধু তিনিই নিতে পারেন, কৃত পাপের ফল শুধু তিনিই দিতে পারেন, এরূপ বলা হয়েছে। রামই শুধু মানুষের অন্তর দেখতে পান, তাই তিনি রাম। যদি কেউ মনে করে সে-ই রাম হয়েছে, তবে সে তো হয়ে দাঁড়াল রাবণ। দোষেগুণে যে মানুষ, সে অন্য মানুষকে বিচার করবে কোন অধিকারে? এ চিন্তাই মানুষের চিন্তা নয়, ধর্মের চিন্তা নয়।"

"আমি চাই অন্তরের শুদ্ধি; সেটা হয়ে গেলে তবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আসবে, বিশ্বাস আসবে।"

"যে অহিংসা পালন করে তার মন ফুলের চেয়েও নরম আবার লোহার চেয়েও কঠিন; মনকে কঠিন করতে হবে। দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী তো শুনেছি, কিন্তু সে সমস্ত কাঁদতে কাঁদতেই হজম করতে হবে।"

"কাজে যদি করা না হয়, সত্য ও অহিংসা যদি আচরণে না পালন করা হয়, তবে তা নিয়ে মুখে বলার কোনও অর্থ হয় না; বরং তাতে করে ক্ষতিই হয়।"

"স্বাধীনতার মানে এ নয় যে যার যা ইচ্ছা সে তাই করতে পারবে। 'খুন করবো', 'মিথ্যা কথা বলবো', এই ব'লে কি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করতে পারে? সাধনা করতে পারে? তাহলে তো ভগবানের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া হয় না, ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করা হয় না, শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়।"

* * * *

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দিল্লীতে সংহত পরিবেশের মধ্যে মহাত্মাজী প্রার্থনা সভায় এমনি সব কথা বলতেন। এক বৎসর দেখতে দেখতে কেটে গেছে। অধিকাংশই আসতো শুনতে, প্রার্থনায় তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে, তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে। আমরা দূরে থেকেও তাঁরই কণ্ঠনিঃসৃত বাণী বিজ্ঞানের কৌশলে শুনতে পেতাম। কত বিষয়ের কথা, কত আলোচনা, গুড়ের দর থেকে উপনিষদের উপদেশ, কিছুই বাদ যেতো না। অনেকে হয়তো তার তাৎপর্য সে সময়ে বুঝতে পারে নাই; কিন্তু যত দিন যায়, কালের কষ্টিপাথরে সে উপদেশ যত ঘষামাজা বায় ততই তার রং উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে।

কারণ ভারতবর্ষ মৃত নয়, ভারতবর্ষ প্রাণশক্তিতে ভরা; সেই প্রাণশক্তি স্ফূর্তি হয়েছিল মহাত্মাজীর মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য আয়ত্ত করে দৃঢ় পদক্ষেপে অহিংসাশক্তি বলে তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার উপান্তে এনে দিয়েছেন। পরে আমাদের ঐতিহাসিকেরা নানাভাবে ব্যাখ্যা

করবেন, জানি; তাঁরা বলবেন, ইউরোপীয় শক্তির প্রগতিবাদের মধ্যে ভারতের এই অগ্রগতি নিশ্চিতভাবে নিহিত ছিল; হয়তো বা বলবেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েটের মধ্যে ভারসাম্য যাতে হতে পারে তার জন্য ভারতবর্ষকে ইংরেজের মুক্তি দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না; হয়তো আর কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করবেন। কিন্তু মহাত্মাজীর মত সক্রিয় সাধক, যিনি কখনও ভরসা হারান নাই, যিনি তাঁর কথামত 'নমাসে স্বরাজ' না হওয়ায় আমাদের বহস্য বিদ্রূপের মধ্যেও তাঁর গতিবেগ এতটুকু শিথিল করেন নাই, তিনি না হলে যে কি হোত, তা অনুমান করতে পারি। নিকটে থেকে তাঁর দেশবাসী হয়েও আমরা তাঁকে ঠিক চিনতে পারি নাই, তাঁর মূল্য নির্ধারণ করতে পারি নাই। কিন্তু পশ্চিম পেরেছিল, তাই সুইডেন নরওয়ের লোকেরাও কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়কে দেখে বলাবলি করতো—গান্ধী। মহাপুরুষের নামেই দেশের নাম; একদিন ভরতের নামে ভারতবর্ষ হয়েছিল, এখন ভারতবর্ষকে লোকে চেনে গান্ধীর দেশ ব'লে।

যা বলেছিলাম, গান্ধীজীর কথা আজ কেউ কেউ মুখে স্বীকার করছি, অন্তরে মানছি না। অনেকে জোর গলায় সে কথা জাহিরও করছেন, কেউ কেউ সূক্ষ্মভাবে তার প্রতিক্রিয়া সাধনে ব্যস্ত। কিন্তু নামের মিথ্যাচার হয় বলেই নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না, সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে কত লোকই তো অধর্মাচরণ করে, তাতে সন্ন্যাসের আদর্শ থাকে অক্ষুন্ন। গান্ধীজীর বাণীর দূরপ্রসারিণী গতি আমরা যেন ক্ষণিক মোহের অঞ্জনে আশু লাভের আগ্রহে অগ্রাহ্য না করি; ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব পরিণতি সেই বাণীর চিন্তায় ও তার সাধনায় বহু যুগ ধরে আমরা উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবো, তাই কিশোরদের পত্রিকায় এ কথার অবতারণা করলাম।

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এখনও স্থাপিত হয় নাই। আজও দুই রাজ্যের (?) সীমানায় সীমানায় বিদ্বেষের বহ্নি ধূমায়িত অবস্থায় রয়েছে। শহরে তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ভেসে আসে, উভয় পক্ষের উগ্র মতবাদের ভিতর দিয়ে। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে না বটে, কিন্তু সে আগুন যে এখনও নেভে নাই, মহাপুরুষের রক্তদানেও তার শান্তি হয় নাই, তার প্রমাণ এসে যায় মাঝে মাঝে। বাংলার বাইরের একজন ভদ্রলোক সে দিন বলছিলেন, 'আপনাদের আইনসভার বিতণ্ডাগুলি পড়ে মনে তো হয় না যে এখনও উভয় সম্প্রদায় পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারে; দেখুন না আপনাদের সদস্যদের বক্তৃতাগুলি পড়ে।' যে সাম্প্রদায়িক প্রীতির কথা বলতে যায়, আজও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে; কোথাও সে গুঞ্জন মৃদু, কোথাও বা তীব্র। কী উদারতা নিয়েই না গান্ধীজী এই হিংসা প্রতিহিংসার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন! তিনি এর থেকে বাঁচবার জন্য বা অন্য কাজ করবার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজতে ব্যস্ত ছিলেন না—তিনি ছুটে যেতে চেয়েছিলেন এই আগুন নেভাবার জন্য। মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, 'করেঙ্গে ইয়া

মরেঙ্গে'—হয় এই আগুন নেভাবো, নয়তো প্রাণ দেবো। অক্ষরে অক্ষরে তিনি পালন করেছিলেন তাঁর কথা। ধন্য তাঁর সেবকেরা, যাঁরা কর্মক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থায় প্রাণ দিতে এগিয়ে গেছেন। গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই কয়জন এবং আরো কয়েকজনের নাম হয়তো আমরা জানি, আরও কত লোকের নাম আমরা জানি না। সেই ১২।১৩ বছরের হিন্দু ছেলেটির নাম আমরা জানি না, যে তার সহপাঠী একজন তরুণ মুসলমান ছাত্রের আততায়ীকে বাধা দিয়ে বলেছিল, 'ও যে আমাদের সঙ্গে পড়ে!' এবং পর মুহূর্তে সহপাঠীর সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করেছিল। কি করে মানুষের মাথায় খুন চড়ে যায়, পাগল হয়ে যায় সে! আমাদের তরুণ ছাত্রেরা কি জাতিকে রক্ষা করবেন না, শুধু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এই উৎকট অভিব্যক্তির বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে নয়, জীবনে সর্ব ধর্মে শ্রদ্ধা পোষণ করে অন্য ধর্মীর প্রতি প্রীতির ভাব জাগিয়ে? যেমন পঙ্কিল আবর্তে আমাদের সমাজ-জীবন আজ সঙ্কটাপন্ন, তাতে বিশেষ চেষ্টা না করলে এর থেকে আমরা কিছুতেই বের হতে পারবো না—এবং সে চেষ্টা বিশেষ করে ছাত্রসম্প্রদায়কেই করতে হবে, কারণ আজ যারা ছাত্র তারাই তো অদূর ভবিষ্যতে হবে আমাদের অগ্রণী। গান্ধীজীর অন্তিম শিক্ষা এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি; নোয়াখালি—কলকাতা—বিহার—দিল্লী, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে দ্রুতবেগে তিনি সঞ্চরণ করেছিলেন, ভ্রাতৃহন্তার উদ্যত হস্ত তাঁর নিষেধে শিথিল হয়েছে। আজ ছাত্রদের অক্লান্ত চেষ্টায়ই শুধু এই সম্প্রীতির প্রসার সম্ভব।

মহাত্মাজীর সর্ববিষয়িণী দৃষ্টির আর একটি কথা উল্লেখ করি। স্বাধীন ভারতেও কি হিন্দুসমাজে সম্প্রদায়ের ভেদে বৈষম্য থাকবে? হরিজন ও বর্ণহিন্দু, একই সমাজের দুই অঙ্গ, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য যা এখন আছে, তাই কি বরাবর থাকবে? অস্পৃশ্যতা দোষ, যা কি না মহাত্মাজী হিন্দুসমাজের গলিত কুষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন, স্বাধীনতা ঘোষণার পর এক বৎসরেরও বেশি হয়ে গেল, এখনও তা যাওয়ার নাম নাই—বরং তাকে কায়েম করে রাখতেই আমরা ব্যস্ত। নবযুগে সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ভোটাধিকার হলে রাজনৈতিক শক্তি তো সকলেরই এসে যাবে। গান্ধীজী বলেছিলেন, আকৃতিতে কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, সমান সুযোগ দিলে হরিজনও তো বর্ণহিন্দুর মতই শিক্ষা গ্রহণ করবে। তবে কেন অতীতের এই কলঙ্কনিদর্শনকে বাঁচিয়ে রাখা? এক সময়ে কলকাতা শহরের অন্যতম প্রধান বিদ্যালয়েও ভাগ করা থাকতো জাতিভেদ অনুযায়ী ভোজনশালার ব্যবস্থা; এখন তা নাই। প্রায় বিশ বৎসর সময় লেগেছে এই দুরত্ব কাটিয়ে উঠতে। মহাত্মাজীর পথে চলতে হ'লে আমাদের তো ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে অচলায়তনের এই দুর্গটিকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া উচিত। সে শক্তিও কি আমরা জাতির তরুণদের কাছ থেকেই আশা করতে পারি না?

মহাত্মাজীর প্রিয় ছিল রবীন্দ্রনাথের 'একলা চলরে' গানটি। তিনি যে একলা চলার পথকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ ভাবে চলেছিলেন, মরণের পরও কি আমরা তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করবো না, এবং আমাদের আচরণকে তাঁর মনোমত করবার চেষ্টা করবো না? সে শিক্ষাই সার্থক, যা মুক্তির পথে নিয়ে যায়; মুক্তিসাধক মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন, আমাদের চাই এখন তাঁকে অনুসরণ করে চলার চেষ্টা।

পূজারী চারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রী দিলীপ কুমার রায়

ভারতবর্ষকে দেশমাতৃকারূপে দেখবার মন্ত্রপাঠ করেছিলেন সর্ব্বপ্রথম ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। এজন্যে তাঁকে 'ঋষি' আখ্যা দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ—দূর স্বদেশী যুগে। ১৯০৭ সালে তিনি লেখেন তাঁর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় যে অনেকে মনে করেন যে ঋষিরা জন্মেছিলেন সে-কোন্ সত্যযুগে—তারপর তাঁরা নিরস্ত হয়েছেন জন্মপরিগ্রহ করা থেকে; কিন্তু একথা ভুল কেন না আমাদের ধর্ম ও জাতি সনাতন। মেঘ এসে তাকে ঢাকতে পারে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালেরই ভাষায় বলা চলে "কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর"। ঋষি সাধু সন্ত—লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দ—আমাদের দেশের মানব-জমিতে সহজেই ফসল ফলায়ঃ আধুনিক কালে যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ক'রে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরেছিলেন ভারতমাতার দেবীমূর্ত্তিকে তা থেকে একথা আরো প্রমাণ হয়।

ঋষি বল্‌তে কিন্তু একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যে, ঋষি মানে ঠিক সাধু সদাশিব জাতীয় কোন মূর্ত্তি নয়। ঋষি হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেন একটি মহাসত্যের মহারূপ, ঘোষণা করেন নববাণী পুণ্যতীর্থের—মহতো মহীয়ান্ পথের। এ মন্ত্রের জাদুস্পর্শে আমাদের চোখের ঠুলি যায় খ'সে, আমরা দেখতে পাই জীবনের একটি অন্তর্নিহিত সার্থকতার আবির্ভাবকে—যাকে সাদা চোখে দেখা যেত না। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্ দেখিয়েছিল ভারতের এই মাতৃরূপ, জগদ্ধাত্রী রূপ—এক হাতে যাঁর অভয় শঙ্খ অন্য হাতে করাল কৃপাণঃ দুর্জনদলনী ও সজ্জন-পালিনী মূর্ত্তি।

দেশকে নানা জাতিই ভালোবেসেছে। ব্যষ্টির মন সমষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজের একটি অভিনব শক্তিকে উপলব্ধি ক'রে, নব প্রেরণা পায় নব আদর্শের পথে,

অন্তত খানিকটা ছাড়া পায় নিজের অহংবুদ্ধির সীমা থেকে। এই জন্যে দেশাত্মবোধের এত আদর সব দেশেই।

কিন্তু তবু বলব: ভারতে দেশাত্মবোধের যে পরিণতির ইঙ্গিত করেছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, সে পরিণতির ইঙ্গিত অন্যদেশের দেশপ্রেমিকরা দিতে পারেন-নি। শ্রী কৃষ্ণপ্রেম আমাকে একবার লিখেছিলেন: "After all India is India". তিনি জাতিতে ইংরেজ, কাজেই তাঁর এ মতের একটু বিশেষ মূল্য আছে। এ সূত্রে তিনি বলতে চেয়েছেন এইকথা যে ভারতের একটি মহৎ প্রবণতা মর্ত্যজীবনকে অমর্ত্যলোকের দ্বারা বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত মনে করায়। করণ-কারণ, সাধনভজন তো বটেই, এমন কি অশন বসন পর্য্যন্ত ভগবানকে নিবেদন করতে হবে। "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্—যা-ই করি না কেন মা, সবই তো তোমারি পূজা"—এই হ'ল ভারতের প্রাণের কথা। তাই দেশকেও কেবলমাত্র জন্মভূমি ব'লে সম্মান দিয়ে ভারতীয়ের মন পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করেনি। সে চেয়েছে জন্মভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" ভূমিতে উত্তীর্ণ করতে। করাটা যে কল্পনা তাও নয়। প্রতি দেশেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছে—শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন আমাকে সম্প্রতি একটি পত্রে:

"Mother India is not a piece of earth; she is a Power, a Godhead; for all nations have such a Devi supporting their separate existence and keeping it in being".

কেবল, ভারতের দৈবীপ্রেরণা এসেছে বিশ্বমাতার সাক্ষাৎ শুভদা বরদা মূর্ত্তির জ্যোতিঃস্বরূপ থেকে। আর এসেছে ব'লেই ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মধ্যে ঋষি বঙ্কিম দেখেছিলেন জগদ্ধাত্রীর ত্রয়ীরূপ—দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী:

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী—নমামি ত্বাং।

এই জন্য যাঁরা ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীতে সত্যি বিশ্বাস করেন তাঁরা বন্দেমাতরম্‌কে জাতীয় মন্ত্র সংগীত হিসেবে না নিয়ে পারেন না। (যাঁরা ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে একটা কথার কথা মনে করেন তাঁদের জন্য এ-নিবন্ধ নয়।)

দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্কিমচন্দ্রের এ-ইঙ্গিত অনুসরণ করেছিলেন তাঁর জাতীয় সংগীতে। তাই জাতীয় সংগীত-রচয়িতা হিসেবে তিনি ভারতপূজারীদের কাছে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। তাঁর কাছে "বঙ্গ আমার"—শুধু "জননী আমার" ছিল না, ছিল "দেবী আমার সাধনা আমার"। বঙ্গ আমার গান লেখার জন্য তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে ডিস্‌মিস্ করা হ'তই হ'ত, যদি না তিনি গভর্ণমেণ্টের দক্ষতম কর্মচারীদের মধ্যে গণ্য হতেন—যদি না তাঁর সততা উপরালাদের কাছে বিরল ব'লেই অভিনন্দিত

হ'ত। এ গানটির শেষে তিনি লিখেছিলেন প্রথমে "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ"। কিন্তু শ্রী লোকেন্দ্র পালিত প্রমুখ বন্ধুদের অনুরোধে তাঁকে "হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ"কে বদলে লিখতে হয় "মানুষ আমরা নহিতো মেষ"। "হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ" লিখিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে পুলিপোলাও চালান দিতো—সম্ভবত আন্দামানে। কারণ সেটা ছিল বিশেষ ক'রেই ধরপাকড়ের যুগ।

কথাটির উল্লেখ করলাম শুধু দেখাতে, দেশকে দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় কী চোখে দেখত। ধর্মযুদ্ধে তিনি বিশ্বাস করতেন—দেশের জন্যে প্রয়োজন হ'লে দেহপাত তিনি ধর্ম মনে করতেন। তাই লিখেছিলেন: "দুঃখ সে দেশের নয় যে দেশের বীর মরে, দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।" বিপ্লববাদীদের বীর্য্যের কথা বল্‌তে তাঁর চোখ জলে উঠত। আজকাল ক্রমাগত একটি কথা শোনা যায়—দেশ স্বাধীন হয়েছে অহিংস অসহযোগে। বিপ্লবীদের আত্মদানের কথা ভুলে মানুষ একটা শ্লোকে জপ করতে করতে তাকেই সার মনে ক'রে ব'সে আছে। বোমার যুগে বিপ্লবীরা দলে দলে আত্মদান না করলে এবং এ যুগেও সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ সঞ্চারিত না হ'লে যে দেশ এত শীঘ্র স্বাধীন হ'ত না—একথা একটু নিঃস্পৃহ ভাবে ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল একথা বুঝতেন, তাই লিখেছিলেন যেতে হবে "মহা আহ্বানে—মায়ের চরণে প্রাণ বলিদানে।"

কিন্তু বিপ্লবের প্রতি যে সহানুভূতি তিনি অনুভব করতেন তার মূলে ছিল তাঁর হৃদয়ের একটি অসামান্য প্রবণতা। সে ভক্তি। ভক্তি ও প্রেম ছিল তাঁর চরিত্রের সহজাত কবচকুণ্ডল। (এ কথা আমি আমার "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" বইটিতে দেখিয়েছি।) তাজেই এ হেন মানুষ দেশকে ভালোবাসবার সময়েও যে তেমনিই গভীর একাত্মবোধ হইবে এ আর বিচিত্র কি?

তাঁর স্বপ্ন তাই দেশমাতৃকাকে নিয়ে বাঁধল গানের পর গান, সাধল স্তবের পর স্তব। শরৎচন্দ্র একবার বলেছিলেন একটি বড় সত্য কথা যে, দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যু না হ'লে তিনি আরও কত অনুপম জাতীয়-সংগীত, ভক্তি-সংগীত রচনা করতেন! আমাদের দেশের মস্ত দুর্ভাগ্য যে এ-যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের মতন এমন অপরূপ কবিকণ্ঠ অকালেই নীরব হ'ল। তবু তাঁর সুর বাজে আমাদের হৃদয়ের তারে অবিস্মরণীয় ঝঙ্কারে, কখনো বা স্বপ্নের স্নিগ্ধ সুরভিত হিল্লোলে:

> এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
> সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

কখনও বা ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্লাবনে:

> ভারত আমার ভারত আমার! যেখানে মানব মেলিল নেত্র
> মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।

কখনো বা বীর্য্যের বিস্ফারিত ডমরু ডোলে, যখন গাইলেন তিনি সংস্কৃত ছন্দভংগীতে :

"ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া
যখন বিপন্না জননী জায়া ?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে
চল সমরে দিব জীবন ঢালি'
জয় মা ভারত ! জয় মা কালী !

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মনে প্রাণে পূজারী, তাই তিনি এভাবে জন্মভূমি ও কালীকে সমাসনে বসাতে পেরেছিলেন। এইখানেই তাঁর প্রাণের কথাটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তিনি যে দেখতে পেয়েছিলেন ভারত শুধু আমাদের অন্নদাত্রী নয়, ভারত আমাদের :

'কর্মজ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।'

তাই না তিনি গাইলেন শেষ জীবনে ভারতকে জগজ্জননী ব'লে চাক্ষুষ ক'রে :

"ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ
গাইল জয় মা জগন্মোহিনী ! জগজ্জননী ভারতবর্ষ !"

এপারে কেবল সেই মানুষ যে শুধু দেশপ্রেমিক নয়, দেশের পূজারী ! কিন্তু শুধু পূজারী নয় তাই ব'লে। ভক্ত হ'লেই যে তাকে কবি বলা চলবে এ একটা কথাই নয়। বিগত শতকে একজন খাঁটী ভক্ত লিখেছিলেন

শ্যামাপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তে ছিল
কলুষের কু-বাতাস লেগে গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।

উপমাটি সুপ্রযুক্ত হয়নি বলব না কিন্তু কবিত্বের ভরাডুবি থেকে বাঁচতে হলে এ-ধরণের ধ্বনি ও ভাবানুষঙ্গ বর্জন করতেই হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বদেশ সঙ্গীতে ধ্বনি ও ভাবের অপরূপ সৌষম্য সাধন করেছিলেন তাঁর কবিত্বের সহজ রসায়নে। তাই না তিনি কবি। শুধু ভক্ত পূজারী হ'লে লিখতে পারা যায় বড়জোর রামমোহনের মতন :

মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর ;
অন্যে কথা কইবে শুধু তুমি রবে নিরুত্তর !

কিন্তু কেবল প্রথম শ্রেণীর কবি হ'লেই মরা সম্বন্ধে এমন গান লেখা যায় :—

জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল
এখন যদি সাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চল।
সিন্ধু পরে গর্জ্জে ঢেউ সে দণ্ডমাত্র নয়কো স্থির
নীচে প'ড়ে আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর।

স্বভাব কবি ও স্বভাব-সুরকার ছিলেন তিনি আশৈশব। তাই মাত্র বার বৎসর বয়সে চাঁদ দেখে গান বেঁধে সুর দিয়ে গাইতেন তাঁর উদাত্ত ললিত কণ্ঠেঃ

গগনভূষণ তুমি জনগণমনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীল নভোবিহারী!
হেসে হেসে ভেসে ভেসে চ'লে যাও কোন দেশে
চারিধারে তারাহারে রহে ঘিরে সারি সারি।

এই কবিত্ব তাঁর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুক্লপক্ষের চাঁদের মতন পূর্ণকায় হয়ে উঠেছিল, যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদু মন্থর আবেশভারাক্রান্ত নহে তাহা কবি দেখাইয়াছেন।"

জাতীয় সঙ্গীতে এই গতিশক্তি আমাদের চমকে দেয় তার ক্ষণে ক্ষণে ছন্দ বদলে। যথা,

[সেথা] গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে জয় গৌরব জিনি',
[সেথা] গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে,
মথিতে অমর-মরণ-সিন্ধু আজি গিয়াছেন তিনি।
সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির।
উঠ বীর-জায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ-অশ্রুনীর॥

এখানে পাই দার্ঢ্য—মরণকে জয় করার দুঃসাহস। তার পরেই রণরঙ্গে মরণের সঙ্গে দ্বৈরথ;

[সেথা] নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন সে-ভীম সমর মাঝে,
[সেথা] রুধির-রক্ত-অসিত অঙ্গে
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়বাদ্য বাজে।

আলোয়-ছায়ায়, বাদলে-কিরণে, সম্পদে-বিপদে গ'ড়ে ওঠে যে অকুতোভয় জীবনলীলা, দ্বিজেন্দ্রলাল একটি মাত্র চরণের কবিত্বে উদ্‌ঘাটন করলেন:

গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়বাদ্য বাজে।

তার পরে? আরো আছে—এখানেই শেষ নয়:

[সেথা] গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রু-নিমন্ত্রণে
[সেথা] বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়
ভ্রূকুটির সহ গর্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে।

তারপরেই ভাবের রূপান্তর—কঠিন থেকে কোমলে কিন্তু সেন্টিমেণ্টাল কারুণ্য নয়—আত্মসমাহিত বীতশোক কারুণ্য :

[সেথা] গিয়াছেন তিনি সে-মহা-আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা,
[হেথা] হয়ত ফিরিবে জিনিয়া সমর,
হয়তো মরিয়া হইবে অমর,
সে-মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থোক্তি করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তির স্বকীয়তা সম্বন্ধে।

কিন্তু তবু বলব দ্বিজেন্দ্রলালের কবিশক্তির প্রতি বাঙালী এ পর্যন্ত সুবিচার করেনি—যে কথা দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় স্বীকার করেছেন। কারণ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, বেশী ফলোদয় হবে তাঁর কবিগরিমার দিকে কাব্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। তাঁর কবিত্বের নানামুখী প্রবণতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যান এ-নিবন্ধের পরিধি-বহির্ভূত। আমি শুধু তাঁর জাতীয় সঙ্গীতের কবিত্ব ও স্বকীয়তা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা ব'লে ইতি করব।

আমাদের দেশে জাতীয় সঙ্গীতের আদিম মন্ত্রদাতা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, একথা বলেছি প্রথমেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে স্বপ্ন, তথা নব-সাহিত্যসৃজন প্রতিভা ছিল বঙ্কিমোত্তর যুগে একাধিক কবিনেত্রে ও কবিহৃদয়ে মূর্ত হয়ে উঠলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে ওজঃশক্তি ছিল তা দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যে ভাবে সংক্রমিত হয়েছিল সে ভাবে সংক্রমিত হয়নি আর কোনো বাঙালী কবির বাংলা কাব্যে। সুষমা, শিহরণ, ঝঙ্কার, কলনৃত্য ইত্যাদি কাব্যগুণ অন্য অনেক কবির কাব্যেই ফুটে উঠেছে কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দে বীর্যের ও পৌরুষের অকুতোভয় জীমূতমন্দ্র যে ভাবে নিটোল হয়ে ফুটে উঠেছে সে ভাবে আর কোন বাঙালী কবির কাব্যে ফুটে ওঠেনি বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী যুগে। আর কোনো কবির মধ্যে তাই পাই না এ দার্ঢ্য ও পৌরুষ, যা পাই ধরা যাক্, দ্বিজেন্দ্রলালের 'যেদিন সুনীল' গানে।

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ!—
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব, সে কী মা ভক্তি, সে কী মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি,
বন্দিল সবে জয় মা জননী, জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ।
গাইল: 'জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ!!

ছবির পর ছবি দেশমাতৃকার—কিন্তু কী বলিষ্ঠ ছন্দে, অতুলনীয় চিত্রাঙ্কনে:

শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট, সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জংঘা।
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার, পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কথনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে
হাসিয়া কথনো শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিথিল বিশ্বে!

এর পাশাপাশি ধরা যাক্ দেশমাতৃকার স্নেহময়ী অথচ মহিমময়ী মূর্তি:

সদ্যস্নানসিক্তবসনা চিকুর সিন্ধু শীকর লিপ্ত
ললাটে গরিমা বিমল হাস্যে অমল কমল আনন দীপ্ত,
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

তারপরেই নিসর্গ চিত্র, কিন্তু মামুলি নয়—প্রতি রেখারঙের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে ফটোগ্রাফারের পর্যবেক্ষণ নয়, ধ্যানীর প্রেমদৃষ্টি:

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে চুম্বি' তোমার চরণপ্রান্ত।
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয় সলিল বৃষ্টি
চরণে তোমার কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি।

পরিশেষে দেশমাতৃকার আনন্দ বেদনা হ'য়ে উঠল বটে জন্মদাত্রীর আনন্দ বেদনা, কিন্তু সেই সঙ্গে মা হ'য়ে উঠলেন জননী দেবী—অতিমানবী—বঙ্কিমচন্দ্রের ট্রিনিটি দুর্গাকমলাবাণী

জননী! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি
হস্তে তোমার বিতর অন্ন চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননী! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ
জগৎপালিনী! জগৎতারিণী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ।

বন্দেমাতরমের পরে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গণ্য হ'তে পারে কেবল দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানটি কিংবা "ভারত আমার" গানটি।

দেশকে দুটি দৃষ্টি নিয়ে দেখা যায়। প্রথম: স্বভাষার দেশ—স্বজাতির দেশ—যেখানে আবাল্য গ'ড়ে উঠেছি নিজেদের জাতীয় গুণাগুণের আবহাওয়ায়—যে দেশকে অন্য সব দেশের চেয়ে বেশী চিনি, বেশী বুঝি ও বেশী ভালবাসি। অন্য দৃষ্টি দেখায় দেশের নিহিত রূপ, তার স্বকীয় সংস্কৃতি, বিশিষ্ট অবদান, জন্মজন্মান্তরের ঐতিহ্য। ভারত মূলতঃ আধ্যাত্মিকতার দেশ, ধর্মের দেশ, যেখানে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিঘোষণে: "সত্যন্তু মে রক্ষ্যতমং ন রাজ্যম্—সত্যই আমার কাছে রক্ষণীয়তম, রাজ্য নয়।" যাঁরা ভারতবর্ষের এ আত্মিক সত্যের প্রতি শ্রদ্ধালু নন তাঁদের জন্যে এ প্রবন্ধ নয়, একথা পূর্বেই বলেছি। এখানে শুধু আর এইটুকু বলব যে তাঁদের

জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম নয়, বিবেকানন্দের কর্ম নয়, শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় পূজা-সঙ্গীত নয়। উপনিষদে বলেছে, বেশীর ভাগ লোকের দৃষ্টি বহির্মুখী, কেবল কয়েকজন "আবৃতচক্ষু" অমৃত-সন্ধান ব্রতে আত্মোত্তীর্ণ হ'য়ে থাকেন। এখানে আবৃতচক্ষু-র অর্থ দৃষ্টিকে সংহরণ ক'রে অন্তরের দিকে ফেরানো—যাকে ইংরেজি দার্শনিক পরিভাষায় বলা যায় introvert হওয়া। সব সত্যদৃষ্টিই হ'ল গভীরের দৃষ্টি—এই দৃষ্টি ছিল ব'লেই দ্বিজেন্দ্রলাল দেখতে পেরেছিলেন যে বিশ্বলীলা বিশ্বধারার প্রতীক :

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, ? এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা।
মন্দির তোমার কী গড়িব মাগো, মন্দির যাহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী তারা রবি
সাগর নির্ঝর ভূধর অটবী
নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন, তরু, লতা, ফল, ফুল মধুরিমা।

সে দৃষ্টির অঞ্জন প'রেই তিনি দেখতে পান যে, আমাদের জাতীয় দৈন্য রূঢ়, অকাট্য বাস্তব হ'লেও ভারতে এ দৈন্যের ছোঁওয়া লাগেনি—জলসংপৃক্ত পদ্মের মতনই আত্মা তার নির্লিপ্ত। তাই তিনি গেয়েছিলেন প্রেমিক কবির সুরে :

তুমি তো মা সেই তুমি তো মা সেই চির গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা!
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব গরিমা।

এইই হ'ল দ্রষ্টার দৃষ্টি, ওরফে প্রেমের দৃষ্টি, যে বাইরের বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে "আবৃত-চক্ষু" হ'য়ে আন্তর সত্যকেই করে অঙ্গীকার। তাই না সে দেখতে পায় যে দেশ শুধু বস্তুপিণ্ডের সমষ্টি নয়, যেখানে দেহ পায় শুধু তার বাস্তব ক্ষুধার খোরাক। সে দেখে দেশের মধ্যে সেই অমৃত মন্দাকিনীর চিরন্তনী ধারা যাকে সে বলতে পারে :

দেবী আমার সাধনা আমার, স্বর্গ আমার আমার দেশ!

কিন্তু এখানেও প্রেমের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ নয়। দেবী ব'লে স্বদেশকে চিনতে পারার মধ্যে দিয়ে হয় দৃষ্টি-আরোহিণীর সুরু। এর সারা হ'ল দেশের সেবা, আত্মদানে যার পরম পরিচিতি মেলে, তাঁর জীবনান্তের সময়ে শেষ দেশাত্মবোধের গানে যে গানটি ছিল সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে প্রিয় গান :

ভারত আমার! ভারত আমার! সকল মহিমা হোক খর্ব
দুঃখ কী যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব?
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ-মানব বংশ
যাদের গরিমাময় এ-অতীত, তাদের কখনো হবে না ধ্বংস।
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ
এ-দেবভূমির প্রতি তৃণপরে আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।

তাই বলছিলাম ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে আবৃতচক্ষুর দৃষ্টিতে দেখে দেশকে চিনেছিলেন সর্বদেবময়ী মূর্তিতে, তাঁর পরে সে-দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী যুগে পূজারী-চারণ-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল।

ইংরেজি শিক্ষা

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ গুপ্ত
(প্রাক্তন সম্পাদক)

বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যতগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তার মধ্যে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার স্থান নির্ণয় করা একটি। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার গত সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজির স্থান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে; কিন্তু গুরুত্বের দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে—অন্ততঃ সেই বিদ্যায়তনের পক্ষে যেখানে সর্বপ্রথম ইংরেজি শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং সেই প্রদেশের পক্ষে যেখানে এখন পর্যন্ত ইংরেজি-শিক্ষিতদের সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্য যে কোনও প্রদেশের চাইতে বেশি।

ইংরেজি শিক্ষার স্থান নিয়ে সম্প্রতি আলোচনা হয়েছে প্রচুর। এ বিষয়ে চিন্তাশীল সমালোচকদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) যাঁরা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী, (খ) যাঁরা ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে এবং (গ) যাঁরা এই দুই দলের মধ্যগা। প্রথমে দেখা যাক্, ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তিগুলি কি এবং সেগুলি কতটা যুক্তিযুক্ত।

প্রথম আপত্তি দেখানো হয় এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের মূলে বিদেশী শাসকবর্গের উদ্দেশ্য নিয়ে। এদেশীয়দের কাজ-চালানো গোছের ইংরেজি শিখিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা করার উদ্দেশ্যে বিদেশী শাসকগণ এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত করেছিলো, একথা হয়ত সত্যি। কিন্তু একশ'-পঁচিশ বছর আগেকার ভারতবর্ষের অবস্থা নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লর্ড মেকলের অসহনীয় কটূক্তির মধ্যেও অন্ততঃ কিছুটা সত্যের সন্ধান মেলে! তা ছাড়া মান্‌রো, এলফিনষ্টোন—এঁদের দৃষ্টি কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা করার দিকেই ছিল একথা মেনে নিলেও ভারতের তদানীন্তন চিন্তানায়ক এবং সমাজ-হিতৈষণার পুরোধা রাজা রামমোহন, স্যার সৈয়দ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের ইংরেজি শিক্ষার অনুকূলে মত প্রকাশের মূলে যে অন্ততঃ ঐ উদ্দেশ্য ছিল না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সরকারী কর্মচারিদের প্রচেষ্টাতেই হোক, কিংবা এই সকল চিন্তানায়কদের আগ্রহেই হোক, ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে তখনকার এই আনুকূল্য প্রদর্শন ইংলণ্ডের ইতিহাসে হুইটবির ধর্মসভায় রাজা অসইএর রোমান ধর্মমতের পক্ষে রায়দানের সংগে তুলনীয়।

তা'ছাড়া, বিদেশী শাসকগণ ইংরেজি শিক্ষা যে উদ্দেশ্যেই প্রচলিত করে থাকুন, এই ব্যবস্থায় কে অধিকতর লাভবান হয়েছে, সেইটেই বিবেচনার যোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয় ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের দরুণ আমাদের ছাত্রজীবনের কর্মশক্তির যথেষ্ট অপচয় হয়েছে। কিন্তু এই প্রসংগে একথাও চিন্তা করা উচিত, একশ'-পঁচিশ বছর আগে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন পন্থা ছিল কি না। একমাত্র গীতিকবিতা এবং কিছু গাথা এবং পদাবলী ছাড়া তখন আধুনিক ভারতীয় ভাষার অন্য কোন পরিচয় ছিল না। তাই ইংরেজিকে মাধ্যম করা ভিন্ন তখন অন্য পথ খোলা ছিল না।

বলা যেতে পারে, এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ঠিক যে স্তরে এসে পৌঁছলে একটি ভাষা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রের চাহিদা মেটাতে পারে, সে স্তরে আমাদের কোনও ভাষা পৌঁছেছে কি? পঁয়ত্রিশটি ভারতীয় ভাষার মধ্যে একটি ভাষাও কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষাদানের পক্ষে যথেষ্ট সম্পদশালী? বিদেশী ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি অনুবাদ করে এই অভাব মেটানোর উপায় দেখানো হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এই উপায়কে ইংরেজি প্রবাদবাক্য 'ঘোড়ার সামনে গাড়ি রাখা'র মতন মনে হবে। প্রথমতঃ, রাতারাতি কোন ভাষা অনুবাদের সাহায্যে সমৃদ্ধিশালিনী হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে সমর্থ হলেও মৌলিক ভাবধারার পরিপুষ্টি সাধনের দিক থেকে অনুবাদ একেবারে অচল। তৃতীয়তঃ, বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলির শব্দ-সম্ভার আধুনিক বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের অনুবাদের পক্ষে অপ্রতুল।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। ১৯১৮ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু ভাষার মারফৎ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঐ ভাষায় যথাযোগ্য শব্দ-সম্ভার এবং পুস্তকাবলীর অভাবের দরুণ একটি অনুবাদ-সমিতি নিযুক্ত করা হয়। মোটামুটিভাবে কাজ চালানোর জন্যে প্রায় ৪০০ বই ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়। এর জন্য আরবী-পার্শী ভাষার সাহায্যে ৬৪,০০০ (চৌষট্টি হাজার) নতুন শব্দ গঠন করতে হয়। ফল দাঁড়ালো, যখন বইগুলি প্রকাশিত হল তখন সেগুলি একেবারে দুর্বোধ্য দেখা গেল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নেই? নিশ্চয়ই আছে, তবে রাতারাতি ইংরেজি বর্জন করে নয়, ইংরেজির সংগে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যলাভ করেছে। কিন্তু ঠিক এই শিক্ষাই একশ' বছর আগে ইংরেজির মারফৎ গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। এর প্রধান কারণ ছিল ভারতীয় ভাষাগুলির দারিদ্র্য। ইংরেজি ভাষার সংগে যোগাযোগ থাকার দরুণই আজ ভারতীয় ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাদান সফল হয়েছে। এইটি মাত্র প্রথম স্তর। ভবিষ্যতে ইংরেজির সংগে যোগাযোগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার পক্ষেও আমাদের ভাষাগুলি স্বাবলম্বী হবে আশা করা যায়। সেই সুদিন যতদিন না আসে ততদিন ইংরেজি ভাষার মারফৎই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

এই প্রসংগে আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন ভাষাই আধুনিক জ্ঞানের সমস্ত চাহিদা মেটানোর মত শব্দের দাবী করতে পারে না। ভারতীয় ভাষার দারিদ্র্য এই দিক থেকে অত্যন্ত বেশি। এটা লক্ষ্য রাখা দরকার আধুনিক বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের যে সব শব্দের সহজবোধ্য সরল অনুবাদ ভারতীয় ভাষায় নেই কিংবা করা শক্ত, সে-সব শব্দের অনুবাদের চেষ্টা না করে সেগুলি ইংরেজি আকারে গ্রহণ করাই সমীচীন। নতুবা, অনেক সহজবোধ্য ইংরেজি শব্দ অনুবাদের ফলে দুর্বোধ্য হয়ে পড়বে। এতে শিক্ষার্থীর শক্তির অপচয় ঘটবে একদিকে, অন্যদিকে ভাষার সাবলীল গতিও অবরুদ্ধ হবে। বার্নার্ড শ-র মতে এই ধরনের শব্দগুলি অন্ততঃ যদি পৃথিবীর সর্বত্র একই আকারে চালু হয় তবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ সুগম হবে। 'কন্‌ফিডেনশ্যাল্ ক্লার্ক'-এর অনুবাদ 'আপ্ত করণিক' করার পেছনে তপ্ত দেশপ্রেম যতই কার্যকরী হোক, এই ধরনের শব্দ রপ্ত করতে যথেষ্ট বেগ পাবার সম্ভাবনা। তাই দুর্বোধ্য নতুন শব্দ সৃষ্টি করার চেষ্টা না করে বিদেশী সহজবোধ্য শব্দ গ্রহণে বাধা দেখিনে। এতে ভাষা সমৃদ্ধিশালী হবে। বস্তুতঃ পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ইংরেজি ভাষার শব্দ-সম্ভারের মাত্র ২৫ ভাগ দেশজ। তাছাড়া, এ ব্যবস্থায় আমাদের দেশের ভিন্ন ভাষা-ভাষী অধিবাসিদের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদানের পথ যথেষ্ট সুগম হবে।

আর একটি অভিযোগ, দেড়শ' বছরের চেষ্টাতেও আমরা এ ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিনি; তাই যে ভাষা আমাদের দখলের বাইরে তাকে বর্জন করাই শ্রেয়ঃ। এই অভিযোগের মূলে সত্য আছে সামান্যই। আমাদের দেশের প্রবেশিকা শ্রেণীর যে কোনও ছাত্রের ইংরেজি কথোপকথনের জ্ঞান বিদেশের সমবয়স্ক কোনও ছাত্রের তার মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার জ্ঞানের চাইতে বেশি।

অন্যদিকে পরীক্ষা-পত্রের উত্তরগুলি বিচার করলে দেখা যাবে বিশুদ্ধ মাতৃ-ভাষার ব্যবহারে সাধারণ ছাত্রেরা ততটা পটু নয়, যতটা ইংরেজির ব্যবহারে। বলা যেতে পারে, প্রয়োজনের তাগিদেই মাতৃভাষাকে অবহেলা করে ইংরেজির বিশুদ্ধ ব্যবহারের দিকে ছাত্রদের ঝোঁক থাকে। একথা সব ক্ষেত্রে সত্যি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের ছাত্রদের পক্ষে অন্ততঃ সত্যি নয়। মাতৃভাষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষালাভের পেছনে মাত্র সেই ভাষার প্রতি আগ্রহই শিক্ষার্থীদের ঐ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের কারণ। কিন্তু অন্যদিকে, যারা ইংরেজি পড়তে যায় তাদের অনেককে মাত্র জীবিকানির্বাহের জন্যই ঐ ভাষা গ্রহণ করতে হয়, অনেক সময়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের কাছে খোঁজ করলে জানা যাবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজি নিয়েছে এমন সাধারণ ছাত্রও কেবলমাত্র বাংলাভাষার প্রতি আসক্তিবশতঃ ঐ ভাষা গ্রহণ করেছে এমন ছাত্রের চাইতে ভাষা-জ্ঞানের দিক্ দিয়ে অধিকতর অগ্রবর্তী। সুতরাং, ইংরেজি ভাষায় আমাদের ছাত্রেরা অপটু—এ কথার পেছনে সত্য আছে সামান্যই।

তাছাড়া, ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা যায় না,—এ অভিযোগের পেছনে রয়েছে ভাষা-জ্ঞানের সংগে সাহিত্য-দখলের প্রভেদবোধের অভাব। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদই এর জন্য দায়ী। আমরা যে পরিমাণে সাহিত্যিক হতে চাই, সে পরিমাণে ভাষা-জ্ঞানী হতে চাই নে। তাই ইংরেজি জানতে গিয়ে আমরা চাই বার্ক-মেকলে-চার্চিলীয় ভাষা আয়ত্ত করতে। ইংরেজি শিখতে আমাদের ছাত্রজীবনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় নষ্ট হয়ে থাকে—এ অভিযোগের মূলে যদি কোন সত্যিকারের কারণ থাকে তবে তা এই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, মনোমোহন ঘোষ, গান্ধী, নেহরু প্রভৃতির ইংরেজি ভাষার দখল যে কোনও ইংরেজের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইংরেজি ভাষার মারফৎ জ্ঞানার্জনের জন্য ঐ ভাষা যতটা শেখা দরকার ততটাই যথেষ্ট।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি দেখানো হয় সেগুলি বিচারসহ নয় মোটেই। সুখের কথা, ইংরেজি-বিরোধীদের সংখ্যা অতি সামান্য। দেশের অধিকাংশ শিক্ষাব্রতী এবং রাজনৈতিকদের মত ইংরেজিকে কোনও না কোনও আকারে আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার পক্ষে। এবারে দেখা যাক্ ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে কতটা।

স্থিরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে ইংরেজি বর্জনের পক্ষে আমাদের আগ্রহের মূলে অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে ইংরেজ-জাতির প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা। কিন্তু ঝোঁকের বশে ইংরেজিকে সত্যিই যদি আমরা বর্জন করি তবে ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরাই। ইংরেজি যদি আমরা এতদিন বিদেশী শাসকবর্গের প্রচেষ্টায় শিখে থাকি তবে আজ তা শিখতে হবে জাতীয় প্রয়োজনের তাগিদে। ইংরেজি শিক্ষার সত্যিকারের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই। মোটামুটিভাবে যে সব কারণে ইংরেজির পঠন-পাঠন অপরিহার্য সেগুলি প্রথমে দেখা যাক্।

পৃথিবীর যে কোনও স্বাধীন দেশেই অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা ঐ দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়। এর কারণ প্রধানতঃ দুইটি—নিজের দেশ ছাড়া বাইরের জগতের সংগে যোগাযোগ রাখা এবং জ্ঞানার্জনের পূর্ণতা সাধন। য়ুরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। বস্তুতঃ আজকের জগতে সমৃদ্ধি এবং প্রচারের দিক্ থেকে দেখতে গেলে ইংরেজির সমকক্ষ অন্য ভাষা নেই। রুশীয় ভাষা দ্রুত উন্নতিপথে অগ্রসর হলেও এখনও তা ইংরেজির সমপর্যায়ে আসতে পারে নি। স্বাধীন ভারতের পক্ষেও অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা শিখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেদিক্ থেকে সহজবোধ্য কারণেই ইংরেজি গ্রহণযোগ্য। সমগ্র পৃথিবীর ভাবধারার সংগে পরিচিত হওয়ার পক্ষে ইংরেজি শিক্ষা এতই প্রয়োজনীয় যে এক্ষেত্রে অতিশয়োক্তির সুযোগ নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে আছে, এ কথা

অনস্বীকার্য। ভারতের দ্রুত উন্নতি এবং অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্যেও ইংরেজি ভাষা অপরিহার্য।

আমরা দেখেছি, কোনও একটি বিষয়ে পূর্ণ শিক্ষালাভের পক্ষে আমাদের ভাষাগুলি যথেষ্ট ঐশ্বর্যশালী নয়। আমাদের সৌভাগ্য, দেড়শ' বছর ধরে পৃথিবীর সব-বেশি ঐশ্বর্যশালী ভাষার সংগে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের এমন কোনও দিক নেই যেদিকে ইংরেজি ভাষার গতি শেষ সীমা অবধি না পৌছেছে। স্থতরাং যে কোনও বিষয়েই পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্যে ইংরেজি শেখা একান্ত দরকার।

অনেকে বিদেশী-ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে বর্জন করে রুশীয় বা ফরাশী ভাষা পঠন-পাঠনের পক্ষপাতী। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক দিকে রুশীয় ভাষা ইংরেজির চাইতেও অগ্রগতিসম্পন্ন এবং ফরাসীভাষা ভাষা হিসাবে ইংরেজির চাইতে প্রগতিশীল। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে একশ' বছরের ওপর যে ভাষার সংগে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, তাকে পরিত্যাগ করে কোনো বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে গেলে জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে। তাছাড়া, সব মিলিয়ে বিচার করলে ইংরেজি ফরাশী বা রুশীয় ভাষা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যশালী।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, আমাদের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি এবং উন্নতির মূলে ইংরেজি-সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। অন্য দিক ছেড়ে দিলেও শুধু এই দিক থেকেই ইংরেজির সংগে আমাদের যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখা প্রয়োজন। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে বাংলাই সব-বেশি প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু বাংলা ভাষার এমন অনেক দিক্ আছে যেখানে দারিদ্র্যের চিহ্ন স্থপরিস্ফুট। ইংরেজি ভাষার সংগে ওতপ্রোত যোগ না থাকলে আমাদের সাহিত্যের এই পংগু দিক্গুলি পূর্ণ হবে না। বস্তুতঃ ইংরেজি ভাষার উন্নতির মূলেও রয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার সংগে এর যোগাযোগ। গ্যেটে বলেছেন, অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা না জানলে নিজের সাহিত্যকেই ভালভাবে জানা যায় না। স্থতরাং শুধু ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পেই ইংরেজি আজ অপরিহার্য।

একথা আমরা আজ ভুলতে বসেছি যে ইংরেজি ভাষার দৌলতেই আজ আমরা স্বাধীনতার দ্বারে পৌছতে পেরেছি। এদেশে জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ সব-আগে ইংরেজি-শিক্ষিতদের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল এবং সেই প্রদেশই স্বাধীনতা সংগ্রামে সব-বেশি অংশ গ্রহণ করেছে যে প্রদেশে ইংরেজি-শিক্ষার প্রচলন সব চেয়ে বেশি ছিল। স্থতরাং ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দাস-মনোভাবাপন্ন করেছে—এ অভিযোগের মূলে সত্য আছে সামান্য। বিদেশীরা যে উদ্দেশ্য নিয়েই এ ভাষা এদেশে প্রচলিত করে থাকুন, তাদের সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করার চাইতে তার মূলে কুঠারাঘাত করতেই অধিকতর সহযোগিতা করেছে এই ভাষা। বিশ্বের দরবারে যে ভাষায় আমরা আমাদের অভিযোগ

৪

জানিয়ে এসেছি, তাও এই ইংরেজি। তাই তথাকথিত স্বদেশিকতার মোহে পড়ে ইংরেজির পঠন-পাঠন বন্ধ করলে তা জাতীয় জীবনের আত্মহত্যার সামিল হয়ে দাঁড়াবে।

বর্তমান জগতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে ইংরেজির প্রসার লক্ষ্য করা যাবে। আজকালকার যে কোনও আন্তর্জাতিক সভার ভাষা ইংরেজি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনেও ইংরেজি ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত আন্তঃএশিয়া সম্মেলনে ইংরেজি ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও এশিয়ার কোনও দেশেরই মাতৃভাষা ইংরেজি নয়। অন্যদিকে আয়র্লাণ্ড, ক্যানাডা, আফ্রিকার অনেকাংশ প্রভৃতি দেশে মাতৃভাষার চাইতে ইংরেজির প্রভাব অনেক বেশি। উগ্র স্বদেশ প্রেমিকগণ যদি ইংরেজের ভাষা বলেই ইংরেজি বর্জন করতে চান, তবে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া অসংগত হবে না যে ইংরেজি আজ আর শুধু ইংরেজেরই ভাষা নয়; বস্তুতঃ ইংরেজি-ভাষাভাষী অন্যান্য জাতির সংগে তুলনায় ইংরেজদের সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং তাঁরা ইংরেজের ভাষা না শিখুন, মার্কিণ বা অষ্ট্রেলিয়ার ভাষা শিখতে তাঁদের আপত্তি থাকার কারণ নেই নিশ্চয়ই!

আমরা প্রথমে দেখেছি ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি দেখানো হয় তা' বিচারসহ নয়। তারপর দেখা গেল ইংরেজি শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিহার্য। এইবার দেখা যাক, আমাদের পাঠ্য তালিকার কতটা স্থান ইংরেজির জন্যে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, এবং কি উপায়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, আমরা দেখেছি ইংরেজি শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য অপরিহার্য। তবে এ কথা সর্বদা মনে রাখতে হ'বে যে, ইংরেজি ভাষা শিখবার যা কিছু প্রয়োজনীয়তা তা শুধু ঐ ভাষা মারফৎ অন্যান্য বিষয় আয়ত্ত করবার জন্যে। তার বেশি ইংরেজি জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। পরীক্ষার্থীরা যদি মাতৃভাষার মারফৎ তাদের অধীত বিষয় অধিকতর পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করতে পারে, তা'তে আপত্তি করবার কিছু নেই। জাপানে প্রবেশিকা-মানের যে কোনও ছাত্র টাউসিক পড়ত শুধু অর্থনীতি আয়ত্ত করবার জন্যই; টাউসিকের ভাষার প্রতি কোনও আগ্রহ তাদের ছিল না। শেকসপীয়ারের আলোচনা যদি আমাদের মাতৃভাষাতেই হয় তবে একদিকে সমালোচনা যেমন জোরালো হবে, অন্যদিকে তেমনি মাতৃভাষাও সমৃদ্ধ হ'বে। সুতরাং বিশুদ্ধ এবং সরল ইংরেজির জ্ঞানই ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট হবে, সাহিত্যিক সৌন্দর্য যদি আয়ত্তের বাইরে থাকে তাতে ক্ষতি নেই।

এখন প্রশ্ন ইংরেজিকে আমাদের ছাত্রজীবনে ঠিক কখন পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হবে? বাংলায় প্রাথমিক স্তরে এবং বোম্বাইএ শিক্ষার্থীর প্রথম সাত বছরের জন্য ইংরেজি পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা যদি অপরিহার্য বিবেচিত হয়, তবে শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রথম স্তরেই এই শিক্ষা প্রবর্তিত করা উচিত। বাট্রাণ্ড

রাসেল বলেন, ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থী যে রকম ভাবে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে পারে, বড় হয়ে শিক্ষা পেলে সে রকম পারে না। মহাত্মা গান্ধীও তাঁর আত্মজীবনীতে এ কথা বলেছেন, ছোটবেলা থেকে যথাযোগ্য উপায়ে শিক্ষা পেলে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীর বেগ পেতে হয় না।

একটি দৃষ্টান্তের দ্বারাও এ বিষয়টি ভালভাবে বোঝা যাবে। আমাদের পাঠ্যাবস্থার দ্বিতীয় স্তরে সংস্কৃত ভাষা শিখতে হয়। ঐ ভাষা শিখবার আগেই বহু সংস্কৃত শব্দ এবং ব্যাকরণের নিয়মাদির সংগে আমাদের পরিচয় থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংস্কৃতের বি-এর একটি ছাত্রের ঐ ভাষায় যতটা ব্যুৎপত্তি থাকে তার চেয়ে প্রবেশিকাশ্রেণীর একটি ছাত্রের ইংরেজির দখল অনেক বেশি।

সুতরাং শিক্ষার্থীর প্রথম স্তর থেকেই এ ভাষা প্রবর্তন করা উচিত। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শুধু ততটা ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন যতটা ব্যবহারিক দিক থেকে কার্যকরী বিবেচিত হবে।

আবশ্যিক ইংরেজি-শিক্ষার সংগে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন ওঠে। হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয় এই যে উর্দু এবং হিন্দির মধ্যগা হওয়ার দরুণ উর্দু এবং হিন্দিভাষী ভারতীয়দের পক্ষে এই ভাষা সহজবোধ্য এবং এর প্রসারও সব চেয়ে বেশি। কিন্তু হিন্দুস্থানী প্রধানতঃ কথ্য ভাষা ; তাছাড়া ভাষা হিসাবে এটি এখনও পূর্ণাংগ নয়, এমন কি এর কোন নির্দিষ্ট কাঠামো পর্যন্ত নেই। বাংলা, হিন্দি, উর্দু—এর কোনটিই এখনও ভারতের মত বৈষম্যময় দেশের পক্ষে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার মত প্রসার এবং সমৃদ্ধি দাবী করতে পারে না। তাছাড়া এর একটিকে রাষ্ট্রভাষা করলে ভারতের অন্যান্য চৌত্রিশটি ভাষা-ভাষীদের আর একটি নতুন ভাষা শিখতে হবে। ইংরেজিকে যখন অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে স্থান দেওয়া প্রয়োজন তখন ভারতের আন্তঃ-প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে এটিকে গ্রহণ করার বাধা দেখিনে। বৃহত্তর জগতের ঘটনাবলীর সংগে আমাদের পরিচয় এতে আরও ঘনিষ্ঠ হবে। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার দিক থেকেও এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য। এতে গণপরিষদে হিন্দি প্রশ্নের উত্তরে মালয়ালাম ভাষায় উত্তর দানের সমস্যা ঘুচবে।

ইংরেজির বিরুদ্ধে এবং ইংরেজির স্বপক্ষে—এই দুই দলের মধ্যবর্তী যাঁরা তাঁরা বলেন, ইংরেজিকে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষারূপে রাখা চলতে পারে এবং মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য—যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়—এ ভাষা পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। মাথা বাঁচিয়ে চলবার পক্ষে এই মত কার্যকরী, কিন্তু পন্থা হিসাবে নয়। প্রথমতঃ ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা না করে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা করলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কেবল ভাষা শিক্ষাতেই অধিকাংশ সময় নিয়োজিত করতে হবে। তাদের মোট চারটি ভাষা শিখতে হবে—মাতৃভাষা, ইংরাজি, রাষ্ট্রভাষা এবং সংস্কৃত বা আরবী-পার্শী। এতে শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট হবে। দ্বিতীয়তঃ, মুষ্টিমেয় ছাত্রের জন্যে

ইংরেজি শিক্ষা কি ভাবে প্রবর্তন করা হবে? তারা কি প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ইংরেজি শিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে? ছোটবেলা থেকে না শিখলে যে বিদেশীভাষা সহজবোধ্য হয় না একথা আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু ছোটবেলায় কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত ছাত্র বাছাই করা চলতে পারে? সুতরাং বাস্তবক্ষেত্রে এই মত সমর্থনযোগ্য নয়।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, ইংরেজিকে আমাদের অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসাবে বিদ্যাশিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই শিখতে হবে এবং যতদিন না আমাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার বাহন হওয়ার এবং ভারতের সমগ্র জাতির পক্ষে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার শক্তি অর্জন করছে ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের জন্য এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরেজিকে রাখাই যুক্তিযুক্ত।

ভারতীয় কবি-মানসের প্রতিভূ ও ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ *

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্)

অন্যান্য দেশের কবি-মানসের সঙ্গে ভারতীয় কবি-মানসের পার্থক্য কোথায় এবং ভারতীয় কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে তাঁর রচনায় অভিব্যক্ত করেছেন ও সেই কবি-মানসের মর্মকথা বিশ্লেষণ করেছেন, তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভারতীয় কবি-মানস যে কারণে অন্যান্য দেশের কবি-মানস থেকে পৃথক ভাবে নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে, সে কারণ হচ্ছে, তার প্রগাঢ় প্রশান্তি ও পবিত্র সৌন্দর্যবোধ, স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের প্রতি অধিক আকর্ষণ এবং ঊর্ধ্বমুখী শ্রান্তিবিহীন অভীপ্সা। পাশ্চাত্য কবি-মানসে বা প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের কবিদের মধ্যে ভারতীয় কবি-মানসের রসাবিষ্ট প্রশান্ত সৌন্দর্যবোধ এবং অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম ভাবরাশি নিয়ে অনায়াসভাবে কাব্যরচনা দেখা যায় না। ভারতীয় কবি শুধু সুন্দরের উপাসক নন, তিনি সত্য ও শিবেরও উপাসনা করেন। সেজন্যই হিংস্রতা, ক্রূরতা, বীভৎস ও ভয়ানক দৃশ্য, ভাব ও চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া ভারতীয় কবির পক্ষে অসম্ভব।

* রবীন্দ্র পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

তিনি রসসৃষ্টির সময় সুন্দর ও শোভন যা কিছু, তা নিপুণভাবে চিত্রিত করেন, রঙে রসে তাঁর রূপায়ন হয়ে ওঠে মনোজ্ঞ, কান্তিময় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুভ ও কল্যাণের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশিত হয়। নিষ্ঠুর ও গ্লানিপূর্ণ যা কিছু, সে সবের আভাসমাত্র দিয়েই ভারতীয় কবি ক্ষান্ত হন। জীবনের যে-দিকটা ঈশ্বরের দক্ষিণ মুখের পরিচয় দান করে সে-দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ; অন্য দিকটা তাঁর কাছে গৌণ।

সুরুচি ও সৌন্দর্য-বোধ প্রবল ব'লেই ভারতীয় কবি ও নাট্যকার নাটক অভিনয়ের সময় রঙ্গমঞ্চের উপর কতকগুলি বিশেষ অভিনয়-ক্রিয়া প্রদর্শন করা চলবে না, এ-রকম নির্দেশ দান করেন। হত্যা এই সব নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অন্যতম। পাশ্চাত্য কবি-মানস ভারতীয় কবি-মনের রস-বোধ থেকে কত স্বতন্ত্র এবং রসানুভূতি-সম্পন্ন, তার পরিচয় আমরা সে-দেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের রচনা থেকেই পাবো এবং তা থেকে প্রমাণিত হবে, পাশ্চাত্যের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে ভারতীয় সৌন্দর্যবোধের একটা মূল পার্থক্য আছে। শেক্সপীয়ারের নাটকে রঙ্গমঞ্চের উপরেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড, বিকলাঙ্গ দেহ প্রদর্শন, উন্মত্ত যুদ্ধক্রিয়া প্রভৃতি অসুন্দর দৃশ্যাবলী দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় কবি-মানসের প্রভাবে আমাদের মন এবং পাশ্চাত্য কবি-মানসের প্রভাবে সে অঞ্চলের রসপিপাসুর মন কী ভাবে গ'ড়ে উঠেছে তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। শেক্সপীয়ারের নাটকের হিংস্র ও ভয়ানক দৃশ্যাবলী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'তে দেখে পাশ্চাত্যের জনসাধারণ বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে, হাততালি ও উৎসাহধ্বনির অবধি থাকে না। কিন্তু আমরা রঙ্গমঞ্চে বা কাব্যপাঠকালে সামান্য রক্তপাতের দৃশ্যে বা বর্ণনায় সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ি। পৌরুষ-অভিমানীর পক্ষে এ বিচলিত ভাবকে "দুর্বলতা" ব'লে উপহাস করা সহজ কিন্তু যে সহজাত প্রশান্ত সৌন্দর্যবোধ, সরল রসপিপাসা আমাদের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ভীষণতা ও কুটিল আবর্তের পূজা অসম্ভব।

ভারতীয় কবি-মানসের এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতেও মূর্ত হয়েছে। তিনি নিজে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন, সমর্থন করেছিলেন, কাব্যসৃষ্টির সময় এই বৈশিষ্ট্যকে নিজ রচনায় পরিস্ফুট করেছিলেন। কাব্যরসের একটা সার্বজনীন দিক আছে এবং সেই দিক থেকে পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও কোনও সময়ে তিনি শেক্সপীয়ার, মিলটন ও মার্লোর রচনায় নিষ্ঠুর আনন্দের যে প্রকাশ দেখা যায়, তার সমর্থন করেন নি। কাব্যে তৈমুরলঙ্গের প্রশস্তি গান, কিম্বা নাট্যে চক্ষুরুৎপাটন তাঁর রচনায় কখনই দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, তিনি পাশ্চাত্য কবিদের বলিষ্ঠতার ছলে ক্রুরতার এই প্রকাশকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রাক্-র‍্যাফেল (Pre-Raphaelite) কবিদের মধ্যে সত্য ও শিবকে উপেক্ষা ক'রে সৌন্দর্যভোগের যে তৃষ্ণা উৎকটভাবে প্রকাশ লাভ করেছে, সে মনোবৃত্তিকেও তিনি ধিক্কার দিয়েছেন এই বলে :

"য়ুরোপের সাহিত্যে সৌন্দর্যের দোহাই দিয়া * * সংসারের যাহা কিছু প্রতিদিনের,

যাহা কিছু চারিদিকের, যাহা কিছু সাধারণ, তাহা হইতে কোনোমতে আপনাকে বাঁচাইয়া অধিকাংশ মানুষের জীবন-যাত্রাকে পদে পদে অপমান করিয়া, আশ্চর্য লিপিচাতুর্যের সহিত রঙের পর রঙ, সুরের পর সুর চড়াইয়া, সৌন্দর্যের একটি অতিদুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতিতীব্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সৌন্দর্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনি করিয়া ছিনিয়া লয় * * তবে সৌন্দর্যে ধিক থাক। এ যেন আঙুরকে দলিয়া তাহার সমস্ত কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়া কেবল তাহার মদটুকুকেই চোলাইয়া লওয়া।"

পাশ্চাত্যের কবিরা সত্যই আঙুরের মদটুকু গ্রহণ করেছেন, তার কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়ে। তার অর্থ, তাঁরা সৌন্দর্যের ভোগের দিকটাই দেখেছেন, কল্যাণের ও মহত্তর সার্থকতা যে সত্যোপলব্ধিতে, তার দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। এখানেই ভারতীয় কবি-মানস তার স্বকীয়তা রচনা করল "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"র আদর্শ প্রচার ক'রে। যে সৌন্দর্যের সঙ্গে সত্য ও শিবের বিরোধ আছে, ভারতীয় কবি কোনদিনই তাকে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে রসকেই রসের সার্থকতা মনে করেছেন। রসোপলব্ধির আনন্দই তাঁর কাছে রস-সাধনার চরমতম সিদ্ধি। কিন্তু এই আনন্দ সেই আনন্দ যা থেকে জীবসমূহের উদ্ভব ও স্থিতি এবং যাতে সকলের বিলয়। এই আনন্দ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দিকে এগিয়ে দেয়। সৌন্দর্যকে অনাসক্ত প্রশান্ত ভাবে উপভোগ করলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, এ সেই আনন্দ। পাশ্চাত্যের ভোগ-লালসায় অধীর, চঞ্চল, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব আনন্দের সঙ্গে এই আনন্দের তুলনা হয় না। যে-রস ভারতীয় কবি-মনের সাধ্য বস্তু, সে-রস স্বয়ং ভগবান; এই রসের পূজা রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধ'রে করেছিলেন। তিনি নিজেও ব'লে গেছেন :—

"সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।

তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কবি-মানসের মর্মবাণীই ব্যক্ত করেছেন, সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। তিনি ভারতীয় কবি-আত্মার বাণী-মূর্তি ছিলেন, এ-কথা অসংকোচে বলা যায়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে তাঁর যে-আকর্ষণ, যে-শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণ ঐকান্তিক অনুরাগের সঙ্গে তিনি তাঁর রচনাবলীতে ভারতের কবি-মানসের স্বরূপটি রূপায়িত করেছেন। কালিদাসকে তিনি প্রাচ্যের ভাব-ধারায় কবি-প্রতিনিধি ব'লে মনে করেছেন। তাই কাব্যে ও প্রবন্ধে কালিদাসকে নিয়ে

তিনি ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাঁর বিরাট কবি-ব্যক্তিত্ব কেবল বর্তমান ও ক্ষণিকের দিকেই দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখেনি, বার বার তিনি ভারতের সুদূর অতীতে দৃষ্টিপাত করেছেন। তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন সহজেই অতীতলোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আদর্শ ও কাব্য-পরিবেশ, জীবন-যাত্রার মর্মার্থ, সবদিক দিয়েই অতীতের মূল্য কবি-গুরুর কাছে বেশি। "চৈতালী" কাব্যে প্রাচীন ভারতের প্রতি তাঁর বিপুল শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে :—

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধত ললাট;
স্পর্ধিছে অম্বর-তল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্ঝনা আর ধনুর টংকারে,
বীণার সঙ্গীত আর নূপুর ঝংকারে,
বন্দীর বন্দনা-রবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জে, বিজয়-উল্লাসে,
রথের ঘর্ঘর-মন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্বাত কর্মকলরোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ-মহিমা।

কালিদাসের কালজয়ী প্রতিভাকে তিনি এই ব'লে বন্দনা করেছেন :

আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি' উমাপতি ভূমানন্দ-ভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গ-রবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনা-গান,—গীতিসমাপনে
কর্ণ হ'তে বর্হ খুলি' স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া'পরে।

কালিদাস-বর্ণিত কুমার-সম্ভবের চিত্রের উপরও কবি মুগ্ধ দৃষ্টিপাত করেছেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের তথা প্রাচীন ভারতীয় কাব্যের প্রভাব অসামান্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রভাবিত হয়ে ক্ষান্ত হন নি, কালিদাসের প্রশস্তি রচনা ক'রে

কর্তব্য সাঙ্গ করেন নি। তিনি প্রাচীন ভারতের কবি-চিত্তে যে-সব সৌন্দর্য-মুগ্ধ কল্পনা স্বপ্নিল মোহ সঞ্চার করত, সেই কল্পনারাশির রক্তিম রাগে তাঁর কাব্যকুঞ্জ রঙিন ক'রে তুলেছেন। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের বর্ণনা, কল্পনা, প্রাচীন চিত্র, তাঁর মোহিনী মায়ায় শক্তিময়ী লেখনীর যাদুস্পর্শে নব সৌন্দর্যে সঞ্জীবিত হয়ে নবীন মোহ রচনা করেছে। ভারতীয় কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ স্বপ্ন-বিহ্বল মানস-লোকের অধীশ্বর ছিলেন তিনি। তাই কালিদাসের কাব্যের কোনও এক বর্ণাঢ্য চিত্র সহসা রবীন্দ্রকাব্যে নব রূপে নব ছন্দে এইভাবে রূপায়িত হল :—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
....
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্র স্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেত স্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি' দম্ভভরে।
প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।

পড়তে পড়তে সহসা কালিদাসের যুগে চলে যেতে হয়। সে-যুগের কাব্য-পরিবেশ কী অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কবি পরিস্ফুট করেছেন! "মদনভস্ম" ব্যাপারটি যে রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল, তাঁর দুটি কবিতায় তার স্পষ্ট নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন। এ-যুগে অবস্থানকালেও বর্ষার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি স্মরণ করেছেন, কালিদাসের যুগের বর্ষা ঋতুকে। সে-যুগে জনপদবধূ যে ভাবে, বর্ষা যাপন করত, এ-যুগে বর্ষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেভাবে ঋতু-উৎসব করবার জন্য তরুণী পথিক ললনাকে আহ্বান জানিয়েছেন। নব অনুরাগিণীকে হাতের কাছে ভালো সাদা কাগজ থাকা সত্ত্বেও তিনি ভূর্জপাতায় নব গীত রচনা করতে বলেছেন। মূল্যবান প্রসাধন-দ্রব্যের অভাব না থাকলেও তিনি কেশপাশ সুরভিত করবার জন্যে কেতকীকেশরকেই শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত বিবেচনা করেছেন।

কালিদাসের যুগের পরিমণ্ডলকে স্মরণ ক'রে এক রোমান্টিক বিরহ-ব্যথায় কবি আকুল হয়ে উঠেছেন :—

কোথা শিপ্রানদী তীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া ; সেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয় চাঞ্চল্য ভুলি' ভবন-শিখরে
সুপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ-মাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে ;......
এই মতো মেঘরূপে ফিরি' দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি ;......
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে একাকী জাগিয়া।
*　　*　　*　　*
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?

এই যে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যের ভাবধারাকে একান্ত আপনার ক'রে নেওয়া, তার জন্যেই রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় কবি-মানসের প্রতিভূ বলতে পারি। তাঁর উপর উপনিষদের ও কালিদাসের প্রভাব থেকে এবং তাঁর রচনায় এই দুই ভাবের প্রতিফলন থেকে এ-কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য আলোচনা ক'রে ভারতীয় কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য যে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় উপনিষদের ভাবধারা তাঁর নিজস্ব ঢঙে এই রূপ গ্রহণ করেছে :—

শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময় ; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।

এ-টি, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"—এই ঔপনিষদ মন্ত্রের প্রায়ানুবাদ। অপর এক স্থানে তিনি বলছেন:—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে—

এর সঙ্গে উপনিষদের "সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং" তুলনীয়। উপনিষদের এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত-আনন্দ ব্রহ্ম—যা সকল সীমাকে ধারণ ও পূরণ ক'রেও সকলকে অতিক্রম ক'রে গেছে— তাকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ প্রাণরূপে উপলব্ধি করেছেন। "অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং" এই ঔপনিষদ ভাব তিনি তাঁর, "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" গানে ব্যক্ত করেছেন। তিনি যখন বলেন—

সত্যে মুদে আছে দ্বিধার মাঝখানে
মৃত্যু ভেদ করি,
অমৃত পড়ে ঝরি'...

তখন কি মনে হয় না, "অসতো মা সদ্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়"? কবি তাঁর ভগবানের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন:—

কথা তারে শেষ ক'রে
পারে নাই বাঁধিতে,
গান তারে সুর দিয়ে
পারে নাই সাধিতে।

এর পশ্চাতে রয়েছে, "যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে"।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।

এর প্রেরণা হচ্ছে, "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি"।

ভারতীয় কবি-মানসের প্রতিভূ ও ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ কেবল অতীন্দ্রিয় ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব ও ব্যাখ্যাকর্তৃত্ব গ্রহণ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, রূপ-সাধনার ব্যাপারেও তিনি কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবির আদর্শ গ্রহণ করেছেন। তাঁর ঋতু-নাট্যগুলি কালিদাসের ঋতু-সংহার, মেঘদূত ও বিক্রমোর্বশীর ভাবে বহুলাংশে অনুপ্রাণিত। "চৈতালি" ও "বনবাণী" কাব্যে তাঁর যে বৃক্ষপ্রীতি দেখি, মনে হয়, কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলার প্রভাব তার উপর প্রবল। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও কালিদাসের মতোই মানবের সঙ্গে প্রকৃতির নিকট-আত্মীয়-ভাব দেখা যায়। কালিদাস

"শকুন্তলা"র চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার বৃক্ষপ্রীতির যে-পরিচয় দিয়েছেন তার কথা সকলেই জানেন। আর রবীন্দ্রনাথ নবাগত গাছের চারাদের সম্বোধন ক'রে গেয়েছেন :—

আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে
চল্ আমাদের ঘরে চল্।
*   *   *   *
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্বাদের স্পর্শ নে
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারা-জল।

ভারতীয় কবির সহানুভূতির ক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ব'লেই উদ্ভিদের সঙ্গেও আত্মীয়তা-বোধ এমনভাবে সম্ভবপর হয়েছে। পাশ্চাত্য কবিদের রচনায়, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে প্রবল বিরোধ। মানুষকে সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। প্রকৃতিকে মানুষ কোনমতেই মিত্র ভাবতে পারে না। The Message of the Forest প্রবন্ধে এ-সম্বন্ধে বলেছেন—"At the bottom of this gulf between man and Nature there is the lack of the message—ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্—know all that is, as enveloped by God"। অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতি, উভয়েই যে ভগবানের প্রকাশ, এই কথা না জানার জন্যই মানব ও প্রকৃতির মধ্যে এই ব্যবধান। ভারতের কবি-মানস আধ্যাত্মিক চেতনার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ব'লেই সেখানে, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে যে ঐক্যসেতু বিরাজমান, সেদিকে দৃষ্টি পড়তে বিলম্ব হয় নি। কাব্য-জীবনের একটা স্মরণীয় যুগে 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' রচনার কালে এ কালের কবি কালিদাস-চিত্রিত তপোবনাদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন—এর প্রকাশ কাব্যে ও বহির্জীবনে—উভয়ত্রই দৃষ্ট হয়।

প্রেমের আদর্শের ক্ষেত্রেও দেখি, রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার ও কুমারসম্ভবের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উভয়ত্রই মিলনের আগেই বিচ্ছেদের ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন এবং এই বিচ্ছেদের সার্থকতা বুঝিয়ে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন "মহৎ প্রেম মহৎ দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত"। দুঃখভোগের মধ্য দিয়েই ত্যাগধর্মে দীক্ষালাভের যে-ইঙ্গিত কালিদাস দিয়েছিলেন, বাসনার খাদ পুড়িয়ে শুদ্ধ প্রেমের যে-আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর "তপতী" ও "চিত্রাঙ্গদা" নাটকে সেই আদর্শই অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে প্রেমের কোনও বন্ধন নাই, কোনও নিয়ম নাই; যাহা অকস্মাৎ নর-নারীকে অভিভূত করিয়া সংযম-দুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু

তাহার কাছে আত্মসমর্পন করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেব-রোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য কল্যাণাশ্রয়ী। তিনি নিজেও সৌন্দর্য ও কলাবোধের ক্ষেত্রে এই কল্যাণ আশ্রয় করে সুন্দরের সঙ্গে সত্য ও শুভের সংযোগ সাধন করেছেন। তিনি একথা আন্তরিকভাবেই বলেছেন, "স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"। সৌন্দর্যের বা সুন্দরমের সঙ্গে শিবমের যোগ হলে তবেই সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক—এই ছিল তাঁর অভিমত। সেই জন্যেই তিনি ভারতীয় কবি-মানসের যথার্থ প্রতিভূ ও সার্থক ব্যাখ্যাতা।

ভারতের মুক্তি-সাধনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অবদান

(দ্বিতীয় পর্যায়)

ভারত আজ তার হৃত স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। ইতিহাসের ক্লান্তিহীন অভিযানে এ'টি এক যুগান্তকারী ঘটনা। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সঞ্চিত ক্ষোভ যে আন্দোলনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, সে আন্দোলন অবশেষে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এই আন্দোলনের পিছনে রয়েছে অবিচলিত নিষ্ঠা, কঠোর সংকল্প, নিঃস্বার্থ ত্যাগ, জ্বলন্ত দেশপ্রীতি, ও নিরলস কর্মযজ্ঞের কাহিনী। তার স্মৃতি আমাদের মনে চিরজাগরূক হয়ে থাকবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক যাঁরা জাতীয় মুক্তি-সাধনার সাধক ছিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং প্রতিকৃতি ধারাবাহিক ভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। এই পরিকল্পনার এটি দ্বিতীয় পর্যায়। যাঁরা প্রতিকৃতি ও তথ্যাদি দ্বারা আমাদের প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছেন তাঁদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সকলের অকুণ্ঠিত সহযোগিতা ব্যতীত এই সুদীর্ঘ কাহিনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। পাঠকদের আমরা সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমরা স্মরণ করতে চাই এমন অনেক কর্মী যাঁদের দেশপ্রেম ও আত্মাহুতির কথা আজ বিস্মৃতির পথে; তাঁদের প্রতিকৃতি ও রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় যদি পাঠকদের জানা থাকে, অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়ে বাধিত করবেন। —সম্পাদক।

রমেশচন্দ্র দত্ত

জন্ম—১৮৪৮, মৃত্যু—১৯০৯-এর নভেম্বর। ক'লকাতার বিখ্যাত রামবাগানের দত্ত বংশে এঁর জন্ম হয়। ১৮৬৬ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইনি এফ, এ, পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ইনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৮৬৮ সনে বিহারীলাল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্ত একসঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলেত যান ; ১৮৬৯ সনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রমেশচন্দ্র বাংলা দেশেই কাজে নিযুক্ত হন। বাংলা দেশে ইনিই সর্ব প্রথম বিভাগীয় কমিশনারের পদ লাভ করেন। রাজকার্যের সঙ্গে সঙ্গে ইনি বরাবরই দেশের সেবা, সাহিত্যসেবা করে গিয়েছেন।

১৮৯৭ সনে অবসর গ্রহণের পর '৯৯ সনে তিনি লক্ষ্মৌ কংগ্রেসের সভাপতি হন। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের সেবা করে গিয়েছেন। বঙ্কিমের নির্দেশে তিনি বাংলায় লিখতে সুরু করেন। তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ভারতবাসীর ও বাঙ্গালীর জীবনের নানা ধারার পরিচয় আমরা পাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় পাশ্চাত্য ধরণে মানুষ হ'লেও দেশপ্রেমের অনির্বাণ অগ্নিশিখা ও প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁকে শত কাজের মধ্যেও দেশসেবার প্রেরণা জুগিয়েছে। স্বদেশের প্রতি টান, তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জন্য গৌরববোধ তাঁর রচনার বিশিষ্ট লক্ষণ। দেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজি শিক্ষা ও ভারতের প্রাচীন শিক্ষা এই দুই ধারার সমন্বয়ে মনুষ্যত্বের যে সৌধ গড়ে উঠবে তাই আনবে এ দেশের প্রকৃত কল্যাণ। আমাদের দেশের স্থিরবুদ্ধি প্রবীণ নেতাদের মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন।

রাজকার্যে নিযুক্ত থেকেও তিনি তাঁর Economic History of British India বইয়ে ভারতে ইংরেজের অর্থনীতির স্বরূপটি সকলের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। ইংরেজ কেমন করে ভারতের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করেছে, সে যুগে তার এমন স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা তাঁর গভীর বিচক্ষণতা ও সৎসাহসের পরিচয় দেয়। ভারতের মুক্তিসাধনায় এ'টি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। রবীন্দ্রনাথের কথায়, রমেশচন্দ্রের চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার সম্মিলন ছিল। সেইজন্য তিনি আজীবন সংযত ভাবে দেশের ও দেশবাসীর সেবা করে গেছেন।

আনন্দমোহন বসু

জন্ম—১৮৪৭ ; মৃত্যু—১৯০৬। ময়মনসিংহে এঁর জন্ম হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইনি এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষা পাশ করেন এবং সব পরীক্ষায়ই ইনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইনি বিলেত যাওয়ার আগে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। তিন বৎসর কেম্ব্রিজে পড়ার পর ইনি গণিতে র‍্যাংলার উপাধি পান। আমাদের দেশে ইনিই প্রথম র‍্যাংলার—তখনকার দিনে আনন্দমোহনের নাম এজন্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গৌরবভরে স্মরণ করা হ'ত। তারপর ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে এসে ইনি আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেন। কিন্তু শুধু নিজের ব্যবসায়ের মধ্যেই এঁর কর্মের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের ও জাতির কল্যাণকর বহু কাজের সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নানারকম সংস্কার করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি পদে থেকে দেশের উন্নতির জন্য যে কঠোর পরিশ্রম তিনি করেন তাতেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ভারতের জাতীয় অন্দোলনের সঙ্গে, বিশেষতঃ বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ কেউ ভুলতে পারবে না। ১৮৯৮ সনে মাদ্রাজ কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর প্রথম রাখীবন্ধনের দিনে সার্কুলার রোডে ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপনার জন্য যে সভা আহূত হয় তাতে রোগজীর্ণ আনন্দমোহনকে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মুমূর্ষু দেশপ্রেমিকের সেই ওজস্বিনী বক্তৃতাটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পড়ে দেন, দুর্বল আনন্দমোহনের পক্ষে পড়া সম্ভব হয় নি। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল্-এরও ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

বাংলার নব জাগরণের সন্ধিক্ষণে যে সব মনীষী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙ্গালীর চিত্তে আলোড়ন তুলেছিলেন, আনন্দমোহন তাঁদেরই একজন। বাংলাদেশের বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর শেষ বক্তৃতাটি পরাধীনতার জন্য তাঁর গভীর গ্লানিবোধ, দেশের জন্য অকৃত্রিম টান ও জাতির কল্যাণের জন্য তাঁর অসীম ব্যাকুলতার পরিচয় দেয় অক্ষরে অক্ষরে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম সেবক চলে গেলেন।

রাসবিহারী ঘোষ

জন্ম—২৩ ডিসেম্বর, ১৮৪৫; মৃত্যু—২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১। পিতা—৺জগদ্বন্ধু ঘোষ। জন্মস্থান—বর্ধমান জেলার তোরকাণা গ্রাম।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে রাসবিহারী বরাবরই অধ্যবসায়ী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি ১৮৬৭ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি বি, এল, পাশ করেন ও উকিল হিসাবে হাইকোর্টে যোগ দেন। যেমন অধ্যয়নে তেমনই আইন-ব্যবসায়ে ও আইন-অধ্যাপনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

ওকালতি আরম্ভ করেও তিনি আইন-শাস্ত্রের চর্চা ছাড়েন নাই। ক্রমে আইন বিষয়ে তিনি অসামান্য জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁর নামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গভীর পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির জন্য এক দিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সব ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁর ডাক পড়ে তেমনই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদেও আইন প্রণয়নের কাজে সাহায্য করবার জন্য তাঁর ডাক পড়ে। ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে তিনি যা পড়ান তাই পরে 'ব্রিটিশ ভারতের বন্ধকী-আইন' নামে আইন বই হিসাবে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গভঙ্গের পর তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে আকৃষ্ট হন ও কংগ্রেসে ঢোকেন। এই সময়ে লর্ড কার্জন প্রকাশ্য সভায় ভারতবাসীদের প্রতি অত্যন্ত অশিষ্ট উক্তি করেন। তার প্রতিবাদে যে বিরাট জনসভা হয় তার সভাপতিরূপে রাসবিহারী রাজপ্রতিনিধির অশোভন ও অসঙ্গত উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯০৬ সালের ক'লকাতা-কংগ্রেসে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে কাজ করেন। তখনকার রাষ্ট্রবিদ হিসাবে ইংরেজবর্জিত স্বাধীন ভারতবর্ষের কথা তিনি ভাবতে পারেন নি, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতায় মনুষ্যত্বের সর্ববিধ অধিকার দাবি করবার মত তেজস্বিতা তাঁর ছিল এবং দেশবাসীকে সেই অধিকারের যোগ্য করে তোলবার জন্য তাঁর সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষে ব্যয় করতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি। রাষ্ট্রীয় মতামতের সংযম তাঁকে দেশের গঠনমূলক কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

প্রবীণপন্থী রাষ্ট্রবিদগণের মধ্যে রাসবিহারীর প্রতিষ্ঠা বাড়ে। ১৯০৭ সালের সুরাট-কংগ্রেসের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কড়া শাসনের ফলে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে চরমপন্থী দলের উদ্ভব হয়। তাদের প্রতিবাদে সুরাট-কংগ্রেস ভেঙে যায় ও রাসবিহারী ১৯০৮ সালে পুনরায় মাদ্রাজ-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

আইনজ্ঞ বলে তাঁর যেমন নামডাক ছিল, আইন-ব্যবসায়ে তাঁর তেমনই পসারও ছিল খুব। তিনি যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন তেমনই বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, ন্যাশন্যাল কাউনসিল অব এডুকেশনে, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি দান করে গিয়েছেন। তাঁর দান না পেলে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'তে পারত না এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর দান না পেলে ন্যাশনাল কাউনসিল অব এডুকেশনের কাজ চালানও কঠিন হ'ত। অনেকেই বোধ হয় জানেন না এই ন্যাশনাল কাউনসিল অব্ এডুকেশনের সঙ্গে এখনকার যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ একদিন যুক্ত ছিল এবং রাসবিহারী এক সময়ে ন্যাশনাল কাউনসিল অব এডুকেশনের উপাধ্যক্ষ ছিলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম—৩১ মে (আনুমানিক), ১৮৬৫ ; মৃত্যু—৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে রামানন্দ জন্মভূমি বাঁকুড়া থেকে প্রধানতঃ বৃত্তির ২০৲ টাকা সম্বল করে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের নিয়ম তখন খুব কড়া ছিল। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়ে একদিন রামানন্দের জ্বর হয়েছিল। জ্বরের জন্য দিন কয়েক কলেজ কামাই হ'ল। পরের মাসে তিনি বৃত্তির টাকা আনতে গিয়ে দেখলেন ২০৲ টাকার মধ্যে ১৩৲ টাকাই কাটা গিয়েছে। তাই তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে বেতন কিছু কম শুনে এই কলেজ ছেড়ে সেখানে গিয়ে মাত্র মাসিক ৪৲ বেতনে ভর্তি হলেন। এফ্., এ, পরীক্ষাতেও তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং বি, এ, পড়বার জন্য আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি বি, এ, পরীক্ষা দেন। কিন্তু পরীক্ষা একদিন তাঁর মনের মত হয় নি বলে শেষ কয়দিন তিনি আর পরীক্ষা দেন নাই। ফলে যদিও তিনি ১৮৮৭ সনে ইংরেজী অনার্সে প্রথম হন তবু সে বৎসর তিনি পাশ করেন নাই। ১৮৮৮ সনে সিটি কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে তিনি বি, এ, তে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বাল্যকাল থেকেই রামানন্দের মনে গভীর স্বদেশপ্রেম-অঙ্কুরিত হয়। যখন তিনি বাঁকুড়ায় বাংলা স্কুলে পড়তেন তখন থেকেই পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের :

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?"

ইত্যাদি তাঁর রক্তে দোলা দিত। তাঁর শৈশবে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁর রচিত "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা" প্রভৃতি উপন্যাস এই দেশভক্ত বালককে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল বলে রামানন্দ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন।

সংস্কারমুখী তরুণ উৎসাহী মন নিয়ে রামানন্দ যে সময় ক'লকাতায় পড়তে আসেন তখন নানাদিক দিয়ে ক'লকাতায় অর্থাৎ বাংলাদেশে একটা নূতন যুগের সাড়া পড়েছে। ব্রাহ্ম-সমাজ, ছাত্র-সমাজ, কংগ্রেস সর্বত্রই তখন নবীন উৎসাহ। ছাত্রসমাজ ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে এই সময় রামানন্দের গভীর যোগ হয়। সেই অল্পবয়সেই তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের দেশহিতব্রতকে আদর্শ করেন। অবশ্য পরজীবনে শিবনাথ শাস্ত্রী অপেক্ষা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দেশহিতসাধনা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে পড়ে। যাই হোক, রামানন্দ বলতেন "দেশহিত করিতে হইলে তাঁহার মত পরিশ্রম করিতে হইবে। নেতা হইবার অনেক সোজা পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তাহাতে নেতা হওয়া যায়, বিখ্যাতও হওয়া যায় ; কিন্তু মানুষ হওয়া যায় না, প্রকৃত দেশহিতও করা যায় না।" গুরুপ্রদর্শিত এই মানুষ হওয়া ও দেশহিত করার পথ রামানন্দ অবলম্বন করেন। রামানন্দ কখনও নেতা হবার চেষ্টা করেন নি খ্যাতিও খোঁজেন নি। কিন্তু দেশহিত কর্মে, বিশেষতঃ ভারতের মুক্তি-সাধনায় তিনি আজীবন পরিশ্রম করে গিয়েছেন। তিনি কখনও সরকারী চাকরী করবেন না এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ব'লে বি, এ, পাশ করবার পর States Scholarship পেয়েও তা গ্রহণ করেন নি। প্রথম জীবনে সমাজ সংস্কার, সেবাব্রত, শিক্ষাব্রত প্রভৃতির ভিতর দিয়ে দেশহিত সাধনায় তিনি নেমেছিলেন বটে, কিন্তু শৈশব থেকেই তাঁর মনের কোণে এদেশ থেকে ইংরেজদের বিদায় করবার কল্পনা নানা ভাবে খেলত। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। বহুবার তিনি কংগ্রেসের ডেলিগেট হন ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বলবার ভার পান।

তিনি কর্মজীবনে পরে ভারতের সর্ব ক্ষেত্রের মঙ্গল প্রচেষ্টায় এমন করে আপনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন, এমন অতন্দ্র প্রহরীর মত, এমন চিরকল্যাণময়ী মাতার মত এঁর সকল স্বার্থ রক্ষা করেছেন,

সকল জাগরণের প্রদীপ জ্বালিয়ে বেড়িয়েছেন এবং সর্ব ক্ষেত্রে জাতিকে গরীয়ান করে তুলতে চেষ্টা করেছেন যে অনেকের মনে হ'ত এদেশকে বিধাতা যেন তাঁরই হাতে স'পে দিয়েছেন, তিনিই এর অভিভাবক। প্রধানত প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকার সাহায্যেই তাঁর দেশহিত সাধনার প্রকাশ হয়। তাই ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর ষাট বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেছিলেন :

"একজন ঐতিহাসিক সত্যই বলেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরে ইংলণ্ডের ইতিহাস শুধু Edinburgh Review এবং English Tory Bureaucracy-র মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। আমার অনেক সময় মনে হয় যে ভারতের গত সাড়ে-আঠারো বৎসরের ইতিহাস সত্যই মডার্ন রিভিউ এবং ভারতের বিদেশী আমলা-তন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী মাত্র। এযুদ্ধে যদি আমাদের সম্পূর্ণ জয় না হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য লোকাচার, দেশের অতীতের জের, এবং জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতাই দায়ী। মডার্ন রিভিউ সম্পাদক Edinburgh Review এর সম্পাদক হইতে কম করেন নাই।"

মডার্ন রিভিয়ু, প্রবাসী, প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকা শুধু আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধই করে নি। ভারতের জাতিগঠন কার্যে এই পত্রিকাগুলি ও তাদের সম্পাদক ব্যক্তিগত ভাবে যে সহায়তা করেছেন অর্থাৎ শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি সকল দিকে ভারতবর্ষে তিনি যে চিন্তানায়কত্বের কাজ করেছেন তাতে ভারতবাসী মুক্তির পথে অনেক অগ্রসর হতে পেরেছে। এইজন্যই সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "ভারতের জাতিগঠন কার্যে বহু জাতিগঠনকারী অপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়"।

তাঁর রচিত Towards Home Rule পুস্তকটি তখনকার রাজনৈতিক মহলে ও জনসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। India in Bondage পুস্তক প্রকাশের জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহ অপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং মোকদ্দমায় তাঁর দুই হাজার টাকা জরিমানা ও প্রায় ৫০০ খানি গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়।

রামানন্দ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বভারতীর একজন শ্রেষ্ঠ সেবক, পরামর্শদাতা ও সহায় ছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লীগ অব নেশনস কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি য়ুরোপ যান এবং তিনিই প্রথম লীগ অব নেশনসের প্রকৃত স্বরূপ ভারতবাসীকে জানান। ভারতের বহু ভ্রান্ত ধারণা এতে দূর হয়।

সত্যানন্দ বসু

জন্ম—২২ অক্টোবর, ১৮৬৬; মৃত্যু—১৯৪৮। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় সত্যানন্দবাবুর জন্ম। এঁর পৈতৃক আবাস ঢাকা জেলার মালখানগরে। লেখাপড়ায় ইনি বরাবর খুব ভাল ফল দেখিয়েছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনিই সেবার প্রথম হন। স্বনামধন্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ডাঃ এস, পি সর্বাধিকারী প্রভৃতি কলেজে এঁর সমসাময়িক। ১৮৮৭ সনে এম, এ, এবং '৮৮ সনে বি, এল, পাশ করে ইনি ক'লকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৮৯৫ সনে আইন ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে ইনি লোকহিতকর নানাকাজে আত্মনিয়োগ করেন।

কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক, নানা জনহিতকর কাজে উদ্যোগী বলেই তিনি সকলের কাছে সুপরিচিত। বঙ্গব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন বসু প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। জাতীয় ধনভাণ্ডারের ইনি কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর একসময় গান্ধীজি ও মিঃ পোলক এঁর গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। ১৯০৬ সনে ইনি কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, ১৯১১ ও ১৯১৭ সনের ক'লকাতা কংগ্রেসে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন।

সত্যানন্দ বসু

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত

রাসবিহারী ঘোষ

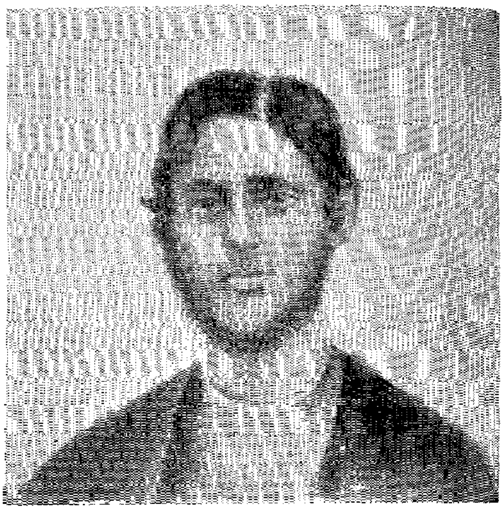

আনন্দমোহন বসু

[শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের সৌজন্যে

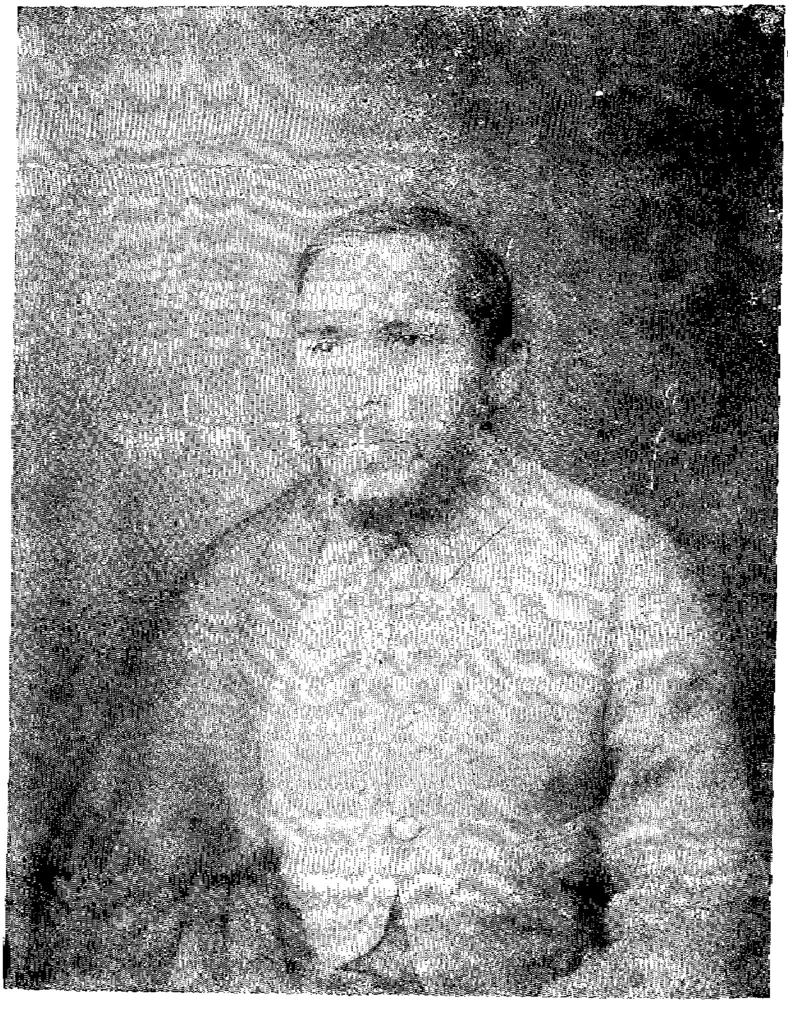

১৯০৬ থেকে '১৬ পর্যন্ত ভূপেন বসু ও ইনি দু'জনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বাইরের অনেক কাজকর্ম তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, কিন্তু নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ও যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তিনি সেক্রেটারি ছিলেন। বিশ্বভারতী, দেশবন্ধুপীঠ, রামমোহন লাইব্রেরি, মেডিকাল এইড রিসার্চ সোসাইটি, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আর তাই থেকে বোঝা যায় দেশের কল্যাণকর সবকিছু কর্মের প্রতি কি বিপুল আগ্রহ তাঁর ছিল। কুড়ি বছর ধরে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের একজন স্থায়ী ডিরেক্টার ছিলেন। এলবার্ট হল-এর তিনি ছিলেন অন্যতম ট্রাষ্টী। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন সকলেই তাঁর মহানুভবতা, অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা ও তাঁর সকল প্রচেষ্টার মূলে অবস্থিত দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন।

১৯৪৭ সনে ৪ নম্বর নন্দী ষ্ট্রীটে নিজের বাড়ীতে এঁর দেহান্ত হয়। এঁর মৃত্যুতে আমরা দেশের একজন কৃতী সন্তান হারিয়েছি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

১৯০৪ সনে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় অনার্স পেয়ে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। প্রথম জীবনে ইনি বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের পরিচালক ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাতে গড়া মানুষ ইনি। ১৯২৩ সনে উত্তর বঙ্গের বন্যার সময়ে বন্যাপীড়িতদের সেবার জন্য তিনি আচার্য রায়ের কাছ থেকে সংকট ত্রাণ সমিতির ভার হাতে নেন। ১৯২১ সনে গান্ধীজি যখন বাংলা দেশে আসেন বেঙ্গল কেমিকাল তখন সতীশবাবুর সকল চিত্ত জুড়ে রয়েছে। এমন সময় গান্ধীজির প্রভাবে তাঁর মনে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন জাগে। তিনি বারবার গান্ধীজিকে চাকরি ছাড়ার আকাঙ্ক্ষা জানান। প্রতিবারই গান্ধীজি তাঁকে নিরস্ত করেন। শেষ পর্যন্ত নিজের মনেই উত্তর পেলেন, ত্যাগের অনলে বাসনাকামনা ভস্মীভূত হ'ল, তিনি সমস্ত ছেড়ে দেশের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করলেন। গভর্ণমেন্ট তাঁর ফরমুল্যাটি কিনে নিয়ে যে টাকা তাঁকে দিয়েছিলেন সমস্তই তিনি সোদপুরে খাদি ও গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রাষ্ট গঠনকল্পে ব্যয় করেন। সতীশবাবু কর্মযোগী, তিনি আজ পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে দেশের কাজ করে যাচ্ছেন। কোনরকম পদের মোহ তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারে নি।

মহাত্মা গান্ধীর তিনি অকৃত্রিম ভক্ত, দেশের সেবা ও গান্ধীজির প্রতি অনুরাগ—এ দু'টি ধারা তাঁর জীবনে যেন গঙ্গাযমুনার মতো কর্মসাধনার সঙ্গমে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। গান্ধীজির ইচ্ছা কি করে পালন করবেন, সেই চিন্তায় তাঁর মন ভরে থাকতো। লবণ সত্যাগ্রহ, ব্যক্তিগত আইন অমান্য, ১৯৪২-এর সংগ্রাম প্রভৃতি সব আন্দোলনেই সতীশ বাবুকে সর্বদা তাঁর পাশে দেখা গিয়েছে। দেশের জন্য তিনি বহুবার কারা-বরণ করেছেন। গান্ধীজির নোয়াখালি অবস্থানের সময়টিতে তিনি একাগ্র তন্ময়তা ও কর্মশক্তির যে পরিচয় দিয়েছেন তার বুঝি তুলনা মেলে না। গান্ধীজি গ্রাম পরিক্রমায় বেরোচ্ছেন; গ্রামের রাস্তা সাফ করা, কোথায় তিনি বিশ্রাম নেবেন, কোথায় বৈঠক বসবে, তাঁর স্নান খাওয়া কোথায় হবে, সব কিছুর নিখুঁত ব্যবস্থার ভার সতীশবাবুর হাতে। গান্ধীজি একসময় বলেন যে তাঁর ভিটামিন 'বি' ট্যাবলেট খাওয়া দরকার—বৈজ্ঞানিক সতীশবাবু অমনি খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 'বি' ভিটামিনের বড়ি রোজ বাপুকে পাঠাতে লাগলেন। বাপুর সেবায় ত্রুটি হবার জো ছিল না।

১৯৪২ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সরকার তাঁকে জেলের গোশালার দায়িত্ব নিতে বললে গুটিচার মাত্র ছেলে বেছে নিয়ে তিনি গোশালার সমস্ত দায়িত্ব সানন্দে নিজের মাথায় নিলেন। কঠিন পরিশ্রম করে

নিজের বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বৈজ্ঞানিক মতে গো-পালন ও গো-দুগ্ধের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা তিনি দু'খানি বইয়ে লিপিবদ্ধ করে দেশের মহা উপকার সাধন করেছেন। গরুগুলির উন্নতি দেখে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গ্রিফিথ সাহেব তাঁর কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দেশের কল্যাণে এই কর্মযোগী আজও তপস্যানিরত। তিনি পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে সাহস সঞ্চার করার সংকল্প নিয়ে এখনও নোয়াখালিতে কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। এদিকে তাঁর খাদি প্রতিষ্ঠানের আশ্রমে শুদ্ধ খদ্দর, জমাট দুধ ও ঘি, মাখন প্রভৃতি উৎপন্ন করার দিকে তাঁর দৃষ্টি সজাগ। এই কর্মযোগী একদিকে কঠোর হাতে নিরলস কর্মী তৈয়ারী করছেন, অন্যদিকে সহকর্মীদের সঙ্গে একান্ত নিষ্ঠায় সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে দেশের কল্যাণকর কাজে নিজেকে সঁপে দিচ্ছেন।

"হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ"

অরবিন্দ কুণ্ডু
(দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান)

বর্ষবোধনের সাথে সাথেই রব উঠল—'সামাল, সামাল কালবোশেখী এলো'। আকাশ ছেয়ে গেল মেঘের নীলিমায়, নীলকণ্ঠের বিষ যেন পড়ল ছড়িয়ে চারধারে, জটাভার থেকে শোনা গেল মহানাগের অশান্ত ফোস্‌-ফোসানি, ছোবলের তীব্র ঝন্‌ঝনা,—কালান্তকের ডিমি ডিমি ডমরুর ঘায়ে অঝোরধারে নামল এসে কালবোশেখীর ঝড়, বইয়ে দিল অশান্ত রুদ্রের নিঃশ্বাস।

বর্ষ সেদিন সবে হ'ল সুরু। চোত্‌মাসের বাসন্তীমুকুলের রেণুর সুবাস এখনও যায়নি এ নবযৌবনা ধরণী থেকে মুছে—বাসি ফুলের গন্ধে মন রয়েছে মাতাল। কিন্তু সইলো না—মহাকালের ভৈরবরাগিণী সইল না পুরাতনীর মায়া,—সে যে আজ নতুন করে সব গড়বে, নতুনের আবাহনীতে যে ঘুম ভাঙাবে সবার। তাই তার অশান্ত বিক্ষোভ আজ বিদ্রোহ করল। গুমরে থাকা চাপা অভিমান ফেটে বেরিয়ে পড়ল বাইরে—রুদ্রের পদক্ষেপে ধরণী করে উঠল টলমল।

মনে পড়ে সেদিনের কথা—যেদিন সমুদ্র থেকে উঠে এল হলাহল, এল অমৃত, লক্ষ্মী। সেদিন কতো ব্যথা, কতো বেদনায় বুক বেঁধে ধরণীর ধূলিতে নতুন করে স্বর্গ রচনা করবার জন্যে হয়েছিল অমৃতের বিতরণ; মানুষ সেদিন কতো যুগান্তরের ব্যথা-বেদনা-মাখা স্মৃতি ভুলে বলে উঠতে পেরেছিল 'অমৃতের পুত্র মোরা'। আশুতোষ সেদিন পান করেছিলেন হলাহল। নীলকণ্ঠ তাঁর সমস্ত আশীর্বাদ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এ ধরণীর 'পরে নতুন প্রাণ-সৃষ্টির তরে। আর আজ পৃথিবী আবার টানতে চাইছে পুরাতনীর জের। চোতের বসন্ত—তার মলয়োচ্ছ্বাসিত আনন্দ-ভরা দিনগুলি পারে না সে নতুন দিনের নবারুণ উদয়ের সাথে সাথে বিসর্জন দিতে?

মানুষের ভগবান সইবে না তার এ অকৃতজ্ঞতা। রুদ্রের প্রশান্ত ভাস্বর চোখে দেখা দিল ক্রোধারুণের আভাস—তৃতীয় নেত্রে তাঁর ক্রুদ্ধ অবাক্ চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল এ পৃথিবীর দিকে। বাতাস পাগলের মতো ছুটে জানিয়ে দিতে চাইল সবার কানে কানে—'ওরে রুদ্রের অভিশাপ যে আজ রয়েছে তোদের পরে; তোরা নতুন আশায় বুক বাঁধ, সুরু কর নতুন জীবন'।

বিধাতার রুদ্ররোষ শান্ত হবে না তাতে। প্রকৃতির বনে বনে নব-বসন্তের যে উদ্দাম তাতে যে লেগে রয়েছে বিগত-বসন্তের পুষ্প-রেণুকণা, বাতাস তো পারে নি তাকে লুপ্ত করে দিতে। ক্ষমা এলো রুদ্রের কাছ থেকে, কিন্তু তার আগে চাই অসত্যের মূলোচ্ছেদ।

তাই দিগন্তে জেগে উঠল নব-সমারোহের আভাস; বিধাতার অভিমান পুঞ্জীকৃত হয়ে ঠেলে উঠল মেঘের রূপ নিয়ে, বাতাস তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো ঝটিতি, বিজলী তাদের জোগাল নতুন শোভা। আঁধার থেকেই তো আবার বেরোবে আলো—আঁধার ভেতর দিয়েই তো হবে সুখের সূত্রপাত। তাই মহাকালের নৃত্যচ্ছন্দে ডমরু লুপ্ত করে দিল আপনাকে, কালের ভেরীতে সুপ্ত হয়ে গেল পুরাতনী; ক্ষমাকাতর সতৃষ্ণ ধরণীতে নামল করুণা-ধারা।

রুদ্রের ভৈরব-দীপ্তি নতুন আশার আলো ছড়িয়ে দিল চারদিকে—নতুন করে গাছের পাতায় লাগল শ্যামলতা, প্রস্তুত করল তাকে আগামীর জন্যে—বরষা এলো।

ভৈরবের দারুণ দীপ্তি আশ্রয়লাভ করল ধরণীর বক্ষে—দুঃখের বুকভাঙা বেদনা থেকেই জন্ম নেবে পরম-সুখ। তাই 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ'—আবাহন করি তোমায়—আগুন জ্বালাও তুমি প্রাণে প্রাণে, গানে গানে—এসো হে ভৈরব,—এসো, এসো।

অস্ত চাঁদের পথে

অরুণকুমার দত্তগুপ্ত

(ষষ্ঠ বর্ষ, অর্থনীতি)

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে পৃথিবী, জেগে আছে শুধু বিপ্লব সেন—বিপ্লবী বিপ্লব সেন। জন্মের পর হাত দেখে কোন এক বিখ্যাত গণক নাকি বলেছিল যে ছেলে বড় হয়ে বিরাট বিপ্লববাদী হবে। বাপ-মা বিষম ভয় পেয়ে গেছিলেন, গণকের কথা শুনে ওর নাম রেখেছিলেন "বিপ্লব"; কে জানে, বিষে বিষক্ষয় হবার মতো

বিপ্লব নামে ছেলের বৈপ্লবিক কালো ভবিষ্যৎ যদি নষ্ট হয়ে যায়! আজ সেই বিপ্লবী বিপ্লব সেন মরবে, জন্ম নেবে অহিংস বিপ্লব সেন। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে যোগাসনে বসে দেহত্যাগ করবার আগে বিবাগী সন্ন্যাসী যেমন সারারাত জেগে থাকে তেমনি জেগে আছে বিপ্লব কালো রাত্রির মুখোমুখী হয়ে।

বাড়ীর সুমুখের ছোট্ট উঠান গিয়ে থেমেছে খালের পারে। কালো খালের জল ঘনতর কালোজলময় ধানক্ষেতের গায়ে গা মিলিয়ে নিঃশব্দে পড়ে আছে। ধানক্ষেত চলে গেছে দূরে, বহুদূরে—যতদূর চক্ষু চলে ততদূরে—রাত্রির অন্ধকারে অজানা মাঠে পথহারা পথিকের পথ যেমন শেষ হয় না তেমনি—মিশেছে ধোঁয়াটে আকাশে। মাঝে মাঝে দিগন্তরেখায় দু'একটা গ্রামের ঘনকালো চওড়া সীমানা ফুটে আছে বাষ্পীয় অন্ধকারের মাঝখানে। ঘাটের কাছে একটা পুরানো কদমগাছের মোটা শিকড়ের উপর বসে চুপ করে চেয়ে আছে বিপ্লব সম্মুখের ঐ ছবির পানে—সীমাহীন দক্ষিণের পানে। বিপ্লব ভাবে নিজের অতীত জীবনের কথা, যে জীবনের উপর যবনিকা আজ স্বেচ্ছায় সে টেনে দিতে চলেছে, অঙ্কনরত চিত্রকর অর্ধসমাপ্ত ছবির উপর অকস্মাৎ দাগ কেটে নষ্ট করে দেয় যেমনি ঠিক তেমনি ভাবে। একদিন এই গ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল—বিপ্লব, হীরেন, গিরিন এবং আরো অনেকে—যে যতদিন স্বাধীনতা না আসে ততদিন ওদের নব-আরব্ধ সাধনা বন্ধ হবে না; শরীর ক্ষয়ে যাবে, মন ভেঙে যাবে; অত্যাচারের আঘাতে চিহ্নিত হয়ে উঠবে সর্বাঙ্গ, তবু আহার-নিদ্রা ভুলে ছুটতে হবে গ্রামে, গ্রামান্তরে বিপ্লবের মশাল হাতে, প্রতিটি গ্রামের তরুণ সংঘের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে স্ফুলিঙ্গ, যেন জেগে ওঠে হাজার হাজার, কোটি কোটি মশাল বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, দাসত্বের অন্ধকার বিদীর্ণ করবার জন্য সুরু হয় মরণপণ অভিযান। সেদিন ওদের কার্যকলাপে বিদেশী সরকার রীতিমত ভয় পেয়ে গেছিল। তাই সেই বিপ্লববাদ ও বিপ্লবী সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে অত্যাচারের ঢেউ বইয়ে দিয়েছিল সরকার। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় দেশের আনাচে কানাচে খুঁজে খুঁজে ফিরল ওই বিপ্লবীদের। দিনের পর দিন বিনা বিচারে প্রাণ দিল কত দেশপ্রাণ;—কত স্বপ্নদর্শী সাধক পচতে লাগল অন্ধকার কারাগৃহে। তবু পেছপা হয়নি বিপ্লবীরা, ভয় পায়নি গিরিন-হীরেন-ওরা। গিরিনের কাছে থাকত সবসময় রূপার হাতল-যুক্ত একটা পিস্তল; সেই পিস্তল দেখিয়ে মাঝে মাঝে সে বলত, "যতক্ষণ এটা আছে ততক্ষণ গিরিন পৃথিবীতে কারো তোয়াক্কা রাখে না, সর্বশক্তিমান ভগবানেরো না, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তো কোন্ ছার!"

কালক্রমে গিরিন-হীরেন এবং আরো অনেকে ধরা পড়ে। ঘোষেদের যে পোড়ো দালান বাড়ীটার চারদিকে ঘেরাও করে পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করে, পরে সেখানে দাঁড়িয়েই বিপ্লব এবং তার জনকতক সঙ্গী প্রতিজ্ঞা করে, "যদি একে একে সকলেই

ধরা পড়ে, তবু যারা বাইরে থাকব আমরা কিছুতেই নতি স্বীকার করব না—কিছুতেই নয়"।

আজ সেদিন নেই, অসীম দুঃখের মধ্যেও আনন্দময় কর্মব্যস্ততার সে দিনগুলি আজ ফুরিয়ে গেছে। বিপ্লবী-সম্প্রদায়ের উপরওয়ালারা অনুরোধ জানিয়েছেন দেশের প্রত্যেকটি বিপ্লবী তরুণ-তরুণী যেন হিংসাত্মক কার্য পরিত্যাগ করে অহিংসার পথ বেছে নেয়, তারা যেন লুকিয়ে না থেকে বীরের মত আত্মসমর্পণ করে, ঐ আত্মসমর্পণের মধ্যেই দিগ্বিজয়ের নবতম সাধনা সুরু করবার জন্যে। অনেকেই ধরা দিয়েছে, কাউকে খালাস দেওয়া হয়েছে, কেউবা হাসতে হাসতে পড়েছে ফাঁসি অথবা গেছে দ্বীপান্তরে। আজ বিপ্লব সেন ধরা দেবে। পুলিশকে সে নিজেই জানিয়ে দিয়েছে। আজ শেষরাত্রে পুলিশের নৌকা আসবে তাকে গ্রেপ্তার করতে। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের ক্ষোভ অতি কষ্টে সংবরণ করে বিপ্লব।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি, পাতলা অন্ধকারে আচ্ছন্ন—যেন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। আকাশে সীমাহীন শূন্যে ফুটে আছে অগণিত গ্রহতারা—কল্পনাতীত দূরত্বের পারে। বিপ্লব আজ ধরা দেবে, ওরা যেন বিপ্লবী সন্ন্যাসীকে শেষ বিদায় জানাবার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করছে, সারাটা ঊর্ধ্বলোক যেন ঐ কাতর নৈঃশব্দ্যে সকরুণ হয়ে গেছে। গিরিনের ফাঁসি হয়ে গেছে, হয়ত ওখানেই কোথায় বসে চেয়ে আছে গিরিনের আত্মা তার পানে। ডাকছে কি সে বিপ্লবকে ইসারা দিয়ে? নাগালের বাইরে ওই আকাশলোক—ব্যোমচারী জ্যোতিষ্কদের জগৎ। যার পিছে পিছে এতদিন বিপ্লব ছুটে বেড়িয়েছে, এতদিন যা তার চোখের সামনে ফুটে ছিল, আজ তা অকস্মাৎ কত সুদূরের হয়ে গেল, ওই তারালোকের মতই নাগালের বাইরে চলে গেল বৈপ্লবিক আশা। আজ কে যেন ওদের সাধনার হোমকুণ্ডে জল ঢেলে দিয়েছে, বিপ্লবের অগ্নিশিখা মিলিয়ে গেছে অবসানের শূন্যগর্ভে। আবার সে অগ্নি ফিরে জ্বলবে কি? বিপ্লবীদের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠবে কি মুক্তির আগমনে—নববিবাহিত তরুণ-তরুণীর বাসর স্বপ্ন যেমন মূর্ত হয়ে ওঠে দেবতার মত একটি শিশুর আগমনে? মনটা ব্যথায় টন্ টন্ করে ওঠে। বাইরে হাওয়া নেই এতটুকুও, একটা শুকনো পাতার মর্মর পর্যন্ত শোনা যায় না। হাঁপিয়ে পড়ে বিপ্লব। ভাবনার মাঝখানে পর্দা টেনে দিয়ে ধীরে উঠে আসে নিজের ঘরে। টিন আর কাঠের তৈরী ঘর, বেজায় গরম। তারি মধ্যে নিঃসাড়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে মুক্তি—বিপ্লবের স্ত্রী। বছর চারেক হ'ল বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে বিপ্লবদের পরামর্শশালায় মুক্তির যাতায়াত ছিল। ছেলেবেলা থেকে ওদের দু'জনার সখ্য গড়ে ওঠে। খুব ভালো মেয়ে এই মুক্তি, আর খুব বুদ্ধিমতীও। বড় হয়ে যখন একদিন বৈপ্লবিক দল গঠন করল গিরিন, বিপ্লব প্রভৃতি গোটাকতক ছেলে, আর গোপনে শলাপরামর্শ ও আলোচনা চালাতে লাগল আনাচে কানাচে, মানুষের পরিত্যক্ত যত

জায়গায়, তখন গাঁয়ের মেয়েরা তাদের অদম্য কৌতূহল পরিতৃপ্ত করবার জন্যে ঐ সব ভূতুড়ে জায়গায় যাওয়ার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারত না। মুক্তি কিন্তু চুপি চুপি সাপখোপের ভয় অগ্রাহ্য করে বিপ্লবীদের পিছু পিছু গিয়ে উঁকি দিত ছেলেদের আড্ডায়। গাঁয়ের সমবয়সী মেয়েদের মহলে এই নিয়ে গল্প করে বেড়াত হরদম। একদিন ধরা পড়ে গেল হাতে হাতে। গিরিন শাসিয়ে দিলো ওকে, তদুপরি দিল এক চড়। মুক্তি তখন বারো-তেরো বছরের মেয়ে। অমন সন্ধ্যারাতে বিপ্লব ওকে বাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে আসে, পথে যেতে যেতে সান্ত্বনা দেয়, বলে, "কেন গিয়েছিলি তুই ওখানে? আর যাসনে, বুঝলি? মেয়েদের ওখানে যেতে নেই।"

তবু মুক্তির জেদ যায় না, গিরিনের অপমান যেন দশগুণ বড় হয়ে মনে বাজে। রোজ যেতে ও সুরু করে সেখানে। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই আবার সতর্ক গিরিনের কাছে ধরা পড়ে। এবার গিরিন বলে দেয়, "ফের যদি আসিস তবে এই পিস্তল দিয়ে গুলি করব, বুঝলি? আমরা নাচছি না থিয়েটার করছি যে এত সখ?"

হীরেন একটা পরামর্শ দেয়। সে বলে, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? ওকে আমাদের মধ্যে নেওয়া যায় না? লুকিয়ে লুকিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হ'লে আর মাল-মশলা চালান দিতে হলে গ্রামের মেয়েগুলোকেও যে হাতে রাখলে ভাল হয়!"

মন্দ লাগে না পরামর্শটা ওদের কাছে। মুক্তির কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করা হয়, বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ফেরে মুক্তি।

বছর দুই চলে যায়। অকস্মাৎ একদিন ঘরপালানোর পালা সুরু হয়ে গেল। গিরিন তখনো ধরা পড়ে নি। সন্ধ্যার সময় গোপনে ঘোষেদের পোড়োবাড়ীর পিছনে আমবাগানে ওদের মন্ত্রণা সভা বসেছে। মুক্তি অনুপস্থিত। বিপ্লব বলে, "আমাদের সব কিছুই তো ভেঙে যাবে, কিন্তু মুক্তিকে নিয়ে কি হবে?"

গিরিন বলে, "কেন, ও ঘরে ফিরে যাবে! ওর উপর তো আর পুলিশের নজর নেই। ও বিয়ে-থা করে সংসার করুক গে।"

বিপ্লব বলে, "সেখানেই তো যত গোল, গিরিনদা"।

গিরিন জিজ্ঞাসা করে, "সে আবার কি?"

হীরেন বলে, "মুক্তি বিপ্লবকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না, আজীবন কুমারী থাকবে তাতেও রাজী"।

গিরিন গম্ভীর হয়ে বলে, "ওকে তোমরা বুঝিয়েছিলে? বিপ্লব, তুমি?"

বিপ্লব জানায় চেষ্টার ত্রুটি সে করে নি। কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে গিরিন রায় দেয়, "মেয়েটার কপালে দুঃখ আছে। বিপ্লব, তুমি ওকে বিয়ে কর।"

বিপ্লব করুণ কণ্ঠে জানায়, "কিন্তু আমাকে যে চোরের মতন পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হবে। আমার সঙ্গে ওকে রাখবো কোথায়?"

হীরেন একগাল হেসে বলে, "আচ্ছা, বিয়েটা তো আগে হয়েই যাক্ ! তারপর তোমার বাস্তুভিটেটাতো আছে ? সেখানে রোজ তুলসীতলায় প্রদীপ দেবার দরকার হবে না ?"

বিয়ে হয়ে যায় মুক্তির সঙ্গে। বিয়ের পরই আরম্ভ হয় ঘরছাড়ার পালা। পালিয়ে পালিয়ে থাকে বিপ্লব। রাতের পর রাত কোথায় কাটায় কে জানে ! মাঝে মাঝে আচম্বিতে এসে হাজির হয় কোন এক অমারাত্রে। মুক্তি ধড়মড় করে জেগে উঠে স্বামীকে ঘরে নিয়ে আসে, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিপ্লব মৃদুকণ্ঠে গুন্‌গুনিয়ে গায় রবিঠাকুরের নামকরা একটি গান,

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার ॥

এমনি চলেছে মুক্তির বিবাহিত জীবন—অনন্ত বিরহের কালো আকাশে থেকে থেকে ঝিলিক-দিয়ে-যাওয়া ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুচ্ছবির মতো ক্ষণিকের মিলন দিয়ে গড়া। আজ সন্ধ্যার দিকটায় তেমনি এসেছে বিপ্লব। ধরা দেবার আগে মুক্তিকে একবার দেখতে না পেলে কিছুতেই সে সুখ পাবে না। বিপ্লব যে ধরা দেবে একথা জানে না তার স্ত্রী। বিপ্লব ইচ্ছে করেই জানায় নি তাকে ; জানিয়ে কি-ই বা হবে ? অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা ক'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে, স্বামী কখন পাশ থেকে উঠে গেছে, ও জানতেও পারে নি, জানতে পারবে কিনা কোনদিন কে জানে ? ও ঘুমিয়ে আছে। থাক্ ও ঘুমিয়ে থাক্। ওকে জাগিয়ে কাজ নেই। অন্ধকারেও ওর মুখ স্পষ্ট অনুভব করা যায়, বিপ্লব চেয়ে থাকে ওর সেই মুখের দিকে। গরমে ঘামিয়ে গেছে সুন্দর মুখখানা, ধুতির আঁচল দিয়ে খুব সন্তর্পণে মুছে দেয়। ঠোঁঠের ফাঁকে মাঝে মাঝে যেন হাসি উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, যেন কোন একটা মধুর স্বপ্ন দেখছে ও। একদিন এই স্বপ্ন কি ভেঙে যাবে ? বিপ্লবের মনটা ভারী হয়ে ওঠে। নিজেকে মনে মনে অপরাধী করে সে। কেন মুক্তির মধ্যে এই স্বপ্ন সঞ্চার করে দিয়েছে সে ? বিপ্লব কি অপরাধ করেছে ? না, না অপরাধ সে করে নি। একদিন যখন বিপ্লব থাক্‌বে না, যখন ঝড়ের রাত্রে ভয়ে পাশ ফিরে স্বামীকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে ভুল ভেঙে যাবে মুক্তির তখন বিপ্লবের রক্ত দিয়ে গড়া তার একটি শিশু বিপ্লব হয়ত ওর কাছে ঘুমিয়ে থাকবে, তাকেই জড়িয়ে শক্ত করে বুকে ধরে রাখবে স্ত্রী। স্বামীকে তার মধ্যেই হয়ত খুঁজে পাবে সে। বিপ্লবের মন থেকে যেন একটা বোঝা নেমে যায়।

বাইরে অসংখ্য জোনাকি-জ্বলা ঝোপঝাড়ে ঝিল্লী ডেকেই চলেছে। মাঝে মাঝে তন্দ্রাজাগ্রত নিশাচর পাখীর ডাক আসে কানে। অকস্মাৎ ঘুমন্ত কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল বাইরে। বিপ্লব বুঝলো বিদায়ের লগ্ন উপস্থিত। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে হাজির হল নৌকাঘাটে, পুলিশের নৌকা এসেছে একটা। বিপ্লব দারোগার কাছে

গিয়ে বলে, "আমিই সেই বিপ্লব সেন, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার বাড়ীর ভেতর থেকে আসি।"

মুক্তি ঘুমিয়ে আছে। বিপ্লব ধীরে ধীরে ওর শিয়রে গিয়ে বসল। ওর মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে। হঠাৎ বুঝি এক দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে পাশ ফিরল এবং দু'খানা ভয়ব্যাকুল হাত ঘুমের ঘোরেই প্রসারিত করে দিল স্বামীর অন্বেষণে। বিপ্লব ওর উত্তেজিত দুটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় স্থাপিত করে দিল। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল মুক্তি। ওর ঘুমন্ত মাথায় হাত রেখে ধীরে ধীরে আপন ওষ্ঠ ওর সুন্দর কপালে ছুঁইয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো বিপ্লব। কুকুরটা থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে। বিপ্লব ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। "হেই কালু, চুপ, খবরদার, এই যে আমি, চিন্‌তে পারিস্ না?" কুকুরটা শান্ত হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে এক একবার পুলিশের টর্চের আলোর উদ্দেশ্যে ঘড় ঘড় শব্দে অস্বস্তি প্রকাশ করতে থাকে। বিপ্লবের হয়ত দ্বীপান্তর হবে। যদি কোনদিন সশরীরে ফিরে আসে বিপ্লব তবে এই জীন ভ্যালজীনকে চিনতে পারবে তো কালু?

নৌকায় উঠে পড়ল বিপ্লবী বিপ্লব সেন। পুলিশের নৌকা ছুটে চলল পূব দিকে। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে; ক্ষীণ চন্দ্র উঠেছে পূর্ব আকাশ প্রান্তে অস্পষ্ট হয়ে। নৌকা ছুটে চলল সেই দিকে—অস্তগামী চাঁদের পথে। প্রভাতের আর কত দেরি?

পাগল

মনোজকুমার পাল

(দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান)

"খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে"—স্তব্ধ নিশীথে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পালু চীৎকার করে উচ্চকণ্ঠে। পদ্ম কিন্তু সত্যই ঘুমায় নাই। অন্ধকার ঘরের মেঝেতে শুইয়া জাগিয়াই আছে।

পালু তাহার পাগল দাদা। সারারাত্রি ধরিয়া বকিয়া যায় এমনই অবিশ্রান্ত। কখনও অস্ফুট ভাষায়, কখনও তারস্বরে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া। ঘরের মধ্যে ঢোকে না কোনদিন। সারাদিন বাড়ী থাকে না। সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গে পদধূলি দেয় বাড়ীর প্রাঙ্গণে। পদ্ম দুটি ভাত দেয় সম্মুখে। দু'এক দিন খেয়াল হইলে খায়ও না। সটান দাওয়ায় উঠিয়া বসে। হাসে কাঁদে, আবার উচ্চৈঃস্বরে কে বা কাহাদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালিগালাজও করে।

বাড়ীর পিছনে তেঁতুল গাছের মাথায় একটা হুতুম পেঁচা গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া ওঠে—"ধুম্ ধুম্ ধুম্"। গাছের গোড়ায় ঝোপঝাড়ের অন্তরালে একটা নিশাচর প্রাণী স্ খস্ করিয়া চলিয়া যায়।

লাঠিগাছটা তুলিয়া লইয়া পাগল পালু চেঁচাইয়া ছুটিয়া যায় সেই অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দ ক্ষ্য করিয়া—"ঐ ঐ! আবার এসেছে বেটারা! এই লাঠির ঘায়ে মাথাটা দেব চৌচির ক'রে!"

পদ্ম অন্ধকারে শয্যায় উঠিয়া বসে। দাদার এই নিশীথশব্দ লক্ষ্যে ছুটিয়া যাওয়া াহার কাছে নতুন নয়। প্রথম প্রথম ভয় হইত তাহার। সেও ছুটিত দাদার পিছু ছু। কিন্তু এখন আর উদ্বেগ প্রকাশ করে না। জানে খানিকবাদে আপনি ফিরিবে— র্বে নিজের বীরত্ব ও 'বেটা'দের কাপুরুষত্ব ঘোষণা করিতে করিতে।

তাহার বুক ঠেলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসে। দাদা ত তাহার রদিনই এমন ছিল না। দাদার এ মস্তিষ্কবিকৃতির জন্য দায়ী সে নিজে।

পদ্মের কল্পনানেত্রে ভাসিয়া ওঠে বিশেষ একটি রাত্রির স্মৃতি। ক্ষোভে, লজ্জায়, য়ে পদ্ম চোখ বোজে। তবুও সেই ছবি। ভোলা ময়রা, কালু ঘোষ, মতি কামার। লা ময়রা তাহার মুখ আঁটিয়া বাঁধিতেছে। মতি কামার হাত ধরিয়া টানিতেছে। লুর লাঠির আঘাতে দাদা লুটাইয়া পড়িয়াছে দাওয়ার নীচে। তাহাকে ওরা ঘর হইতে নিয়া বাহির করে। দাদা সর্বশক্তি সঞ্চয় করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। আহত মাথা হইতে রক্তের ন্কি নামিয়া আসিয়া তাহার দুই চোখ ঝাপসা করিয়া দেয়। অশক্ত পা দুটি টলিয়া ওঠে। বার উঠানের নির্মম কঠিন বুকে পড়িয়া মাটী হাতড়ায়। বুঝি উঠানের কঠিন বুকে এক- ন্দু স্নেহকরুণা অন্বেষণ করে। কিন্তু পায় না। হাত দুটি ঊর্ধ্বে আকাশের পানে তোলে াকুল হতাশায়। বুঝি নিশীথের সুপ্ত বিধাতার কাছে রক্তাপ্লুত চোখের রক্তিম ভাষায় পাঠায় কটা নালিশ। মাথার রক্তে উঠানের গোবরমাটীলিপ্ত পিঙ্গল বুক রাঙা হইয়া ওঠে।

তারপর বসে ষোল আনার মজলিস। ডাক পড়ে পালুর। মাথায় ব্যাণ্ডেজ পালু য়া বসে এক প্রান্তে। প্রকাণ্ড সভায় তাহাকে করা হইল একঘরে। পালু তারিণী লের পা দুইটি জড়াইয়া ধরে। ক্রুদ্ধ তারিণী নির্মম পদাঘাতে প্রত্যুত্তর দেয়—হৃদয়- ন। গ্রামের সবাই উপভোগ করে—ভোলা, কালু, মতি—সমাজের মধ্যমণি যাহারা। চ্ছন্নের মত বাড়ী ফেরে পালু।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিতে কালু বাহির হইয়া আসে একটা গাছের আড়াল ইতে। বলে, "তু নালিশ কর কেনে। আমি বুল্চি, তেরের জ্যান হয়ে যাবে।"

কালু হঠাৎ অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। সমবেদনা জানাইতে নাইতে সঙ্গে সঙ্গে আসে। পালুর চোখে পড়ে—রান্নাঘরের দাওয়ায় নতমুখে বাটনা টিতেছে পদ্ম। পদশব্দে পদ্ম মুখ তোলে। তাহার চোখের নীচে সুস্পষ্ট অশ্রুধারা।

হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া ওঠে পালু। আচম্কা আক্রমণে কালু ঘোষ

ভীত, সন্ত্রস্ত, আকুল আর্তনাদ তোলে। পদ্ম রান্নাঘরের দাওয়া হইতে লাফ দিয়া পড়ে অতিকষ্টে দাদাকে নিবৃত্ত করিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসায়।

উঃ! পালুর নির্দয় বাহুবেষ্টন যেন সাঁড়াশির পাক। বন্ধনমুক্ত কালু ঘোষ ঘাড়টায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে পালুর উদ্দেশ্যে।

পালুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ হইতে আবার দরদর ধারে রক্ত গড়ায়। পদ্ম নীরবে কাঁদে। দাদাকে সযত্নে শোয়াইয়া দেয়। কিছুক্ষণ আগেকার বর্বর পশুর মত হিংস্র পালু বোনের কাছে কোমল হইয়া আসে। দীর্ঘদিন শুইয়া থাকিয়া মাথার ক্ষত শুকায়। কিন্তু সেই হইতেই .....।

নিঃশব্দ রাতে অন্ধকার শয্যাতলে মাঝে মাঝে পদ্মর মনে হয় সে গলায় দড়ি দিয়া মরে। আবার কখনও ইচ্ছা হয়, বাহিরে দাওয়ায় উপবিষ্ট তাহার উন্মাদ বিনিদ্র দাদার পায়ের গোড়ায় মাথা খুঁড়িয়া মরিতে। উঃ! এই নিদ্রাহীন রাত্রি। একদিন আধদিন নয়—রাতের পর রাত। দিনে বোধ হয় কোথাও ঘুমায়। রাখাল ছেলেরা বলে, তাহারা গ্রামের বাহিরে বুড়ো বটতলায় ভূশয্যায় প্রায়ই দেখে পালু-পাগলাকে। তবুও ঐ বটগাছের নীচে ধূলিবালিময় পচাপাতার উপরে দিবানিদ্রা! দিনে প্রায়ই অভুক্ত থাকে। বিকৃতমস্তিষ্ক পালু-পাগলাকে সমাজের চোখরাঙানি উপেক্ষা করিয়া খাইতে দিবে, এমন দরদী কে আছে?

তাহার উন্মাদ দাদা আজও ভুলিতে পারে নাই তাহাকে; দিনান্তে সন্ধ্যার আঁধারে ঘরে ফেরে। দুয়ার আগলাইয়া বসিয়া থাকে সারারাত। ভোরের আভাস ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া যায় আবার। যায় ঘুমাইতে। দিনের বেলা বাড়ী থাকে না। হয়ত পারে না প্রখর দিনের আলোয় তাহার অত্যাচারিত বোনটির মুখের দিকে তাকাইতে। নয়ত যায় বোধ হয় বুড়ো বটগাছের নীচে ধরণী-মায়ের শ্যামল বুকের শীতল স্পর্শে আপনার অন্তরের অগ্নিকুণ্ডকে কিছুটা ঠাণ্ডা করিতে। ওর বুকের মধ্যে নিশ্চয়ই দিনরাত জ্বলিতেছে লেলিহান অগ্নিশিখা। তাহারই একটানা প্রদাহে নিরন্তর ক্ষয়িত হইতেছে ওর বুকখানি।

তেঁতুলতলার ঘন অন্ধকারে দাঁড়াইয়া খানিক চীৎকার করিয়া ঝোপঝাড় ঠেঙাইয়া পালু ফিরিয়া আসে। জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া অজস্র জ্যোৎস্নাধারা পড়ে তাহার বুকে, চোখেমুখে। চাঁদের আলোয় পদ্ম যেন ওর বুকের হাড়গুলি গুণিতে পারে। স্পষ্ট দেখিতে পায় চোখের কোণে গাঢ় কালিমা। পদ্ম বাহির হইয়া আছাড় খাইয়া পড়ে উন্মাদ দাদার পদতলে, "আমার গলাটা এইখানে টিপে আমায় মেরে ফেল দাদা! নিজেকে এমন ক'রে তিলে তিলে মেরোনা। উঃ, আমি যে আর সইতে পারি না!" সত্যই তাহার নিজের অন্তরেও যে জ্বলে একটা অগ্নিকুণ্ড। দাদার অন্তরাগ্নির সান্নিধ্যে তাহার প্রদাহ অসহ্য হইয়া ওঠে। পালু পদ্মর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ওঠে সশব্দে।

দিনকয়েক পরে স্নানান্তে বাড়ী ঢুকিতে পদ্মর চোখে পড়ে, উঠানের এক কোণে কে একজন বসিয়া গভীর তন্ময়তার সহিত কি যেন করিতেছে। অজানা আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। আগাইয়া আসিয়া অবাক হইয়া যায়—দাদা যে। দিনের আলোয় বহুদিন দেখার অভ্যাস নাই বলিয়াই চিনিতে পারে নাই প্রথমটা। কিন্তু দাদা ত দিনের বেলা বাড়ী আসে না কোনদিন।

পালু ঝুঁকিয়া প'ড়িয়া একান্ত অভিনিবেশে একটা কাগজের মধ্যে ধুলো ভরিয়া তাহার উপর পাট দিয়া কষিয়া বাঁধিতেছে। পদ্ম আশ্বস্ত হয়। তাহার পাগল দাদার উন্মত্ত পাগলামি কমিয়াছে, চোখেমুখে ফুটিয়াছে পরম শান্তি—গভীর ঐকান্তিকতা।

পদ্ম জিজ্ঞাসা করে, "কি করছ দাদা?"

পাগল হঠাৎ এত কাছে কণ্ঠস্বর শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া হাতের পুঁটুলিটা লুকাইতে চেষ্টা করে। পদ্মকে দেখিয়া আশ্বস্ত হয়। উঠিয়া পদ্মর মুখের কাছে পুঁটুলিটা তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে, "এটা কি বল্‌তো পদি!"

পদ্ম দাদার কণ্ঠস্বরে আগেকার সুস্থ সবল দাদার গলার আভাস পায়। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলে, "কি ক'রে বলব বলো। তোমার মত লেখাপড়া শিখিনি ত?"

দাদা একগাল হাসিয়া বলে, "বলতে পারলি না ত?" তার পরেই চোখদুটি বিস্ফারিত করিয়া বলে, "বোমা! বোমা! শুধু কি একটা? হাজার হাজার তৈরী করব। মারব কালু-ভোলা-মতির মাথায়। মাথা থেকে ঘিলু গড়িয়ে পড়বে। মারব তারিণীর গোদা পায়ে। কুমড়োপানা তুলতুলে ভুঁড়িতে। ফাঁসিয়ে দেব ওর ভুঁড়ি। মারব গাঁয়ের সবাইকে—ছেলে, বুড়ো, বউ। ক্ষমা? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ক্ষমা কাউকেই করবো না। আর—"

পদ্ম দাদার আকস্মিক উত্তেজনায় ভীত হইয়া ওঠে। হাত চাপিয়া ধরে দাদার, চোখ হইতে গড়াইয়া পড়ে অশ্রু—বিন্দু বিন্দু মুক্তোর মত। উত্তেজিত পাগল অনুভব করে বোনের হস্তস্পর্শ। বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া থাকে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দুর পানে। হয়ত তাহার মনে পড়ে সেদিনের অশ্রুমুখী বোনের মুখখানি। তাহার সঙ্গে হয়ত তুলনা করে আজকের এই অশ্রুসিক্ত মুখখানির। সেদিনের সে অশ্রু যেন মনে হয় অত্যাচরিতার অন্তরের দরবিগলিত অপমান। আর আজকের এ অশ্রু প্রশান্ত সুন্দর। কাঁঠালগাছের ঘনপল্লব ভেদ করিয়া এক টুক্‌রা সূর্যের রশ্মি পড়িয়াছে পদ্মর গণ্ডদেশে। দুই ফোঁটা টলমল অশ্রু—ভ্রাতৃস্নেহের চিকিমিকি তাহাতে। পাগল কি বোঝে তাহা সেই জানে। কিন্তু শান্ত হয় বোনের স্নেহকাতর স্পর্শে। দাওয়ায় উঠিয়া বসে।

সেদিন রাত্রে ঘরের মেঝেতে শুইয়া থাকিতে থাকিতে পদ্ম কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পালু দাওয়ায় বসিয়া নিত্যপ্রথামত বকিতেছিল।

"উঃ মাগো!" নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া একটা শব্দ ওঠে। পালু সচকিত হইয়া উঠিয়া উৎকর্ণ হইয়া শোনে। পদি! হ্যাঁ, পদিরই ত কণ্ঠস্বর!

লাঠিগাছটা তুলিয়া লইয়া অন্ধকারের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হয় পালু। আবার সেই করুণ চীৎকার! বাগানের ওপারে মতিকামারের বাড়ী হইতে। পাগল পালু আপনার বুকের মাঝখানে অনুভব করে পদির আকুল চীৎকার! তাহার উন্মত্ত রক্তে উত্তেজনার শিহরণ জাগে। নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া সে ছুটিয়া চলে বাগানের মধ্য দিয়া।

ঐ যে মতেটা! মারছে বুঝি পদিকে! পাগলের বুকে অদম্য প্রতিশোধলিপ্সা। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে আগাইয়া চলে। পিছন হইতে আচম্‌কা বজ্রহস্তে বসাইয়া দেয় কামারের মাথায় প্রচণ্ড লাঠির ঘা। কামার মাটিতে ঘুরিয়া পড়ে। চীৎকারের অবসরটুকুও পায় না।

মেয়েটির হাত ধরিয়া পাগল বলে, "আয় পদি, শিগ্‌গির আয়! পালা! জ্ঞান হ'লে বেটা আবার চেঁচিয়ে উঠবে।" মেয়েটি হতবুদ্ধি হইয়া যায়। পাগলের আকর্ষণে ছোটে তাহার পিছু পিছু।

কাহার হস্তস্পর্শে ঘুম ভাঙিতে পদ্ম অবাক হইয়া যায়। শেষরাত্রির আবছা আঁধারেও চিনিতে পারে। এ যে মতিকামারের বোন বিন্দু!

বিন্দুর মুখে পদ্ম সমস্তই শোনে। বিন্দু মেয়েটি বরাবরই মুখরা। আজ নাকি সন্ধ্যায় মতির বৌয়ের সঙ্গে ওর একচোট বচসা হইয়াছে। রাত্রে নেশা করিয়া দাদা ঘরে ফিরিতেই বৌ সাতখানা করিয়া লাগাইয়াছে। তাই দাদা ধরিয়া……। নেশার ঘোরে এমন দুই-এক ঘা প্রায় প্রত্যেক দিনই পড়ে। বৌও বাদ যায় না।

"হিঃ, হিঃ", বিন্দু হাসিয়া ওঠে, "পালু-পাগলা কোত্থেকে দৌড়ে যেয়ে করলে কি, দিলে দাদার মাথায় এক ঘা। দাদা ত অমনি কুপোকাৎ। তারপর বলে কি, 'আয় পদি, পালা'। হিঃ হিঃ, হিঃ হিঃ……।" বিন্দুর হাসির বেগ বাড়িয়া যায়, "সাধে কি লোকে বলে পাগলা। আমার নাম যে 'পদি' নয় 'বিন্দু' তাও ও পাগল জানে না।" অকস্মাৎ বিন্দু গম্ভীর হইয়া ওঠে। সত্যই পাগলের লাঠি দেখিয়া তাহার বড় ভয় হইয়াছিল। কি জানি পাগল ত! যদি এক ঘা তাহার মাথায়ও বসাইয়া দেয়? সুতরাং তাহাকে ছুটিতে হইয়াছে পাগলের নির্দেশমত পাগলের আকর্ষণে।

মতিকামারের বাড়ী হইতে লোকজনের গোলমাল কানে আসে—'বিন্দুটা আবার গেল কোথায়'? পদ্মর হাসি পায়। হঠাৎ কি মনে হইতে শঙ্কিত হইয়া ওঠে পরক্ষণেই। কিন্তু বাহিরে আসিয়া অবাক হইয়া যায়। তাহার উন্মাদ নিদ্রাহীন দাদা বিভোরে ঘুমাইতেছে। চোখের দুইটি মুদ্রিত পল্লবে, আলগোছে বন্ধ করা দুইখানি ঠোঁটের উপরে পরম প্রশান্তি লাগিয়া আছে। পদ্ম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—স্বস্তির, না বেদনার? দাদা মনে করিয়াছে তাহারই পদ্মকে সে উদ্ধার করিয়াছে সেদিনের লাঠির পাল্‌টা জবাব মতির মাথায় বসাইয়া।

বিন্দু ভয়ে বাড়ী ফিরিতে পারে নাই। পদ্মও যাইতে দেয় নাই। এ বাড়ীতে

কাহারও শুভাগমন ঘটে না কোনদিনই। সুতরাং বিন্দুর আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবার ভয়ই বা কি? আর সত্যই পালু-পাগলারই যে এ কীর্তি, গ্রামের লোকের এবং বিশেষ করিয়া মতির এ কথা একবারও মাথায় আসে নাই।

পালু-পাগলের পাগলামি সত্যই কম পড়িয়াছে। তাহার লাঠির ঘায়ে কামারের দুরবস্থার ছবিটা মনশ্চক্ষে দেখিয়া সে এখন প্রাণ খুলিয়া হাসে। পদ্মর সঙ্গে দিব্যি কথা বলে। তবে প্রথম প্রথম বাড়ীতে একটি অপরিচিতা নারী দেখিয়া সে বিস্মিত হইত। কিন্তু এখন সে ঘোর কাটিয়াছে। পদ্মর কথামত তাহাকে সে ডাকে 'বৌ' বলিয়া। বিন্দুরও প্রথম প্রথম লজ্জা করিত। এই মুখরা মেয়েটাও আজকাল কেমন যেন লজ্জানম্র হইয়া পড়িয়াছে। সে এখন মনকে আশ্বাস দেয় গোঁয়ার দাদার হাতে নিত্যি লাথিচড়ের চেয়ে এ অনেক ভালো। 'বৌ' ডাকটি বেশ লাগে তাহার। পদ্ম ইহাদের দিকে তাকাইয়া তাহার অতীতের ক্ষতটা অনেকখানি ভুলিয়াছে। ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলেও ত তাহার দাহ কমে। পদ্ম বিন্দুকে বলিয়াছে, "দাদার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব"।

ইহারই মধ্যে মাঝে মাঝে কুগ্রহটা পালুর কাঁধে ভর করে। কিন্তু সে আর এখন অতীতের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া বুড়োবটতলার ছায়াশীতল কোল খোঁজে না। ঘরে বসিয়াই কাগজে মাটী ভরিয়া পাট দিয়া জড়াইয়া বাঁধে আর বলে, "মতিটাকে ত ঘায়েল করেছি। বাকী আছে তারিণী গোদা। ওর ভুঁড়ি ফাঁসাবই। ভুঁড়েলটা এক গাঁ লোকের মাঝখানে—।" অতীতের তিক্ত স্মৃতিগুলি আজও তাহার স্মরণে আসে।

কথাটা কিন্তু চাপা থাকিল না। পালুর বাড়ীতে বিন্দুর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। মতি তারিণীর সহিত যুক্তি করিয়া দারোগা আনাইল। পালুটাকে এবারে ভালমত শিক্ষা দিয়া ছাড়িবে।

দারোগার তদন্তে বিন্দুকে সত্য সত্যই পাওয়া গেল পালুর বাড়ীতে। অবশ্য চোরাই মাল লুকাইয়া রাখা হয় নাই। প্রকাশ্য দিবালোকে সে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়াছিল সশরীরে। পালুকে আনিয়া বসানো হইল দারোগার সামনে। দারোগার পাশে তারিণী, ভোলা, মতি ·····। পালুর চোখ দুটি জ্বলিয়া ওঠে। বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকা স্বরচিত 'বোমা' বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া মারে তারিণীর ভুঁড়িতে, চোখে মুখে। অমনি অজস্র ধূলায় তারিণীর সর্বাঙ্গ গেল ভরিয়া। এক মুখ ধূলাবালির মধ্যে তারিণী পালের ছোট ছোট চোখ দুইটি পিট্‌পিট্ করে। দারোগার সম্মুখে বিব্রত তারিণী পাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়ে। তারিণীর দুরবস্থাটা উপভোগ করিয়া পালু হাসিয়া ওঠে সশব্দে মজলিস কাঁপাইয়া।

দারোগাবাবু বুঝিলেন, লোকটি বদ্ধ পাগল। সুতরাং পালুর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেইখানেই মিটিয়া গেল। মতি মনঃক্ষুণ্ণ হইল। তারিণী গেল মর্মান্তিক চটিয়া।

মতি বলে, "দারোগাবাবু, আমার বোনের কথাটা?"

দারোগাবাবু বিন্দুকে বলেন, "কি রে, যাবি তোর দাদার বাড়ী ?"

বিন্দু দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়, "না"।

"তবে যাবি কোথায় ?"

পালুকে দেখাইয়া বিন্দু বলে, "ওর বাড়ী"।

"কেন ?"

"ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমার।" বিন্দু আর দাঁড়ায় না। তাহার শেষ কথাটি শুনিয়া পাগল পালু কেমন যেন অবাক হইয়া যায়। তাহার রক্তধারায় সুরু হয় একটা অব্যক্ত পুলকস্পন্দন। বিন্দু তাহার হাত ধরিয়া বলে, "চলো, বাড়ী চলো"। বিস্মিত পালু আবার স্বাভাবিক হইয়া ওঠে। অবশিষ্ট বোমা ফেলিয়া হাত ঝাড়িয়া বাড়ীর পথে পা বাড়ায়। সঙ্গে বিন্দু—'বৌ', যাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে।

বাঙলার শিশুসাহিত্য

মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় *
(চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্)

সাহিত্য-আসরে শিশুরও যে একটা দাবী আছে একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু শিশুর এ দাবী সচেতন ভাবে স্বীকার করেছেন যে সাহিত্যিক-বৃন্দ তাঁরা সকলেই প্রায় আধুনিক যুগের লেখক। শিশুদেহের অন্তরালে যে একটি সুকোমল হৃদয়বৃত্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার অন্তরে যে বাস্তব, অবাস্তব বহু চিন্তাই আত্ম-গোপন করে আছে সে রহস্যের খোঁজ বড় কেউ রাখতেন না। তাই শিশুদের উপযোগী কোন সার্থক সাহিত্যই অনেক দিন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি তাদের প্রতি উদাসীনতার জন্য।

শিশুমনে সত্যিকার আনন্দ দেবার জন্যে, প্রকৃত দরদী মন নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে যাঁরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও সম্মান পেয়েছিলেন হেন্‌রী এণ্ডারসন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শিশুসাহিত্য রচনার জন্য চাই প্রকৃত দরদী মন, তাদের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ। আর তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে একান্ত পরিচয়ও দরকার। এণ্ডার-সনের 'ফেয়ারী টেল্‌স' এ শিশুরা যে আনন্দ পেয়েছে তার কারণ, লেখক গল্পগুলি লিখেছেন তাদের নিছক আনন্দ দেবার জন্য এবং তার থেকেই প্রমাণিত হয় শিশুদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কত গভীর।

আমাদের দেশে সত্যিকারের শিশুসাহিত্যের উদ্ভব অনেক পরে হলেও যে

---

* লেখক আমাদের কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৮ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

ছড়ার রাশি বাংলার ঠাকুমা দিদিমার মুখে মুখে ফিরত শিশুদের মনোরঞ্জনের দিক থেকে সেগুলির সার্থকতা নেহাৎ কম নয়। "খোকা ঘুমলো, পাড়া জুড়লো, বর্গি এল দেশে", "যাদু এত বড় রঙ্গ, যাদু এত বড় রঙ্গ, চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ", "খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ী, সঙ্গে যাবে কে?" ইত্যাদি কত ছড়া কত দিন থেকে যে খোকা খুকুর মনে রস ছড়িয়ে আসছে তার ঠিক নেই। ছোট্ট খোকা খুকুর দল এই আবোল তাবোল কল্পনার মধ্যে পেয়েছে তাদের ছোট্ট মনের অনুরূপ ছবি। রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াগুলি সঙ্কলিত করে যে সমালোচনা করে গেছেন এখানে তা নতুন করে বলা বাহুল্য। তবে তার থেকেই আমরা উপলব্ধি করব শিশুমনে রস বৈচিত্র আনার কাজে এগুলির দান কি অপরিসীম।

এই প্রসঙ্গে রূপকথা সম্বন্ধে দু'চার কথা না বল্‌লে বোধ হয় অন্যায় হবে। রাজা-রাণী-রাজপুত্র-তেপান্তরেরমাঠ-বেঙ্গমা-বেঙ্গমী-রাক্ষসের প্রাসাদে ঘুমন্ত রাজকন্যা খোকা খুকুদের মনে নিয়ে আসে কল্পলোকের ইঙ্গিত—যা প্রত্যক্ষগম্য নয় কিন্তু তাদের কাছে প্রকৃত অস্তিত্ব বিশিষ্ট। কিন্তু এই রূপকথা ও ছড়ার রাশি দিন দিন লুপ্ত হতে চলেছে। তা ছাড়া সেই এক ছড়া আর রূপকথা তাদের বেশীদিন আনন্দ দিতে পারে না। কিন্তু তাদের অপরিতৃপ্ত মনের খবর রাখতেন ক'জন? কবে বর্গি বাংলার বুকে হানা দিয়েছিল তাই অজ্ঞাত কবির মুখে মুখে রচিত হয়েছিল একটি ছড়া; অথবা মা কবে খোকাকে নিয়ে ব্যাকুল হয়ে বা আনন্দে বিভোর হয়ে বলেছিলেন "আয়, আয় চাঁদা মামা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা" সেই ছড়াগুলি কি চিরদিনই আনন্দ দিতে পারে? রূপকথা সম্বন্ধে সেই একই কথা প্রযোজ্য। শিশু দু'চার দিন দুয়োরাণীর দুঃখে চোখের জল ফেল্‌তে পারে কিংবা নিজেকে রূপকথার রাজকুমার ভেবে নিয়ে তেপান্তরের মাঠের শেষে ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্ন দেখ্‌তে পারে; কিন্তু সে কি চিরকাল চলে? কাজেই তাদের মনে জাগে নতুন গল্প, নতুন কবিতার চাহিদা।

কিন্তু বাংলাদেশে শিশুদের উপযোগী কোন সাহিত্য পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দিতে বাংলা সাহিত্যে একটা নীতিবাদের যুগ এসেছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "সদ্ভাব শতক" জাতীয় গ্রন্থই তখন শিশুদের একমাত্র উপযোগী বলে বিবেচিত হত। এই সব নানা কারণে আমাদের দেশে শিশু রূপকথার হয়ত অনেক খানিই হারিয়ে গেছে। শিশুদের উপদেশ দেবার ছলে এ শ্রেণীর কবিতা ঠিক সাহিত্য শ্রেণীতে ফেলা চলে না। "উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার", "পিতামাতার প্রতি কর্তব্য", "কবিতায় ভারতের মানচিত্র শিক্ষা", এই সব কবিতা পড়ে শিশুরা যে বিশেষ খুশী হত সে কথা ত মনে হয় না। কেবল উপদেশ দিয়ে কোন রকম রসসৃষ্টি সম্ভব হয় না। যেমন নাটক বা উপন্যাসে কোন নীতিকথা প্রকট হয়ে উঠলে তার সাহিত্যিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা যায়।

শিশুসাহিত্যে যুগান্তর নিয়ে এলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর "শিশু", "শিশু ভোলানাথ", "ছড়া ও ছবি", "সে", ইত্যাদি গদ্য ও কবিতার বইগুলিতেই আমরা প্রথম আস্বাদ করি শিশুসাহিত্যের প্রকৃত রস। "জগৎ পারাবারের তীরে" যে শিশুরা খেলা করে তাদের ঠিক মধ্যিখানে এসে আসর জাঁকিয়ে তিনি বস্‌লেন। তাঁর মনে শিশুরা যে প্রচণ্ড দোলা জাগিয়ে তুল্‌ল তার ফলেই একে একে গড়ে উঠল বিচিত্র গান, কবিতা, ছড়া, গল্প। "শিশু" কাব্যগ্রন্থটির প্রতিটি কবিতাতে দেখি তাদের মনের বিচিত্র সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি। তার মধ্যে মধ্যে মায়ের টুক্‌রো টুক্‌রো কথা যেখানে কবি জুড়ে দিয়েছেন সেগুলি তাদের পক্ষে একটু দুর্বোধ্য হলেও তারা এক রকম করে বুঝে নেবার চেষ্টা করে। "ছড়া ও ছবির" উদ্ভট কবিতা শিশুমনে যে হাসির হাওয়া জাগিয়ে দেয় তার তুলনা বিরল। "সে" বইটার 'সে' ত এক আশ্চর্য ব্যাপার।... রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য নিয়ে সামান্য কিছু বল্‌তে গেলেও আলাদা একটি প্রবন্ধ দাঁড়ায়। শুধু এইটুকু বল্‌লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, আধুনিক যে বিরাট শিশুসাহিত্য গড়ে উঠ্‌ছে তার ভিত্তিস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শিশুদের সঙ্গে শিশু হয়ে তবেই যে তাদের সাহিত্য গড়ে তোলা সম্ভব এ কথা তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন।

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করিরে আলো,
তবু শিশির কণিকাটিরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।"—

এই কথাটিকে সার্থক করার জন্যই যেন তিনি শিশুসাহিত্যের লেখনী হাতে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর শিশুসাহিত্য নানা বৈচিত্র ও বর্ণ সম্ভারে অতুলনীয় হয়ে উঠেছে।

বর্তমান যুগে এক শিশুসাহিত্যিক গোষ্ঠির উদ্ভব হয়েছে যাঁদের প্রচেষ্টা সার্থকতার পথেই চলেছে। তবে তার আগে নাম করতে হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। তাঁর "পিয়ানোর গান", "পাল্‌কি চলে" ইত্যাদি কবিতা একদিন সত্যিই ছোটদের আনন্দ দিয়েছে; এবং আজও যারা পড়ে তার থেকে তারা আনন্দও পায়। এর পরেই নাম করতে হয় উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এবং তাঁর পরিবারবর্গের। নীতিকথা বাদ দিয়ে কেবল ছোটদের খুসী করবার জন্যই তাঁরা শিশুসাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সুকুমার রায়চৌধুরী যদি অকালে পরলোকগমন না করতেন তবে শিশুসাহিত্য ক্ষেত্রে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ আসনটি অধিকার করতে পারতেন। এগুারসনের সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে একটুও অত্যুক্তি হয় না। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি ছোটদের মনে যে গভীর রেখাপাত করে গেছেন তা আশ্চর্য। তাঁর "হ-জ-ব-র-ল", "আবোল তাবোল", "বহুরূপী", প্রভৃতি বইগুলির তুলনা বাংলা তথা ভারতীয় শিশুসাহিত্যেও বোধ হয় নেই। হেমেন্দ্রকুমার রায় এ্যাডভেঞ্চারের গল্পেও শিশুসাহিত্যে এক যুগান্তর এনেছিলেন। এ রূপকথা নয়, অবাস্তব কল্পনার আলেখ্যও নয়—সম্পূর্ণ নতুন এক সৃষ্টি। কিন্তু দিন দিন এই এ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলি সম্ভাব্যতার

ফ্লাইট্ লেফ্টেনান্ট্ শরদিন্দু দাশগুপ্ত
জন্ম—১০ অক্টোবর, ১৯২০
মৃত্যু—২২ মার্চ, ১৯৪৮

মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্ম—১৪ অক্টোবর, ১৯২৫
মৃত্যু—১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

নর্মদা প্রপাত

[আলোক শিল্পী ঃ দেবব্রত ঘোষ—চতুর্থ বর্ষ, ভূ-বিজ্ঞান

একাকী

[আলোক শিল্পী ঃ সত্যেন দে—ষষ্ঠ বর্ষ, ভূ-বিজ্ঞান

ফেরার পথে

[আলোক শিল্পী ঃ সত্যেন দে—ষষ্ঠ বর্ষ, ভূ-বিজ্ঞান

ঁমা ছাড়িয়ে অন্য এক রকম রূপকথায় দাঁড়িয়েছে। পুরনো গল্পকে উদ্ধার করে কৃতজ্ঞতা াজন হয়েছেন চন্দ্রকুমার দে ও দীনেশচন্দ্র সেন। আর সেগুলিকে নতুন ভাবে সঙ্কলিত রে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার শিশুসাহিত্যের একটা দিক্‌কে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

এই সব দেখে মনে হয় যে এখন শিশুসাহিত্য যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে াতে আশা করার অনেক অবকাশ আছে। শিশুমনের রহস্যের খোঁজ আজকাল লেখকরা শেষ মনযোগ দিয়েই নিচ্ছেন। শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক যুগের গবেষণা শিশু ক্ষার ক্ষেত্রেও যেমন, শিশুদের অবসর বিনোদনের পক্ষেও তেমনি প্রচুর সাহায্য করছে। াই জন্যেই এই অল্পদিনের মধ্যে শিশুসাহিত্যের শাখাটি যথেষ্ট উন্নতিলাভও করেছে। িছুদিন আগেও যেমন ছোটরা একখানি তাদের মনের মত বই পাবার আশায় উন্মুখ য়ে থাকৃত বর্তমানে সে অভাব নেই বললেও চলে। তবে শিশুসাহিত্য গড়ে তোলার ায় তাদের মনের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের সঙ্গে যাতে সম্পূর্ণ ছন্দ বজায় থাকে সে কথা ান মুহূর্তেও ভুল্‌লে চল্‌বে না। যাদের দাবী কবিগুরুর কাছেও তুচ্ছ হতে পারে নি াদের দাবী অক্ষয় হয়ে থাকবে। আনন্দের মধ্যেই শিক্ষার প্রথম চরণক্ষেপ। যে ঝ-অবুঝের দল প্রত্যেক পরিবারে আনন্দের বান আনে তাদের আনন্দ দেবার ভার তে হবে বড়দেরই। শিশুসাহিত্যের আজকের উন্নতিকেই চরম উন্নতি বলা যায় না। বিতায়, গানে, ছড়ায়, গল্পে, উদ্ভট কল্পনায় আরো এগিয়ে চলবে শিশুসাহিত্যের মজলিস।

চলিষ্ণু মুহূর্ত

নীলা দাশগুপ্ত

(পঞ্চম বর্ষ, আর্টস্)

গতির দুরন্ত স্রোতে ভেসে চলে তৃণখণ্ডগুলি,
কোন এক তটপ্রান্তে যদি কভু মুহূর্তের লাগি'
কোন এক বেণুচ্ছায়ে মর্মর উঠিয়াছিল জাগি'—
তাও ছেড়ে যেতে হবে, তবু কি সমস্ত যাব ভুলি' ?
বহুদিন ব'য়ে যাবে, আরও কত ছেড়ে চ'লে যাওয়া!
দীর্ঘায়িত হবে আরও পিছনের পথ ফেলে আসা,
নিরুদ্দেশ অনাগত পাবে আরও স্পষ্টতর ভাষা,
নিরর্থক মনে হবে আজিকার সব চাওয়া-পাওয়া

তবুও সহজ মনে চলে যাওয়া সে তো সোজা নয়,
আজিকার কুশাঙ্কুর মর্মে মর্মে তবু বিঁধে আছে,
একদিন দূরে যাবে জানি যা একান্ত রহে কাছে—
আজিকার রাত্রে তবু তারাগুলি দীপ্তদ্যুতিময়।
শূন্যের বিস্তার জুড়ে ঘূর্ণি ওঠে কালের বন্যায়,
বুদ্‌বুদ্‌ মুহূর্ত ভরে অনন্তের স্পর্শটুকু পায়॥

চলার পথে

বিমলকান্তি সেন
(তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান)

বিদায় বেলায় নাইক আমার কোনই অভিলাষ
(শুধু) তোমার হৃদে একটি কোণে
রাখ যদি আমায় মনে
করব নাক ছিন্ন আমি কোন দিন সে পাশ
বিদায় বেলায় নাইক আমার কোনই অভিলাষ।

বিলিয়ে আমি দেব মোরে এগিয়ে চলার মাঝে
শীতল ছায়ে পথের ধারে
জিরিয়ে নেব ক্ষণিক তরে
চলার পথে চলব আবার দিনের শেষে সাঁঝে
বিলিয়ে আমি দেব মোরে এগিয়ে চলার মাঝে।

দূর হতে দূর-দূরান্তরে এগিয়ে যাব আমি
পথের ধারে ঠাকুর ঘরে
বাজবে যখন ঘণ্টা জোরে
ক্ষণিক থেমে চলব আবার দেবতারে নমি
দূর হতে দূর-দূরান্তরে এগিয়ে যাব আমি।

আশীর্বাদে ভরব আমার রিক্ত ঝুলিখানি
পান্থ যবে দিনের শেষে
হতাশ হয়ে রইবে বসে
শূন্যমনে ঢেলে দেবো সম্বলেরি একটুখানি
আশীর্বাদে ভরব আমার রিক্ত ঝুলিখানি।

দূরপ্রসারী পথখানির না হয় যদি শেষ
পায়ে পায়ে এগিয়ে যাব
দিনের শেষে মিলিয়ে যাব
আঁধার মাঝে বাজবে শুধু পায়ে চলার রেশ;
দূরপ্রসারী পথখানির না হয় যদি শেষ।

কলতান

সুশান্তকুমার ঘোষ
(চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্)

নগরীর একপ্রান্তে জনতার মাঝে হারা আমি
প্রত্যহের আয়োজনে অবসন্ন দীর্ঘ দিবাযামী
পার হয়ে চলি কোনমতে। সম্মুখে সংসার
বহুতর দাবী নিয়ে ভয়াল ভ্রূকুটি হানে, আর
অবজ্ঞায় দলে যায় এ প্রাণের সকল মহিমা;
গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্রতায় সীমাহীনে দিতে চায় সীমা।
তবু যত তুচ্ছ দুঃখ, যত গ্লানি, যত পরাজয়,
দৈনিক দীনতা যত, অবহেলা, সব করি জয়
কোথা হতে চকিত ইঙ্গিত এক দিয়ে যায় দোল
চমকিত চিত্তে মোর। চমৎকৃত শুনি কলরোল—
দূর হতে যেন সুরমন্দাকিনী পথ খুঁজি ফিরে
আমার প্রাণের। আমার গানের ভাষা অতলাশ্রুনীরে

বেদনায় পরিম্লান মূর্ত হয়ে উঠিবারে চায়
অমর্ত্য ঝঙ্কারে কোন। ঘনগূঢ়গোপনব্যথায়
অতন্দ্রিত সাগরের ঢেউ যেন মোর ছন্দে মাগে
সব বিলাপের শেষ। একাকিনী যে তারকা জাগে
রজনীর অন্ধকারে, দুর্ভাগারে আলো দেখাবার
দারুণ দুরাশা নিয়ে, মনে হয় সেও যেন তার
প্রত্যাগত প্রত্যাশার দিন লাগি প্রতীক্ষিয়া থাকে।
বিচিত্রের ডাক শুনি ছন্নছাড়া জীবনের বাঁকে॥

অলস মধ্যাহ্নে মোর কত না কিশোর কিশলয়
—সে সবুজ সজীবতা— জানায়েছে অবুঝ দুর্জয়
ডাক, ব্যাকুল ব্যগ্রতাভরে। তাহার অস্ফুটমন্ত্রে
আমন্ত্রণ রচি গেছে নন্দন লোকের, বীণাতন্ত্রে
দক্ষিণ বাতাস তার দাক্ষিণ্যে মধুর সদা। কত
রজনীতে নবমল্লিকার বাস দুরাশার মতো
শিহরণ আনিয়াছে মোর মগ্ন চৈতন্যের তলে,
মোর গানে সাড়া আনে বারে বারে প্রহত উপলে।

উর্ধ্বে ঐ সুনীল সুচিরশ্রী মহানৈঃশব্দ্যের তীরে
সঞ্চারিত করি দিল আমার গানের মীড়ে মীড়ে
নিরুদ্ধ বেদনা তার। মূক মৃত্তিকার ভালোবাসা
ভাষাহীন প্রাণের মন্ত্রে রণিয়া তুলেছে আশা
চঞ্চল এ চিত্তে মোর। অন্তরে করেছি অনুভব
এ ধরার ধূলিতলে রয়েছে কি বৈকুণ্ঠ-বৈভব!
অকুণ্ঠ তাহারি দান লুণ্ঠন করেছি প্রাণভরে।
তবু যেন কুহেলীগুণ্ঠনতলে যায় সরে সরে
কী এক অজানা মোহ! সু-দুস্তর আনন্দ আবেগে
উন্মুখ হয়েছে মন অভাবনীয়ের ছোঁয়া লেগে।
উন্মত্ত অধীর হিয়া নেচে ওঠে উত্তরঙ্গতালে।
প্রচ্ছন্নের ছায়া মোরে আচ্ছন্ন করেছে মায়াজালে॥

এ মাটির পরে আছে উৎসারিত আনন্দের ধার,
আর আছে আশ্বাস অপরিমেয় অন্তরে আমার,
নিত্যসাথী আছে মোর মুখরিত বীণার স্পন্দন ;
তাই নিয়ে রচি আমি নিখিলের এ অভিনন্দন।
প্রাণের উৎসবে যারা উচ্ছল পুলকে ওঠে মেতে,
তাদের সবারে চাই আনন্দে নিবিড় করে পেতে
ছন্দের বন্ধনে। ভুলিব সকল বিসংবাদ,
পাই যদি নিখিলের আনন্দের এতটুকু সামান্য প্রসাদ,
সব ক্ষয়ক্ষতিপরে রেখে যাব সুরের সম্মতি।
ধরণীর ধূলিপরে রবে মোর প্রাণের প্রণতি ॥

তিরিশে জানুয়ারি

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য
(দ্বিতীয় বর্ষ, আর্টস)

ডুবিয়া গিয়াছে সূর্য আজি,
সীমাহীন কালো নীরে ;
জলধি-তলের শর্বরী হায় !
ধরায় ফেলেছে ঘিরে।
মরণ-বিজয়ী শান্তির কোলে
পড়েছে ঢলিয়া ঘুমে ;
জীবন তাহারে অভিষেক করে
ললাট আঁকিয়া চুমে।
নূতন প্রভাতে উদিবে সে কোন
নূতন সাগর তীরে ;—
মহা-জীবনের স্নিগ্ধ আশীষ
হাসিবে তাহার শিরে ॥

পুস্তক পরিচয়

সুগম হিন্দী শিক্ষা—(বঙ্গভাষাভাষীদের হিন্দী শিখিবার জন্য)। অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ লালা। "বঙ্গাল হিন্দী মণ্ডল," ৮ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। ১৩৫৪ সন। মূল্য এক টাকা।

অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ লালা বাঙ্গালীদের জন্য হিন্দী শিক্ষার সাহায্য কল্পে 'সুগম হিন্দী শিক্ষা' লিখিয়া ভালই করিয়াছেন, কারণ একে তো হিন্দী শিখিবার চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাতে আবার অভিজ্ঞ শিক্ষকের রচিত বইয়ের সংখ্যা বড় কম। শিবনারায়ণবাবু অভিজ্ঞ শিক্ষক, সুতরাং তিনি লিখিলে বই যে ভালই হইবে, তাহা আশা করা যায়।

বাঙ্গালীর হিন্দী শিখিবার প্রস্তাব আজ নূতন নহে; ভূদেববাবু ও রাজনারায়ণবাবুও সে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। শুধু তাহা নয়, রাজনারায়ণবাবু বাঙ্গালীকে সর্বভারতের মহামিলনের ভাষারূপে মহাহিন্দুসভায় প্রয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন, রাষ্ট্রভাষার পরিকল্পনার বীজ তো ছিল সেখানেই। তবে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। মহাত্মা গান্ধী যে ভাষার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা কিন্তু সংস্কৃতঘেঁষা হিন্দী নয়, হিন্দী-হিন্দুস্থানী, উত্তর ভারতের বহু লোক যে ভাষা মুখে বলে ও দুই লিপিতে লেখে, কেহ নাগরী লিপিতে কেহ বা ফারসী অক্ষরে, সেই সাধারণের ব্যবহৃত হিন্দী ভাষাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে (ইহাকে 'মিশ্রঃ প্রাদেশিক', নামে অভিহিত হইতে দেখিয়াছি!) প্রচলন করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের চেষ্টা এখনও সেই পথেই আছে, কিন্তু ইহার বিরোধের চেষ্টাও হইতেছে এবং হইবে। হিন্দীতে লিখিত ভাষাই কি সর্বত্র—কোথাও—কথিত হয়? অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধে তো সেকথা বলিতে পারি না। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে সে দাবী করিতে পারি না, ইংরাজি সম্বন্ধেও না।

বইখানির সাতটি প্রকরণ—শব্দ, লিঙ্গ বচন কারক ভেদে শব্দের রূপান্তর, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া অব্যয় ও বিভক্তি। প্রকরণের শেষে আছে বাক্যরচনা, শব্দাবলী, অনুবাদ ও অনুশীলনী।

স্থানে স্থানে এক আধটু সংক্ষেপ করা যাইত বলিয়া মনে হয়। যেমন, ৩ পৃঃ, রেফ কাহাকে বলে বাঙ্গালী ছাত্রদের তাহা বুঝাইয়া বলিবার দরকার ছিল না—রফলা ও রেফ, এই দুইয়ের প্রভেদ সাধারণত সকলেরই জানা আছে। ৬ পৃষ্ঠায় 'মঙ্গল' 'মংগল' এই যে বানান ভেদ, ইহা বানান সংস্কারের কর্তাদের অভিমত, এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনভিমত নয়। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ও অনুরূপ বর্ণলিপি সংস্কারের পক্ষেই মত দিয়াছিলেন। উচ্চারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক লালা যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা ছাত্রদের খুবই কাজে লাগিবে। তৃতীয় পাঠে ১১ পৃঃ 'কমীজ'—কথাটা পোর্তুগীস কি? 'পঢ়না' ও 'পড়না'—দুইয়ের বাংলা কি 'পড়া', না 'পরা' ও 'পড়া'?

সন্ধি ও অন্যান্য ব্যাপারে হিন্দী শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দও দিলে ছাত্রদের সুবিধা হইত। একত্র সমস্ত অনুশীলনী না দিয়া বিভিন্ন প্রকরণভেদে আরও কিছু অনুশীলনী দিলে অভ্যাস করা সহজ হইত। অধ্যাপক লালার বইখানি শিক্ষার্থীদের কাজে লাগিবে।

প্রিয়রঞ্জন সেন

আমাদের কথা

ষ্টুডেন্টস্ য়ুনিয়ন কাউন্সিল ১৯৪৭-৪৮

বাৎসরিক কার্যের সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সাধারণ বিভাগ ঃ

সারা ভারতের তথা সারা পৃথিবীর এক ঘোর দুর্দিনে এবছর আমরা কাজে হাত দিয়েছি। মহাত্মাজীর তিরোভাব দিবস,—জাতীয় ইতিহাসের পরম স্মরণীয় দিন—৩০শে জানুয়ারী। তাঁর অমর আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করে এবছর আমাদের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এর পর থেকে সাধারণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষৎ তার কাজ চালিয়ে এসেছে। পরিষৎ-এর অধিবেশন বসেছে অনেকবার। তাতে সদস্যগণ মূল্যবান আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষৎ-এর কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকেরাও তাঁদের নির্দ্ধারিত কর্মপদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে পালন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন।

বিতর্ক বিভাগ এবছর দুটি অনুষ্ঠান করেছেন। আন্তঃশ্রেণী-বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ছাত্রেরা খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এই বিভাগ থেকে এবছর আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এতে যোগদান করেছিলেন।

রবীন্দ্র পরিষৎ-এর প্রথম অনুষ্ঠান হয় 'বসন্তোৎসব'। এ ছাড়া এই বিভাগ বঙ্কিম-প্রয়াণদিবস, রবীন্দ্র-প্রয়াণ দিবস প্রভৃতি পালন করেছেন। মাঝে মাঝে সাহিত্যবাসরের বৈঠকের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এই বিভাগের সর্বশেষ অনুষ্ঠান বর্ষামঙ্গল সত্যিই উপভোগ্য হয়েছিল।

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে রবীন্দ্র পরিষৎ-এর সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার দে কিছুদিন আগে নানা কারণে পদত্যাগ করেন।

সমাজ-সেবা-বিভাগ তাদের কাজ চালিয়েছেন ভালভাবেই। এই বিভাগ থেকে কলেজের বিরাম-পীঠিকায় একটি সান্ধ্যবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। কলিকাতা কুষ্ঠ-নিবারণী সাহায্য তহবিলের জন্য এঁরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। পূজাবকাশে এই বিভাগ হুগলী জেলায় সেবাকার্যের জন্য গিয়েছিলেন।

অভিনয় বিভাগ এবছর একটিমাত্র অনুষ্ঠান করেছেন। এবছরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এই অনুষ্ঠানটি ২৭শে সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। এঁরা "বনফুল" প্রণীত শ্রীমধুসূদন" নাটক অভিনয় করেন। এঁদের সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় প্রতিটি দর্শককে মুগ্ধ করে। স্বয়ং "বনফুল" উপস্থিত ছিলেন। বিরাম পীঠিকা বিভাগ থেকে এবছর বেশী কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে বছরের প্রথমে এঁদের জল-বিহার ছাত্রদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সম্প্রতি এই বিভাগ ছাত্রদের মধ্যে টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন।

প্রকাশনা বিভাগ বহু চেষ্টা করেও এবছর একটির বেশী পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে নি। কাগজের দুর্মূল্যতা ইত্যাদি নানা বাধাবিঘ্ন এঁদের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই আমাদের কর্মশক্তি সীমাবদ্ধ ছিলনা। বাইরের জগতের সঙ্গেও সমানভাবে তাল রেখে চলেছে আমাদের পরিষৎ। আমাদের ছাত্রাবাসের বন্ধুরা তাঁদের তত্ত্বধায়কের অপসারণ দাবীতে

আন্দোলন করেন। পরিষৎ তাঁদের কাজে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল ও সাতদিন ক্রমান্বয়ে ধর্মঘট চালিয়েছিল।

এর পর আমাদের অভিযোগের পালা। পরিষৎ-এর একটি পৃথক ঘরের জন্য আমরা বহুবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন ফলোদয় হয়নি। কলেজের কোষাধ্যক্ষ শ্রীরমেশচন্দ্র নন্দী মহাশয় আমাদের কাজের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঐ বিভাগের কাজ তাঁর একার পক্ষে চালান প্রায়ই বিশেষ কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাঁর সহকারী হিসাবে আর একজন কোষাধ্যক্ষ নিয়োজিত হলে ছাত্রদের ও তাঁর উভয় পক্ষেরই বিশেষ উপকার হয়।

এবছরে আমাদের প্রাক্তন অধ্যাপকদের মধ্যে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী ইহধাম ত্যাগ করে গেছেন। তাঁরা যথাক্রমে ইংরাজী ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। আমরা তাঁদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আমাদের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করে কর্মান্তরে নিয়োজিত হয়েছেন। তাঁর স্থলে আমরা শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয়কে আমাদের অধ্যক্ষ হিসাবে পেয়েছি। তিনি ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়ে ও আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়ে আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

আশীষকুমার চক্রবর্তী—সাধারণ সম্পাদক।

প্রকাশনা বিভাগ ঃ

অবশেষে কলেজ পত্রিকা প্রকাশিত হল। পত্রিকা প্রকাশের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি কিনা জানি না, তবু কৃত্রিম জড়তা ও বিনয়সুলভ সংকোচের আশ্রয় নিয়েই প্রথামত কিছু লিখতে যাচ্ছি।

১৯৪৮-এর জানুয়ারী মাসে আমাদের কলেজ পত্রিকার উনত্রিংশৎ সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন 'বিভাগীয় সম্পাদক' শ্রীজীবনলাল দেব এই সংখ্যার প্রকাশনা কার্যে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। কলেজ পত্রিকার এই সংখ্যা হয়ত কলেবরে একটু শীর্ণতা লাভ করেছে, এর আত্মপ্রকাশও বোধহয় একটু দেরীতে হল। তবু আশা করি দেহভারের লঘুতার সাথে সাথে এর রচনাসম্ভারেরও গুরুত্ব বেড়েছে।

বিভাগীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় কর্মবাহুল্য ও সময়াভাব অতিক্রম করেও আমাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দানে বাধিত করেছেন। এ ছাড়া, সাধারণ সম্পাদক শ্রীআশীষকুমার চক্রবর্তী ও অন্যান্য সকল বিভাগীয় সম্পাদক সর্ববিধ ভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

আর কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি আমার সহঃ সমিতির সভ্যগণকে তাদের অকুণ্ঠিত সাহায্যের জন্য।

পরিশেষে কলেজ ছাত্র-সংসদের কর্তৃপক্ষের একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। একটু অবান্তর হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, সংসদের বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রদত্ত অর্থের সুবণ্টন হয় নি। 'রবীন্দ্র পরিষৎ' ও 'বিরাম পীঠিকা' এই বিভাগদু'টীর অনুষ্ঠান প্রাচুর্য এবং ব্যয়বাহুল্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন কিছু বেশী বটে, তবুও আমার মনে হয় মঞ্জুর অর্থের চেয়ে অনেক অল্পতেই, সংযতভাবে কর্ম পরিচালনা করলে এ দু'টী বিভাগের অনুষ্ঠান কর্মসূচী অনাড়ম্বর সম্পূর্ণতার সাথে সমাপন করা যায়। নাট্যবিভাগের পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য। এই বিভাগগুলিতে নিপুণতাহীন অর্থপ্রদানে যে অর্থসংকোচের সৃষ্টি, তাতে প্রকাশনা বিভাগকে অত্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। আমার প্রার্থনা কর্তৃপক্ষ যেন এবার থেকে এই সম্বন্ধে প্রকৃত অনুসন্ধান করে সব কিছু

অবহিত হয়ে ছাত্র-সংসদের বিভাগগুলিতে অর্থের পুনর্বণ্টন করেন। আমার এই কথাগুলিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অপ্রীতি-প্রসূত চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে ধরে নিয়ে কেউ যেন কোনরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা না করেন।

লেখকদের সর্বশেষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নির্মলকুমার সরকার—সম্পাদক

বিরাম পীঠিকা ঃ

৯ই মার্চ মংগলবার আমরা বাৎসরিক ষ্টিমার পার্টীর আয়োজন করি। কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন। সহরের কোলাহল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন আমাদের ষ্টিমার গঙ্গাবক্ষে ভেসে চল্‌লো তখন আমরা যেন এক নূতন লোকের সন্ধান পেয়েছিলাম। সংগীত মুখরিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা বেলা প্রায় দুইটার সময়ে চন্দননগর পৌছাই। সেখান থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনস্, শিবপুর। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমরা কলিকাতায় ফিরে আসি। অধ্যাপক ডাঃ মামুদ অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও উপভোগ্য করে তুলতে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁকে ও অন্যান্য সকলকে তাঁদের প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বিরাম পীঠিকায় দাবা, ক্যারম্, ও দু'টি টেবিল টেনিস বোর্ড্ আছে। দেশবিদেশের পত্রিকা পড়বার সুব্যবস্থা আছে।

পরিশেষে স্বল্পপরিসর বিশ্রাম কক্ষগুলির স্থানাভাবের কথা আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করছি; এ বিষয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নির্মল মিত্র—সম্পাদক

সমাজ সেবা বিভাগ ঃ

সমাজ সেবা বিভাগের সম্পাদক হয়েই দেখতে পেলাম যে একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা আমার ওপর পড়ল।

আজকে যদি সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি তবে দেখতে পাব যে সব প্রশ্নই জড়িয়ে আছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে। যে শোষণের বেড়াজাল আজ সমাজের বেশীর ভাগ লোককে আবদ্ধ রেখেছে সেই শোষণের জালকে ছিন্ন করতে না পারলে সমাজ প্রগতির কথা চিন্তা করা বাতুলতা। এই ব্যবস্থাকে ছিন্ন করে একটি নূতন শোষণহীন সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে ছাত্রদেরও একটা বিশেষ কর্তব্য আছে। সেটা হচ্ছে নিঃস্ব জনসাধারণকে সাধ্যমত ঔষধপত্র, দুধ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা। অন্যদিকে তার চাইতেও বেশী কর্তব্য এই বিরাট শোষিত জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করা ও তাদের দুর্গতির কারণ সম্পর্কে সচেতন করা। এই সচেতনতাই তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে ভবিষ্যত শোষনহীন সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যে পৌছুবার সংগ্রামে যথাযথ অংশ গ্রহণ করতে।

এটা হচ্ছে সাধারণ পরিকল্পনা। কাজের দিক থেকে নানাবিধ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের কাজ বেশ ভালভাবেই অগ্রসর হয়েছে। এই বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য যে সাবকমিটি গঠন করা হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী।

নানাবিধ কাজের ভেতর দিয়ে এই বিভাগের কর্মীরা অগ্রসর হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কুষ্ঠ-ত্রাণ সমিতির সাহায্যকল্পে যে চেষ্টা করেছেন তাতে এই বিভাগের ছেলেরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন। Anti-Leprosy Fund-এর জন্য আমরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাঁদা তুলে দেই। তারপর আমরা এগিয়ে যাই স্থায়ী কাজ করবার, প্রচেষ্টায়। কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা একটি "নৈশ বিদ্যালয়" খুলতে সমর্থ হই—

সেখানে কলেজের পাশের বস্তীর ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। প্রথমে পাঁচজন থেকে শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের ওপর গিয়ে পৌঁছায়। এদের ভেতর উৎসাহী ও সত্যিকারের মেধাবী ছাত্রের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সমাজের সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সংকট তাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। বই, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি কিনে দেবার ফলে এদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা যায়। আগামী বছরের ভাবী ছাত্র-সংসদের কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি যে, যে গভীর কর্মনিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে এই নৈশ বিদ্যালয়ের প্রথম গোড়াপত্তন করতে পেরেছি সেটা যেন অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়ে যায়। এটা যেন বরাবরের মত একটা আবশ্যিক কর্মসূচী হিসেবে গৃহীত হয়। নতুবা এই ক্ষণস্থায়ীত্ব কোন প্রকার সুফল প্রসব করবে না বলেই আমার ধারণা।

এখানেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায় নি। বাংলার অন্যতম শত্রু "ম্যালেরিয়া" নিবারণকল্পে এই বিভাগের কর্মীরা ঘুরে বেড়িয়েছে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে। পুজোর ছুটীর প্রারম্ভে একদল স্বেচ্ছাসেবক রওনা হয় হুগলী জেলার এক প্রান্তে, ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত অঞ্চলে। এই কাজে গিয়েছিলেন সুকোমল দাশ গুপ্ত, মিহির গাংগুলী, অজিত চক্রবর্তী, বানিশ চন্দ, বরুণ বোস, কল্যাণ রায়, সুজিত গুহঠাকুরতা ও বিমল মজুমদার। হুগলী জেলার ইলিপুর গ্রামে ঘাঁটী করে আশে পাশের প্রায় দশটি গ্রাম ঘুরে ঔষধপত্র ও দুধ ইত্যাদি বিলি করা হয়। এখানে প্রায় প্রত্যেকটী ঘরেই কমপক্ষে একটি দুইটী করে ম্যালেরিয়া রুগী দেখা যায়। হুকওয়াম´ রোগও এখানে সম্প্রতি বিস্তার লাভ করেছে। দিনমজুরীই এখানকার লোকের জীবিকার উপায়। কাজের অভাবে উপার্জনও বন্ধ থাকে। বড় বড় "গ্রাম উন্নয়ণ পরিকল্পনার" বিন্দুমাত্র আভাষ এখানে দেখতে পাওয়া গেল না এবং অদুর ভবিষ্যতে তার আশাও কম।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুঃস্থ লোককে এই বিভাগ থেকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়েছে।

সর্বশেষে এটা বিশেষ ভাবে বলা দরকার যে দেশকে এই দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ছাত্রদের এগিয়ে আসতে হবে—বুঝতে হবে ও সকলকে বোঝাতে হবে মূল সমস্যা কোথায় ও এর সমাধানের পথ কী। এই গুরু দায়িত্ব আজ প্রত্যেকটী প্রগতিশীল ছাত্রকে গ্রহণ করতে হবে—তবেই হবে প্রকৃত সমাজ সেবা।

সুকোমল দাশগুপ্ত—সম্পাদক

বিতর্ক সমিতি ঃ

আমাদের উপর যে দায়িত্ব এসে পড়েছিল আমরা তা' সাফল্যপূর্ণভাবেই বহন করবার চেষ্টা করেছি। এবছরে উল্লেখযোগ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ বিতর্ক প্রতিযোগিতা। আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রীমোহিত সেন ও শ্রীশিবেন্দু ঘোষ যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে বাংলার প্রথম ও তৃতীয় ছাত্রবক্তা রূপে পরিগণিত হয়েছেন। গত ১৪ই আগষ্ট প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্যোগে আন্তঃকলেজীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতা এই বছরেই প্রথম আরম্ভ হল এবং আমরা তা ত্রুটীহীন ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। এই প্রসঙ্গে যে সব কলেজ যোগদান করেছিলেন, তাঁদের আমরা এই কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ নিহাররঞ্জন রায় এবং বিচারক ছিলেন অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য (স্কটিশ চার্চ), ডাঃ নরেশচন্দ্র রায় (বিশ্ববিদ্যালয়) ও অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র (প্রেসিডেন্সি)। প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান যথাক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ অধিকার করেন। আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রীমোহিত সেন ও শ্রীশিবেন্দু ঘোষ, এবং সেন্ট জেভিয়াস´ কলেজের শ্রীউৎপল দত্ত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তার সম্মান লাভ করেন।

গত ২রা আগষ্ট আমরা বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের এক বিতর্ক সম্মিলনীর আয়োজন করেছিলাম। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীকল্যাণ দত্ত, অধ্যাপক অম্লানকুসুম দত্ত, শ্রীঅজিত গুপ্ত, ও ব্যারিষ্টার শ্রীসাধন গুপ্ত। বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅনিন্দ্য দত্ত, শ্রীনীলমনি লাহিড়ী, শ্রীমোহিত সেন ও শ্রীশিবেন্দু ঘোষ। যাঁরা অংশ গ্রহণ

রে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন তাঁদের আমরা কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই ধরণের প্রীতিসম্মেলন নিতান্তই প্রয়োজনীয় এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরো হবে। অতি দুঃখের সঙ্গেই জানাতে হচ্ছে লোতে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা করার সংকল্প ছিল, কিন্তু এই বছরের কলেজ ছাত্র-সংসদের কার্যকাল তিক্রান্তপ্রায় বলে তা আর সম্ভবপর হয়ে উঠলো না।

এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের যাঁরা উপস্থিতি ও সহানুভূতি দিয়ে এবং অংশ নিয়ে এই সব নুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিলেন।

কলেজের অর্থ সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যাপারে নিযুক্ত, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নন্দী কলেজ ছাত্র-সংসদের অর্থ ত প্রদান ও বণ্টন করে আমাদের একনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে সর্বশেষে আমার আন্তরিক ন্যবাদ জানাচ্ছি।

অনিল সাহা—সম্পাদক

রবীন্দ্র-পরিষৎ ঃ

অতীতের ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে এ বৎসরের রবীন্দ্র-পরিষৎও সুষ্ঠুভাবে তার কার্য পরিচালনা করে সেছে। নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়েছে বলে এর পূর্বের কয়েক বৎসর পরিষৎ-এর জ ব্যাহত হয়েছে মাঝে মাঝে। এ বৎসর রবীন্দ্র-পরিষৎ-এর সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছে পুরোনো সেই রাকে ফিরিয়ে এনে নূতন করে কার্যারম্ভ। ছাত্রছাত্রীদের ঐকান্তিক সহযোগিতার ফলে সম্ভব হয়েছে ই উদ্দেশ্য সফল করা।

কার্যভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই পরিষৎ-এর প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছে ২২শে মার্চ, ১৯৪৮—সন্ত-উৎসব"। আর্টস লাইব্রেরী হলে ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ যুক্ত অপূর্বকুমার চন্দ। 'রবীন্দ্রনাথ' থেকে সংকলিত বসন্তের একটি ভাবনাট্য সংগীত ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে ভিনীত হয়। কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা যোগ দেন তাঁরা ছেন জগদিন্দ্রনাথ ঘটক, পুষ্পেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিমল কান্তি সেন ও কল্যাণ দাশগুপ্ত প্রভৃতি। ছাত্রীদের মধ্যে ম করব অণু দত্ত, সতী ভট্টাচার্য ও লীলা মুকতাংকরের; সংগীত পরিচালনা করেন অনসূয়া গুপ্ত। যন্ত্রসংগীতে শ গ্রহণ করেন মুকুল দাস ও অমল দেব।

পরিষৎ-এর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান—৮ই এপ্রিল, 'বংকিম প্রয়াণ দিবস'। পদার্থবিজ্ঞান পাঠগৃহে ডাঃ শ্রীকুমার ন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান হয়। অনসূয়া গুপ্তের 'বন্দেমাতরম' সংগীতটি দিয়েই অনুষ্ঠানটির ভারম্ভ হয়, অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্য থেকে শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী, বংকিমচন্দ্র সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষায় কিছু বলেন। ত্রদের মধ্যে জগদিন্দ্রনাথ ঘটক ও বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হাশয়ের ভাবগভীর আলোচনাটি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

গত ২রা মে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের উদ্যোগে আন্তঃকলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা নুষ্ঠিত হয়। কলেজের প্রতিনিধি স্বরূপ রবীন্দ্র-পরিষৎ চারজন প্রতিযোগী প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে জগদিন্দ্রনাথ টক প্রথম স্থান (ছাত্র বিভাগ) অধিকার করেন।

৭ই আগষ্ট তারিখে আর্টস লাইব্রেরী হলে অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় ঘোষের সভাপতিত্বে 'রবীন্দ্র-স্মরণে' নুষ্ঠান হয়। কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সভাপতি স্বরচিত কবিতা দিয়েই তাঁর ভাষণ মাপ্ত করেন।

এরপর উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান 'বর্ষামংগল'। ১৪ই আগষ্ট আর্টস লাইব্রেরী হলে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর পৌরোহিত্যে উৎসবটি সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে সংকলিত বর্ষার কথা ও গান দিয়ে একটি 'গীতিবিচিত্রা'ই ছিল উৎসবের মূল অংগ। বহু বরেণ্য অতিথি উৎসবের শোভাবর্ধন করেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুক্ত সরোজ দাস, শ্রীযুক্ত অপূর্ব চন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যে সব ছাত্র উৎসবটিকে সফল করে তাঁদের মধ্যে সুগত দাস, সুরজিত গুহ, প্রসূন সেনগুপ্ত, পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের নাম করব; ছাত্রীদের মধ্যে অনু দত্ত, সুরভি রায় চৌধুরী, লিপিকা বসুর নাম করতে হয়। সমস্ত গীতানুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন অনসূয়া গুপ্ত। যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন ৺অরুণ কুমার নন্দী।

বর্তমান বৎসরের রবীন্দ্র-পরিষৎ-এর অভিনব কীর্তি হচ্ছে 'সাহিত্য-বাসর' প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য-বাসরের পাক্ষিক ও মাসিক অধিবেশনে ছাত্রদের রচনা ইত্যাদির পাঠ, সমালোচনা ও সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মনে সাহিত্যরসের সঞ্চার করাই পরিষৎ-এর উদ্দেশ্য। ছাত্রদের সর্বাংগীন সহানুভূতি ও সহযোগিতাই এই উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল করতে পারে। এ বৎসর সাহিত্য-বাসর উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত। উদ্বোধনী দিবসের আলোচনার বিষয় ছিল "ভারতীয় কবি প্রকৃতির ব্যাখ্যাতারূপে রবীন্দ্রনাথ"। পরবর্তী রবীন্দ্র-পরিষৎ-এর কাজে এই সাহিত্য-বাসরের উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর সফল হয়ে উঠবে—এই কামনাই করি।

সন্তোষকুমার দে—সম্পাদক

ভূবিদ্যা পরিষৎ ঃ

ঐতিহ্য বজায় রেখে নতুন পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করে এই পরিষৎ এগিয়ে চলেছে সগৌরবে। ১৯৪৭-৪৮ সালে পরিষৎ-এর সবচেয়ে বড় গৌরব ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ও সুস্থ আবহাওয়ার পরিবর্ধন।

বৎসরের গোড়ার দিকে ইডেন উদ্যানে নিখিল ভারত প্রদর্শনীর বিজ্ঞান মন্দিরের সাধারণ ও ভূবিদ্যা বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে অপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এই পরিষৎ। সাধারণ বিভাগের প্রদর্শনী স্বীকৃত হয়েছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বলে এবং এর সমস্ত গৌরব দাবী করতে পারে পরিষৎ-এর সভ্যেরা।

এই বৎসরে মোট পাঁচটি সাধারণ অধিবেশন হয়েছে এবং তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বর্মা অয়েল কোম্পানীর মিঃ জে, কোট্স্, ফুয়েল রিসার্চ ইন্স্টিট্যুটের মিঃ হুইটেকার, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ডাঃ কে, জেকব এবং ডাঃ পি, কে, ঘোষ। পঞ্চম অধিবেশনে ব্রিটিশ ইন্ফরমেশন্ সার্ভিস্-এর সৌজন্যে কয়েকটি সবাক্চিত্র দেখানো হয়েছিল। এ ছাড়া দু'টি বিশেষ অধিবেশন হয়, একটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ৺শরৎলাল বিশ্বাসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং অপরটিতে পরিষৎ-এর সভাপতি অধ্যাপক নির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আন্তর্জাতিক ভূবিদ্যা সম্মেলনে যোগদান নিমিত্ত বিলাত গমনের পূর্বে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠচক্রের অধিবেশনে ছাত্রদের আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

পরিষৎ-এর উদ্যোগে দু'টি অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিলো, ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী ও গ্রামোফোন কোম্পানীতে।

বুলেটিন দ্বারা পরিষৎ-এর কার্যক্রম প্রকাশ যথারীতি চলেছে। আমাদের বাৎসরিক "ভূবিদ্যা" আত্ম-প্রকাশ করেছে এ বৎসর বর্ধিত কলেবরে। পাঠাগার তার কাজ আরম্ভ করেছে এবং এ বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা আশাপ্রদ।

'চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা' এ বৎসর পরিষৎ-এর নবতম পরিকল্পনা। এ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে একটি সাবকমিটি এবং তাঁরা এর উন্নতি বিধানে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। প্রতি শুক্রবার, কলেজের অবসর সময়ে ভূবিদ্যা বিভাগের বক্তৃতাগারে টীকা সহ শিক্ষামূলক চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন হয়েছে তাঁদের প্রচেষ্টায়।

পরিষৎ-এর বার্ষিক অধিবেশন হয়েছে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর। প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়। এই অধিবেশনে পরিষৎ-এর নতুন কর্মীবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন এবং আমরা আশা পোষণ করি তাঁরা একে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আরও গৌরবের পথে, স্থাপন করবেন স্বাধীন দেশের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে।

গোপীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক

বাংলা পাঠ-গোষ্ঠী ঃ

আমাদের পূর্বতনদের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছিলাম তা হচ্ছে আমাদের পাঠ-গোষ্ঠীর জন্য একটি মৌখিক মঞ্জুরনামা মাত্র। এর পর থেকে আমাদের পাঠ-গোষ্ঠীর নিমিত্ত একটি পৃথক কক্ষের জন্য আমরা বহুকাল থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদনের থালা বয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু বাংলা ভাষা সরকারী অনুমোদন পেলেও সরকারী বিদ্যালয়ে তার মর্যাদা বাড়ে নি। তাই কর্তৃপক্ষ কখনও আমাদের প্রতি সদয় হচ্ছেন, কখনও বিরূপ।

সাহিত্যবিভাগের পাঠাগার থেকেও কোন পুস্তকাদি দেবার বিশেষ বন্দোবস্ত আমাদের নেই। পাঠ-গোষ্ঠীর আবেদন মঞ্জুর হয়েছে অথচ তাকে কার্যে পরিণত করবার দিকে কর্তৃপক্ষ কোন দৃষ্টিই দিচ্ছেন না। ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্মিলিত বহু চেষ্টার ফলেও কোন সুফল দেখা যায় নি। এই অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আমাদের পূর্বতনরা পার হয়ে গেছেন, আমাদেরও দু'বছর কাটল। ভবিষ্যত ছাত্রদের ঐকান্তিক চেষ্টায় যেন আজকের স্বপ্ন সফল হয় এই কামনা করি।

সুরভি রায়চৌধুরী—সম্পাদিকা

রাজনীতি সেমিনার ঃ

সাময়িক পরিস্থিতির জন্য আমাদের পড়াশোনার কাজ আরম্ভ হয়েছে দেরীতে। তার ওপর, কেন জানি না, রাজনীতির অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় দুর্গাগতি চট্টরাজ মহাশয়ের অবসর গ্রহণের পর উক্ত পদটি প্রায় এক বছর শূন্য থেকে যায়। ফলে রাজনীতি বিষয়টী ভালোভাবে পড়বার সুযোগ আমরা পাই নি। আর এই সব কারণেই এই বিষয়ে কোনও আলোচনা সভার আয়োজন করা সম্ভব হয় নি এ বছর।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দুর্গাগতি চট্টরাজ মহাশয়ের অবসর গ্রহণে একটী বিদায়-সভার আয়োজন করে আমরা তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করেছিলাম।

এক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি যে রাজনীতি সেমিনার রাখা সম্পূর্ণ অর্থহীন। চল্লিশ, পঞ্চাশ জন ছাত্র যেখানে, সেখানে খানকতক বর্তমানে অনাবশ্যক বই এনে ফেলে রাখার সার্থকতা কী? কলেজের সাধারণ পাঠাগার থেকে, কলেজের আইন মেনে, প্রয়োজনীয় কোনও বই-ই সেমিনার লাইব্রেরীতে আনা যায় না। কলেজের ভবিষ্যত ছাত্রবন্ধুদের কাছে আবেদন করছি এই বিষয়ে নজর দিতে। কর্তৃপক্ষও এই দিকে মন দেবেন আশা করি।

সেমিনারের ঘরে ওপর থেকে এতো জল পড়ে যে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয়, বহুদিন থেকে লেখালেখি করেও কোনও ফল হয় নি।

সব শেষে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এই জন্যে যে তাঁর কাছে যখনই যে বিষয় নিয়ে গিয়েছি তখনই সেই বিষয়ে সাহায্য এবং উপদেশ পেয়েছি অপরিসীম।

তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক

দর্শন সেমিনার ঃ

এবার সেমিনারে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু সাধিত হয় নি। দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়নকে পূর্ণতর ও সার্থক করার প্রয়াসে বিদ্যার্থীদের নবীন মনের সুষ্ঠু বিকাশের আশ্রয় হিসাবেই এই সেমিনারের প্রকৃত সার্থকতা।

কিন্তু লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সে সার্থকতার পথে প্রধান বাধা—আমাদের বিভাগীয় সভ্যবৃন্দের উৎসাহের অভাব।

একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ-সংগ্রহ সেমিনারের প্রধান অঙ্গ। ৭০টি বই নিয়ে আমরা শুরু করি। ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারটিকে যথাসাধ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ছাত্রদের উপকারী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহার্য বইগুলি পূর্বসংগ্রহ থেকে বাদ দিয়ে ছাত্রদের অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বই রাখা হয়েছে। দর্শনের (বিজ্ঞান ও ধর্ম) বিভিন্ন জাতীয় বই আনা হয়েছে—যেগুলি গতানুগতিক পাঠ্যসীমার বাইরেও চিন্তাধারার প্রসারের পক্ষে সহায়ক হবে। উপযুক্ত বই প্রয়োজনমত সেমিনারে আরও এনে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

তত্ত্ব-বিচারণা ও চিন্তার স্থির আলোতে জীবনের বহুমুখী পর্যায়ের বিচারের দ্বারা একটি সজীব আবহাওয়ায় নবীন মনের চিন্তাশক্তিকে সুগঠিত করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সে লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যসূচী পালনে আমরা এখনও নিয়মিত সক্রিয়তা রক্ষা করতে পারি নি। মাত্র দুটি আলোচনা-সভা এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি আলোচনা সভায় মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা ও জীবন-দর্শন নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মোহান্তী তাতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীদেবব্রত সিংহ "Philosophy and Life" শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন, সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ভট্টাচার্য। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে উপস্থিত বিভিন্ন ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা ও সভাপতির ভাষণ অধিবেশনটিকে বিশেষ সজীব ও মনোগ্রাহী করে তোলে। এর পরে এরকম ধরণের অধিবেশনের মধ্য দিয়ে সেমিনারের এই বিভাগকে সক্রিয় রাখতে সফল হব আশা করি। ভারতীয় মনীষী ও মহামানবদের জীবন-দর্শনের ধারাবাহিক আলোচনা চালানোর ইচ্ছা আছে।

সবশেষে একটা কথা বলার দরকার। সেমিনারের অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ছবি ও প্রতিকৃতি আছে। কিন্তু সেগুলির জীর্ণ ও অসংস্কৃত অবস্থায় কতদিন অস্তিত্ব থাকবে, সন্দেহ আছে। এই ছবিগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণের বহু প্রয়াস বিফল হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে এই দিকে নজর দেওয়া দরকার। আশা করি এবার সাড়া পাওয়া যাবে সবদিক থেকেই।

দেবব্রত সিংহ—সম্পাদক

ইতিহাস সেমিনার ঃ

ইতিহাস সেমিনারের সম্পাদক হিসাবে একটা বিবরণী দেবার দায়িত্ব স্বভাবতঃই আমার রয়েছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হচ্ছে এমন কিছু কাজ আমরা করতে পারি নি যা উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। ত্রুটি থাকলেই সংশোধনের একটা প্রচেষ্টা থাকে—এইদিক থেকে কিছু কৈফিয়ৎ যে আমরা দিতে পারি না, তা নয়। প্রথমতঃ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সময় পেয়েছি আমরা খুব অল্প। নানা কারণে যথারীতি সেসনের কাজ শুরু হতে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরে অনেক দেরী হয়ে যায়। এছাড়াও যে আরও কি কি বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় তা না বল্লেও চলে। এসব সত্ত্বেও কাজ যে একেবারে কিছুই হয়নি তা নয়—বইয়ের সংখ্যা কিছু বাড়ান হয়েছে এবং আপাততঃ সেমিনারের নিজস্ব বইয়ের সংখ্যা ৮০ খানা। প্রত্যেকটি বইই দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান। আমরা স্থির করেছি যে, সব ব্যাপারেই লাইব্রেরীর মুখাপেক্ষী না হয়ে আমরা অতঃপর নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু টাকা তুলে সেমিনারকে যৎকিঞ্চিৎ সম্পদশালী করে তোলবার চেষ্টা করব।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুশোভনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা যে ভাবে উপদেশ এবং উৎসাহ পাচ্ছি তাতে মনে হয় যে ছাত্রবন্ধুদের সমবেত সহযোগিতায় ইতিহাস সেমিনারের গৌরব আমরা এই বছর উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যেতে সমর্থ হব।

জপেন্দ্রনাথ ঘোষ—সম্পাদক

খেলাধুলা বিভাগ ঃ

সভাপতি—		অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় ঘোষ		
সহঃ সভাপতি—		অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত		
		শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		
সাধারণ সম্পাদক	:	শ্রীপুণ্যব্রত রায়চৌধুরী	—	চতুর্থ বর্ষ বিজ্ঞান
হকি	:	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসাক	—	" "
ক্রিকেট	:	শ্রীঅসিত কুমার গুহ	—	তৃতীয় বর্ষ "
আভ্যন্তরীন ক্রীড়া	:	শ্রীমতী ভারতী রায়	—	" "
টেনিস	:	শ্রীঅরবিন্দ রায়	—	চতুর্থ বর্ষ "
নৌ-চালনা	:	শ্রীসুবীর সেন	—	দ্বিতীয় বর্ষ "

ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ঃ

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ডাঃ এস, কে গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে আমাদের বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়েছিল। শ্রীযুক্তা মহলানবীশ সফলকাম প্রতিযোগিদের পুরস্কার দিয়েছিলেন। শ্রীবিনয় সিং (স্নাতকোত্তর ছাত্র) ব্যক্তিগতভাবে সেরা খেলোয়াড় হবার গৌরব অর্জন করেন। স্নাতকোত্তর বিভাগের শ্রীপ্রভাত লাহিড়ীও বিভিন্ন ক্রীড়ায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রসঙ্গতঃ এটা এখানে বলা যেতে পারে যে শ্রীবিনয় সিং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। কলেজের ইতিহাসে এই প্রথম ছাত্রীরাও এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটী পরিচালনার কাজে মনসুর জিলানী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ক্রিকেট ঃ

আমাদের ক্রিকেট দলে ভালো খেলোয়াড়ের অভাব নেই। জি, জিলানীর নেতৃত্বে ও অরবিন্দ রায়ের পরিচালনাধীনে কয়েকটি নামকরা স্থানীয় ক্রিকেট ক্লাব আর অন্য কলেজের সঙ্গে আমাদের কলেজ প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলায় নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে।

হকি ঃ

আশীষ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আমাদের হকি দল আন্তঃ কলেজীয় হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে কলেজের গৌরব বাড়িয়েছেন।

ফুটবল ঃ

আমাদের ফুটবল দলের অধিনায়কত্ব করেন শ্রীনরেন্দ্র বসাক। শ্রীপুণ্যব্রত রায়চৌধুরী ছিলেন দলের পরিচালক। এ বছরে আমাদের ফুটবল দল অনেকগুলি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। বিজয়ী হবার গৌরব অর্জন না করতে পারলেও আমাদের ফুটবল দল যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় দেন তা' প্রশংসনীয়।

বাস্কেটবল ঃ

বাস্কেটবল খেলায় আমাদের কলেজের শ্রীপ্রভাত লাহিড়ী ভারতীয় অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে খেলবার সৌভাগ্য লাভ করেন। আমাদের কলেজের পক্ষে এটি একটি গৌরবের কথা।

দাবাখেলা ঃ

কলেজের ছেলেদের মধ্যে আজকাল দাবাখেলায় বেশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। মাত্র দুই মাস আগে অনুষ্ঠিত দাবাখেলায় 'জুনিয়র স্কালস্'-এ আমাদের কলেজের শ্রীঅজিত সেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

টেনিস ঃ

এ খেলাটিতে আমাদের কলেজের ছাত্ররা বিশেষ উৎসাহী নন। শীঘ্রই টেনিস খেলা আরম্ভ হবে। সকলের সহযোগিতায় টেনিস দলও যাতে অন্যান্য ক্রীড়াবিভাগগুলির মত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার জন্য আমরা বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত ডি, এন্, কাপুর এবং শ্রীযুক্ত আর, কে, দে'র সাহায্য পাচ্ছি। তাঁরা টেনিস খেলায় উৎসাহী আমাদের ছাত্রদের টেনিস শেখাতে রাজী হয়েছেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

নানা অভাব ও অসুবিধার মধ্যে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছে, এগুলি না দূর হলে ক্রীড়াবিভাগে আমাদের কলেজের পক্ষে আশানুরূপ উন্নতি করা সম্ভব হবে না। আমাদের ক্রীড়াবিভাগের জন্য সরকার বাৎসরিক এক হাজার টাকা দিয়ে থাকেন। অর্থস্ফীতির এই নিদারুণ সংকটে এক হাজার টাকা নিতান্তই সামান্য। আমাদের অনুরোধ এক হাজার টাকার এই বার্ষিক দানকে বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা করা হোক। আমাদের বিশ্বাস আমাদের প্রস্তাবনা মত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ক্রিড়াবিভাগের স্বাচ্ছল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভাগটির বিশেষ উন্নতি করার সুবিধা হবে।

আমাদের সকল কাজে আমাদের ব্যায়াম শিক্ষক এন্. এন্. চ্যাটার্জীর নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব। তাঁকে ধন্যবাদ না জানালে আমাদের এ কার্যবিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাঁকে।

পুণ্যব্রত রায়চৌধুরি—সাধারণ সম্পাদক

ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাস সংবাদ ঃ

ছাত্রাবাসের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর আমরা পার হয়ে এলাম। নানা অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আমাদের এই বৎসর আরম্ভ হয়েছিল। বর্তমানে আমরা অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভড় মহাশয়কে আমাদের নূতন তত্বাবধায়ক হিসাবে পেয়েছি। ছাত্রদের প্রতি তাঁর আন্তরিক মমত্ববোধ আমাদের পূর্বেকার সব তিক্ততা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ছাত্রাবাসের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি অব্যাহত থাকবে।

ছাত্রাবাস সমিতির বয়স প্রায় আড়াই বৎসর হল। সমিতির সুসংহত চেষ্টায় ছাত্রাবাস জীবনকে নানা দিক দিয়ে উন্নত ও আকর্ষনীয় করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। সমিতির প্রত্যেকটি বিভাগ সহজ ও সুন্দর ভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করে এতে সাহায্য করেছেন।

আমাদের পাঠাগারে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু নূতন বই কেনা হয়। এ বৎসর পাঠাগারের পক্ষ থেকে বেশী বই কেনা সম্ভব হয়নি। তবে আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের পাঠাগারকে অনেকগুলি মুল্যবান পুস্তক উপহার দিয়েছেন। এ জন্য তাঁর কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের ছাত্রাবাসের প্রাক্তন সভ্য ৺তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুরা "তরুণ স্মৃতি সংগ্রহ" নাম দিয়ে বহু ভাল বই আমাদের পাঠাগারকে দিয়েছেন। তাঁদেরও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাদের খাদ্য-সমিতিকে এই বৎসর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। খাদ্যের বরাদ্দের পরিমাণ আমাদের খুবই কমে গেছে। তার ফলে আমাদের একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি ইত্যাদি খেয়ে থাকতে হচ্ছে। উপরন্তু আটার বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ অপূর্ব! এসব সত্ত্বেও খাদ্য-সমিতি সুষ্টুভাবে আমাদের রান্নাঘর পরিচালনা করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

এই দুর্দিনেও সংস্কৃতি-বিভাগ আমাদের আনন্দ দানের যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। তা' ছাড়াও তাঁদের বর্ষামঙ্গল উৎসব ও শারদোৎসব সত্যিই উপভোগ্য হয়েছিল।

ক্রীড়াবিভাগও ছাত্রদের খেলাধূলার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে এঁরা টেবিল-টেনিস ক্যারম প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়া আন্তঃ ছাত্রাবাস ফুটবল প্রতিযোগিতারও ন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বাইরের থেকে প্রায় আটটি ছাত্রাবাস এতে যোগদান করেছিলেন। সময়াভাবের জন্য ই প্রতিযোগিতাটি শেষ হতে পারে নি।

ছাত্র-কল্যাণ-সমিতিও তাঁদের কাজে যথেষ্ট উৎসাহ ও সফলতা দেখিয়েছেন। ছাত্রাবাসের সাধারণ রিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁদের দৃষ্টি সর্বদাই সচেতন ছিল। ছাত্রদের সময়মত কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগের টীকা, ইন্‌জেকশন প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থাও তাঁরা করেছেন। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সটি ছাত্রদের প্রায়ই বিশেষ উপকারে লাগে।

আর একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান আমাদের ছাত্রাবাসের প্রাক্তন ও নবীন ছাত্রেরা গঠন করেছেন। সেটি হচ্ছে 'বিজ্ঞান-সমিতি''। এর বয়স আজ এক বৎসরের বেশী হল। ছাত্রদেরই সাহায্যে এটি গড়ে উঠেছে। এর উদ্দেশ্য সাধারণ জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করা এবং ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সৃষ্টি করা। এই সমিতির সভ্যরা নিজেরাই ফাউন্টেন পেনের কালি ইত্যাদি তৈরী করেছেন, বেতার সম্বন্ধে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছেন এবং সম্প্রতি একটি বেতার যন্ত্রও নির্মাণ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি এখনও শৈশব অতিক্রম করে নি। আমরা আশা করি সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি পেলে এই প্রতিষ্ঠানটি অচিরে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

এই এক বৎসরের মধ্যে ছাত্রাবাসের সাধারণ জীবন যাত্রা প্রণালীর বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। স্বচ্ছন্দ জল সরবরাহের অভাব প্রতিটি ছাত্র এখনও দুঃখের সঙ্গে অনুভব করেন। বিরাম পীঠিকা, সুপ্রচুর জল সরবরাহ, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের আরও কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিষ সম্বন্ধে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু এক বৎসর হয়ে গেল—কর্তৃপক্ষের ঘুম এখনও ভাঙলো না। তবে 'ডি, পি, আই' মহাশয় আমাদের আশা দিয়েছেন যে, অন্ততঃ এই বৎসরের মধ্যে এগুলির কাজ নিশ্চয়ই আরম্ভ হবে। অদূর ভবিষ্যতে অখণ্ড-সুখের স্বপ্নে তাই আমরা এখন থেকেই উল্লসিত হয়ে উঠছি।

পরিশেষে ছাত্রাবাস-সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ী সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি তাঁদের সহানুভূতি পেলে আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে।

জগদিন্দ্রনাথ ঘটক—সহঃ সভাপতি
দেবব্রত ঘোষ—সম্পাদক

প্রেসিডেন্সি কলেজ স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাস ঃ

কয়েকটি ছাত্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৮ সালের ২রা জানুয়ারি স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠা। কর্তৃপক্ষ প্রায় একমাস আগে বাড়ীটা পেয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্রাবাসটি টেই বাসোপযোগী ছিল না। ছাত্রদের জন্য যে সকল ভাঙ্গা টেবিল, চেয়ার দেওয়া হয়েছে তা' থেকে ই বোঝা যায় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কত উদাসীন। ছাত্রাবাসের নিজস্ব কোন ব্যায়ামাগার নেই; খেলার সরঞ্জামও বললেই চলে। এত অসুবিধা সত্ত্বেও ছাত্রাবাস সংসদ প্রশংসনীয় ভাবে সরস্বতী পূজা করেছেন, পালন ছেন নেতাজী দিবস এবং বিতর্কের ব্যবস্থাও করেছেন। আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ছাত্রদের সব বিধা দূর করতে প্রয়াসী হবেন।

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সহঃ সভাপতি

দার্পণ ঃ

দ্বিতীয় বর্ষ আর্টস্‌-এর ছাত্রছাত্রী ও "পদার্পণের" সম্পাদকমণ্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক র ফলে "পদার্পণ" তার নিজস্ব রূপে সুধী সমাজে আত্মপ্রকাশ করল।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে একটি নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের নিমিত্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। তখন আমরা কয়েকজন সেই উৎসাহকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য অগ্রসর হই। তার পরই হল "পদার্পণের" আবির্ভাব।

পত্রিকাটির আর একটি সংখ্যা বের করবার যথেষ্ট ইচ্ছা রইল। কলেজের মাননীয় অধ্যাপকবৃন্দের আন্তরিক উৎসাহ ও সহানুভূতিই আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যা বের করতে সাহসী করছে। এই সংখ্যায় "পদার্পণের" সহৃদয় পাঠকবৃন্দ যে সমস্ত দোষ ত্রুটী আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন আগামী সংখ্যায় যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হবে। ভবেশ ভট্টাচার্য ও বটকৃষ্ণ দে সম্পাদক ও সহঃ সম্পাদকরূপে এই পত্রিকা সম্পাদনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

একথা বোধ করি বলাই বাহুল্য যে আমরা যদি আমাদের শ্রেণীর ছাত্রবন্ধুদের আন্তরিক সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতাম তা হলে আমাদের সকল চেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পরিণত হত।

অতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—শ্রেণী প্রতিনিধি

ইংরেজি অনার্স্ লাইব্রেরি ঃ

অনার্স্ লাইব্রেরির সৌষ্ঠব বৃদ্ধির দিকে এবারও ছাত্ররা বিশেষ মনোযোগ দেন। ফলে বইয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এর ব্যয়ভার প্রধানতঃ ছাত্ররাই বহন করেন। তাঁদের সহযোগিতাই আমাদের কাম্য।

রেবতী মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক

ইংরেজি সেমিনার ঃ

সেমিনার থেকে এ বছর কোন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় নি। ছাত্ররা সেমিনারের বইসমূহের সদ্ব্যবহার করছেন বলেই মনে হয়।

সুধীরকুমার সেন—সম্পাদক

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Greetings

THE magazine once again makes its appearance which we hope will be welcome to all its readers. It is nearly a year since we came out with our last number. The interval is unusual for a quarterly. We regret the delay.

We extend our cordial welcome to those who enter the portals of this ancient college for the first time. It is a late welcome but the 'freshers' will not miss the peculiar flavour of it. Another link is being forged in the chain. A year more is added to the life of our *alma mater*. Yet the years sit so lightly on her! Her infinite variety defies the withering hand of age. She can always inspire us to nobler efforts. The newcomers will find out the truth of these remarks for themselves. The future beckons to them.

In the editorial we have stressed the need for a new outlook in reshaping our educational system. It is intended to serve us as a starting-point for discussion. The time for decision has come, we have arrived at the parting of ways. The problem cannot be shelved any longer.

In editing the magazine we have wrestled with an uphill task. Needless to say, there still remains scope for improvement. We greet our readers with the fruits of our endeavours. We trust they shall not be disappointed.

Reading History

SHIBENDU GHOSH—*Sixth Year, Hitory*

HISTORY of mankind is a continuous process. This is fundamenta because the consciousness of its continuity makes it possible for us to comprehend its essental unity. This continuity, of course, is not mechanical. It is dialectical.

In course of history opposites interpenetrate and syntheses are evolved. These syntheses are qualitatively new in content and form contrasted with their component forces. This apparent but creative discontinuity is not incompatible with its basic continuity. Because a synthesis must be understood in relation to the forces that generate it as the present includes the past. Again in course of their constant interaction forces reach a stage when synthesis can be reached only through a break from the past; hence this apparent discontinuity.

Society grows, and this process is continuous. In a particular setting, it assumes a particular get-up—a social system that ensures its maximum progress. Social progress is attained through the struggle of man against environment—the criterion of progress is production. In course of this struggle new social forces are generated. The existing system of production, or broadly speaking, social system, is found comparatively less capable of exploiting the productive forces and so eventually comes into conflict with the forces that herald a new set of productive relations. A synthetic order emerges out of this conflict. History thus moves dialectically. But history hardly moves in a straight line. In course of the interaction of forces, change of front is frequent; friction of forces that are potentially mutually exclusive is abandoned midway. The anomaly persists to make the struggle for synthesis long and bitter. The English bourgeois feudal rapprochement, the Bismarckian readjustment, the bourgeois-feudal entente of Japan in 1867 and of China in 1927 are all examples of this process. It also happens that social forces, generated in a country of comparative material advancement collide with similar forces in other countries. The lay out of social forms accounts for the timing of the emergence of new forces. Internal conflict inside a social force such as capitalism, that inevitably tends to be a world force and ultimately turn monopolistic, inhibits its harmonious development in different countries, and this develops into a major contradiction inside the social force. This explains the extraordinary rôle of the colonial bourgeosie and recommends new solution, New Democracy.

Any teleological view of history is also erroneous. To think that history follows a particular pattern to achieve pre-conceived end is a subjective superimposition. History moves dialectically.

History is a unity. The multiplicity of events that tends to baffle integrating insight can be organised into a systematic unity. Events that appear independent of each other are to be related to a complexity of forces that in the final analysis are resolved into a basic force—the ultimate determinant. This of course must not be overstressed to make history a mechanical unity. History is a living process. The basic force itself is never constant in form and it explains progress. Though the ultimate determinant it does not always exert itself decisively. It generates many subsidiary forces that together constitute the quantum of forces that determine the course of history through their constant interaction. 'French Philosophy' was but a subjective reflex of the objective conditions obtaining at the time but it might have been immediately responsible for shaping the thoughts and actions of many a leader of the Great Revolution. Thus in the period of transition until one system is thoroughly replaced by another, an aggregate of intermediary forces operate. This is why the diversity of history is as real as its unity.

There have been many attempts at interpreting history. It has been found that great men could not or cannot do whatever they like. Napoleon, the Jacobin of yesterday, could not be the father of a new world however much he desired to be so or Bismarck, the good old Prussian Junker could not but be a colonial man with all his dislike for it. It is clear that great men represent a social force and can move only so long as that force does not exhaust itself. Greatness consists in the apprehension of a social force and in the conscious effort to assist its implementation. It is also patent that an event in isolation is meaningless while to attribute it to accidents without trying to discover its causal determination is senseless.

To interpret an historical event it is necessary to discover its cause and also to deduce its effect. So it must be linked up with other events and finally causally related to the social force that underlies it. The importance of an event consists in the service it renders to the social force it represents.

The dialectical character of the development of history as opposed to the complacent view of mechanical progress or the romantic ardour for complete separation from the past, was comprehended by Utopians like St. Simon, who also saw how increasingly economics had come to bear upon the course of politics. But their typical imperfection was their failure to deduce correctly from the general law of social development they approximated. Causality of history can be discovered only by the materialist. A correct materialistic approach by unfolding the causality of history makes it possible for us to understand the present. This consciousness can be integrated with a synthe-

tic vision of the future—this philosophy of history thus becomes essentially a philosophy of action.

Materialistically viewed, history thus appears to be a dialectical continuity with a dynamic unity. It must not be confused with economic monism and should also be guarded against pluralist confusion.

Human history, it may be said in one sense, has not begun at all. But to prepare ourselves for the history of mankind as a unit after the intra-specific struggle has ended, we must read and read correctly the history of the period of pre-history.

Professor F. J. Rowe

Sir Jadunath Sarkar, K.T., C.I.E., D.LITT.

I

ONE cannot speak of Professor F. J. Rowe without bringing in his comrade-in-arms, W. T. Webb. Both were teachers of English at the Presidency College at the same time, and they did all their literary work jointly. But there was a basic difference between the two, which made them exactly complementary to each other. Mr. Rowe was a man of fashion, a *bon vivant,* a great mixer, and at the same time possessed of a fine voice, a delicate æsthetic taste, and a mordant wit which played freely on his students and colleagues alike. Mr. Webb, on the other hand, was the exact philologist, the morose scholar, possessed of a broken voice which made him slowly chew every word out of his mouth and a sickly constitution which induced him to settle in a warm country like Australia on his retirement. Mr. Rowe had at first been posted to the Krishnagar College (probably under Mr. Lobb as Principal), and here he had that fine flower of modern Anglo-Bengali culture, Mr. Asutosh Chaudhury (afterwards a Knight and a Judge of the High Court) among his pupils. Mr. Webb came out to India as a lecturer in the La Martiniere College of Calcutta, and after some years was taken into Government service and posted to the Presidency College.

These two formed an admirable working pair, each supplying the defects of the other. Mr. Rowe, when at Krishnagar, learnt Bengali very well and earned the Government reward for passing in that language. He

carefully kept a list of the mistakes which we Bengalis commonly make in writing English, owing to the radical difference between the idioms of these two languages, and he devoted one chapter (chapter VI in the new edition) of his very useful book *Hints on the Study of English* to these errors, placing the correct and the popular incorrect forms of each side by side with reasons. This highly useful book has been now entirely forgotten,—so much the worse for our hope of learning good English. But for one full generation it was the Gospel and vade-mecum of our Matriculates. The first version of this book, after many printings, was cast off and an entirely new book written with the same title by the joint-authors, soon after Sweet's *New English Grammar* and Skeat's handy *Etymological Dictionary of the English Language* had come out in England. In these two works the treatment of English grammar was revolutionised, it was no longer cast in the mould of Latin grammars, but the complete difference between the Anglo-Saxon tongue and Latin was recognised in the framing of the rules of its use and the history of its growth. Wholesale borrowings from Sweet and Skeat, and the adaptation of the new information to the needs and capacity of Indian boys, made the new edition of *Rowe's Hints* a powerful factor in imposing and modernising the teaching of English grammar and idiom in Bengal schools. The philological portion was the work of Webb, but Rowe supplied all the practical suggestions and the Indian experience, besides giving the book its form and finish.

The collaboration of Rowe and Webb in editing English classics for Indian readers was most happy and fruitful. Webb supplied the exact scholarship and Rowe the æsthetic criticism—the former was prosaic, the latter poetical in temperament, intellectual bent, and favourite reading. How superior their joint-editions are to the plays of Shakespeare edited in the same Macmillan's Series for Indian Colleges, by Prof. Deighton, who has in most cases pirated Dyce's commentary wholesale, without drawing on his own brain or his experience in teaching Indian youth these foreign classics. Take up Rowe and Webb's *Cowper's Letters* or Tennyson's *Enoch Arden* in this series, and you will be at once charmed and instructed by their Editorial Introductions, written with a mastery of the art of presentation, admirably methodical arrangement, judicious economy of words and felicity of language. They rival Tozer's masterly introduction to Byron's *Childe Harold* in the Clarendon Press Series, without being too deep for Indian youth. Rowe and Webb also edited a short-lived *English Quarterly Review* which they published from Calcutta.

II

Mr. Rowe was a man of delicate taste, both within and without. He used to come with a bandage of white linen round his middle finger, lest the ink he used in recording our attendance should stain his finger. He was

equally punctilious in the matter of correct English speech and writing. The Bengali shibboleth is well-known; we often pronounce *ashume* (for assume). This used to infuriate Mr. Rowe; and he would tell his class—"I taught your grandfathers to say *assume,* I taught your father to say *assume,* and I have been teaching you the same thing; and yet you will not learn the correct pronunciation." Another red rag to him was our habit of calling the eighth letter of the English alphabet *ech* (H). Mr. Rowe would immediately correct it by making us say *e-ich.* At last he got it written in Bengali characters as *e-ich* in his little Grammar (another very useful book, but now neglected) and also in Peary Churn Sircar's *First Book of Reading* (taken over by Macmillan).

He had a dispute with Dr. C. R. Wilson about the propriety of saying *Good morning* after 12 noon, one side arguing for *Good afternoon,* and the other upholding *Good morning* on the analogy of the term "*Morning* performance" being used in England even for shows given in the afternoon; these are never called *Evening* performances, unless they are held *after* sunset.

As a punctilious grammarian he insisted on a comma being put after *every* noun (if more than two) when they are joined by *and,* while the usual practice is not to insert comma after the noun which immediately precedes *and.* When Mr. Rowe was holding forth on his point, a smart student immediately pointed out that the title page of his *Hints* contained the imprint of Thacker, Spink and Company, without a comma after Spink. Mr. Rowe wittily replied, "It is very bad of them. I shall withdraw my books from their agency!" *Schooling fee* excited his condemnation; it should be either *school fee* or simply schooling.

It will be hardly believed in Calcutta today that when in Queen Victoria's Jubilee year (1887) six thousand boys sat for the Matriculation examination (then called the Entrance), people regarded it as an abnormal and harmful expansion. The passed students who flocked to the Presidency College to the full capacity of the class-rooms, used to rush up or down the staircase in a tumultuous horde to occupy the best benches in the classes of those famous professors, and the sight shook Mr. Rowe out of his equanimity, and he used to shout at them "Jubilee barbarians"!

When a pupil of his class used an apt phrase in construing, he was highly delighted. I remember, when I said "So-and-so (a character in our book) was a trimmer," Mr. Rowe remarked, "Yes, *trimmer,* that's it" and he repeated the word *trimmer,* as a boy rolls a lozenge on his tongue!

III

On Mr. Rowe's wit much could be written, if his old pupils were to record what they saw and heard. His mastery of colloquial Bengali often gave a fantastic turn to his conversation. One day he asked his class the

meaning and etymology of the phrase *Goo-ŏr-betā;* and remarked, "When I next get angry with my bearer, I shall abuse him by calling him a *goo-ŏr-betā*"!!!

Another day, he regaled his class with the song:

এক চিলুম্ যেমন তেমন, দুই চিলুমে মজা,
তিন চিলুমে মদনমোহন, চার চিলুমে রাজা,
বম্ মহাদেব।

He had overheard some *gānjā*-smokers singing, and carefully learnt it by rote for use among his students!

He used to boast of the early flowering of his wit, by pretending to be no scholar at all. It is the rule at Cambridge that freshmen should first call on the older students in residence. Mr. Rowe's house had a senior student named Reid, who distinguished himself as a classical scholar. Mr. Rowe told us that when he called at Reid's rooms, his first words were, "You are Mr. Reid, I am Mr. Rowe. You have come here to read, I have come here to row."

Sometimes his humour was too crude, when we remember the sacred relation of preceptor and disciple between us. In the Shakespeare class, his stock jest was to ask a freshman (if come from a Mufassil college) "Are you a ***natural*** son?" On getting a negative reply, he would add, "Then you are an ***unnatural*** son?"

It is a silly habit with many of us not to return to our classes punctually on the day the College reopens, but to drop in one by one for a week or two afterwards. Mr. Rowe would taunt such late comers, when he detected at the time of roll-call, by asking them in Bengali, "Why are you so late? Were you on a visit to your father-in-law's house?"

He had a very good memory for his pupils. On the opening day of the new term, the plucked students who had been readmitted to the fourth year class, had a very unhappy time of it with Mr. Rowe, he knew these old birds. One of them, name Ghulam Ghaus, failed two or three times, and Mr. Rowe would openly ask him, "Ghulam Ghaus, how long would you continue in the 4th year class?" [Luckily, in his third shot Mr. Ghaus passed. He had taken Honours in Arabic, and by threatening to expose the poor knowledge of Arabic possessed by the Senior Maulvi of the College, who was always the examiner, Mr. Ghaus secured 90 p.c. marks in Honours Arabic, his shortage in another subject was condoned, he passed, and as a Muslim Honours man was at once appointed a Deputy Collector.]

Mr. Rowe was a trenchant critic of what used to be called "Baboo English." It is well-known to old people that Babu Sisir Kumar Ghose deliberately wrote unidiomatic English in order to give a piquant flavour to

his *Amrita Bazar Patrika,* excite the laughter of his English readers, and increase the circulation of his paper. Most British officers subscribed to that paper in the names of their bearers! Mr. Rowe used to bring copies of the *Amrita Bazar* to his class and correct the glaring howlers. Once he remarked, "If you want to unlearn the English language, read the *Amrita Bazar Patrika*".

There was great racial asperity in those days between the English writers in India and educated Indians whose speeches and writings were often publicly stigmatized by these English authorities (Mr. Rowe among them) as Baboo English. Mr. N. N. Ghose (Principal of Vidyasagar's College) who wrote a purer and sweeter English prose than anyone else, black or white, in India, felt this slur keenly; and one day in his paper *The Indian Nation,* he pilloried a lapse from correct English on the part of one of these Englishmen as illustrating the real learning of "those Anglo-Indians who write little but criticize much"; this was a hit at Mr. Rowe. But his sharp criticism did us, his pupils, immense good, and we must be thankful to him.

IV

It is with a feeling different from gratitude that I turn to another side of Mr. Rowe's activity. Mr. H. M. Percival, a Eurasian of Bengal, after passing the Intermediate Examination (then called the First Examination in Arts) from the Presidency College, went to the London University on a Gilchrist Scholarship won by competition, took the M.A. there, and on return to India was appointed a lecturer at the Presidency College, on *one-third less pay* than his British colleagues with similar English degrees, (just as Sir J. C. Bose and Sir P. C. Ray were later). In a few years, Mr. Percival's incredibly varied and deep learning, tireless industry, and devotion to the education of his pupils, won for him a popularity which can be more justly described as adoration for a deity. Some of the European professors regarded him as American whites would look upon a Negro admitted to their hotel, and Mr. Rowe contrived a practical joke against him. Mr. C. H. Tawney was the Principal of the College, and his head *chaprassee* was Bakhtawar, a tall and fat bearer, who long used to be seen carrying his master's japanned despatch-box and preceding Mr. Tawney in his daily walks from the Presidency College to the Senate House, where Mr. Tawney acted as the Registrar of the University, for an allowance, while the office work was done by the Assistant Registrar, the dreaded Troilokya Banerji. Now, this Bakhtawar had seen Mr. Percival as a mere lad reading in the lower classes of the same College only a few years before, and so he still looked upon him as a *bachcha* and had no hesitation in taking a bribe from Mr. Rowe and one day addressing Mr. Percival thus in the Professors' Common Room while distributing the class rolls among them:

Bakhtawar:—*Sahib*, I want to say something to you.

Percival:—Go on.

Bakhtawar:—Sahib, you should marry. For, if you die now, Government would take all your property; but if you have a wife, your *Bibi* will be able to keep it.

Mr. Percival growled out, "Get away," and himself left the room. All this time Mr. Rowe was sitting down near by, pretending to read a newspaper, with which he concealed his face and his chuckle.

Poor Bakhtawar afterwards used to beat his breast and tell the students, 'Ah! Rowe sahib has ruined me. Percival sahib used to give me Rs. 10/- as *buckshish* every year at Puja time, but since I spoke to him at Mr. Rowe's suggestion, he has never paid me any tip."

The antipathy between them was fundamental: Mr. Percival's scholarship was minute, deep but prosaic, of the heavy German type with no grain of sweetness and sometimes apt to be hypercritical. Mr. Rowe was a writer of the French type, elegant, terse in words, æsthetic, if rather shallow. When Rowe edited a certain English classic for Macmillan, he himself wrote a review of it and sent it to the *Indian Daily News* (Mr. Digby, editor) over the signature of his favourite pupil Harinath De; it contained the sentence,—" The Editor has wisely tried to help the student without overwhelming him with the weight of his erudition." The last portion was a hit at Mr. Percival.

Let me, however, close on a pleasanter note. Mr. Rowe, with great labour and working extra time, checked and rearranged the vast library of the Presidency College in 1893-94, after frauds had been detected in it.

V

No account of Professor Rowe in my time—would be complete without a reference to his little boy. One day Professor Rowe was presiding at the prize distribution ceremony of the City Collegiate School, and he had brought the boy with himself, to keep him out of mischief at home probably. The headmaster was reading a long soporific annual report full of moral platitudes; Mr. Rowe was leaning back helplessly in his chair; the boys were dressed in white, everybody was grave and on his best behaviour, as at a funeral. But Master Rowe made the place lively, I tell you. Bored by the endless talk, he slipped down from his chair, crawled under the green baize of the President's table, popped his head up, and ducked it down again, and passing under the chairs of the grave old men in the front benches, stood erect in the back lines! The younger audience durst not laugh, nor could they check their rising mirth at his comic by-play.

The same year or a year later, the annual sports for Indians, organised by Mr. Lee (Chairman of the Calcutta Corporation) were being held in

the Maidan. Mr. Rowe, Dr. Whitehead (of the Oxford Mission, not ye enthroned as Bishop of Madras) and other great men were superintending the events with their official badges on their coats. And lo! there was Master Rowe running about the field with a big red cockade on his breast We cried out to ourselves, "What! Is Master Rowe too one of the Stewards of the Course?" In fact, he had given his father no peace till he had been decorated like him.

[*Rowe, F. J.—Inspector of Schools, Presidency Division. Took up 4th Year English Classes in Presidency College for 3 months in 1879-80, when Mr. Tawney, was officiating as Director of Public Instructions. Professor of English, 1883-89. Thrice officiated as Principal of the College, and was confirmed as such. 3rd January, 1889. Retired 2nd, July, 1889.*—PRESIDENCY COLLEGE REGISTER.]

Some Aspects of the Philosophy of Mahatma Gandhi

JITENDRA NATH MAHANTY —*Sixth Year, Philosophy*

I

The supreme message of Gandhiji is the message of a spiritual reintegration of the individual and society. (This is the thesis, that we shall elaborate in the present paper). Gandhiji views the present industrial civilisation, with all its problems exactly in the same way in which Shri Krishna of the *Bhagabat Gita* viewed the psychological crisis in the personality of Arjuna. The teachings of the *Bhagabat Gita* relate to a crisis of supreme importance in the history of mankind. If Arjuna represents the full-fledged individual of a great material and moral civilisation, the opening chapter of the *Gita* shows us a complete disintegration in his personality. He is unnerved; the different elements and ideals, constituting his personality are in conflict with one another. The battle of Kurukshetra is the symbol of a similar disintegration in the collective life of society. Shri Krishna comes with the message of re-integrating the individual on a new spiritual basis. Gandhism is to be viewed in a similar context.

The greatest malady, probably, of the present industrial civilisation is the psychological and spiritual disintegration, that has taken place in individual and social life. Man has lost faith in any fixed and unchangeable value. Suspicion, frustration and a sense of insecurity are determining the individual and, more so, the collective behaviour of mankind. All aggressions are due to a sense of insecurity and fear; and these latter are being matured

by the growing neurosis, psychoneurosis and the gradual dissolution of all faith in values. The discontents of our civilisation are written large on its face.

Gandhiji's message is meant for this weary world. Gandhism is a new integral culture, viewing human life as one, and as one integral whole. The modern man's life has been disintegrated into separate watertight chambers. The modern industrial worker, father of the church, politician in the U. N. O.—each is a multiple-personality. He swears by Truth, Non-violence and Peace, but has no faith in their workability. Sundays alone are reserved for ethical investigations, the rest of the week for political intrigues. Sundays are not weekdays, so also ethics are not politics. Why confuse between them? Gandhiji is accused of this arbitrary confusion. Yet, this is the supreme message of Gandhiji. Life is one whole. There is no distinction between Sundays and weekdays, between the individual and the collective spheres, between politics and ethics in life. So long as you persist in making this artificial distinction, you perpetuate all the weary problems of your civilisation. It is no use swearing by peace and other godly values. They are to be instilled into one's life-blood. Life is to be moulded according to one absolute, but dynamic principle. Such is the basic principle of the Gandhian culture. But it has two principal constituents; and we shall call these "greater" spirituality and "greater" *ahiṁsā*.

II

Gandhiji's is not a world-negating spirituality. Truly speaking, Gandhiji has not given us any philosophy of God, although some of his utterances are pregnant with supreme philosophical implications. His main contribution consists in a clear establishment of the relation between the spiritual and the socio-economic life. He even claims to have discovered or rediscovered many of the hidden potencies of spiritual life. He claims to have been a life-long experimenter in this field. Herein we can trace the tradition of the active mysticism of the *Upanishads* and the *Bhagabat Gita*. In more recent times, we find the emergence of Gandhiji against the background of the Indian Spiritual Renaissance beginning with Rammohan Roy, Keshab Chandra Sen, down through the Sri Ramakrishna Vivekananda movement to the pure spiritualism of Sri Aurobindo. One common feature of this renaissance consists in giving a new turn to man's spiritual life, a new harnessing of the unfathomable potencies of mysticism. And, Gandhiji can truly be characterised as embodying this feature at its best, and in its most developed form. It is wrong to characterise this type of 'active mysticism,' as Bergson does,* as foreign to Indian culture, and as born of the impact of Christianity and the modern industrial civilisation. Its sources lie directly in the mysticisms of the *Vedas* and of the *Upanishads* and of the *Gita* and

---

* Bergson: *Leo Deux Sources De La Morale Et De La Religion*, p. 241.

in the unbroken line of India's religions teachers. Gandhiji is a true inheritor of this mighty tradition.

For Gandhiji, there is no distinction between this world and the other world, between the natural and the super-natural. "There is no such thing as the other world. All worlds are one. There is no 'here' and no 'there'. As Jeans has demonstrated, the whole universe including the most distant stars, invisible even through the most powerful telescope in the world, is compressed in an atom." There are no different laws for this world and for heaven. "The universe is compressed in the atom. There is not one law for the atom and another for the universe.*

Gandhiji's conception of God is not that of the Advaita Vedantist. That is to say, he is not a Māyāvādin. His is rather the *Bhagabat Gita's* conception of 'Purusottama,' which combines and transcends the personal and impersonal, static and dynamic aspects. Often he speaks, in the Bergsonian strain, of God as one with the change, as determining the change from within it. But God is also the moral Ruler from above, the supreme Law-giver, the administrator of 'dharma'. Yet his is not the Christian theist's personal God. God is, in the end, identified with that Law and Truth. Truth is God; and not merely that God is Truth. It is faith in God, in Law, that determined Gandhiji's thought and activity. This law of Dharma is also the Law of our Being, the truth of our existence, the truth of our History.

Gandhiji believed in History, and his faith in History constitutes an essential part of what has been characterised as his "Greater Spirituality." His categonical faith in History is certainly a new phenomenon in Oriental mysticism. Aldous Huxley, in his recent book *Perennial Philosophy* points out that those who believe in Absolute Value do not believe in History, those who believe in Time advocate violence, and those alone who believe in Eternity resort to Non-violence. Gandhiji's life and thought prove the inadequacy of this series of anti-theses. He believed in Absolute Value; yet he believed,—and acted upon that belief—in History; he believed in Time, yet he stands as the supreme high-priest of Non-violence.

But though Gandhiji believed in History, he did not, like the Italian Neo-Idealists Croce and Gentile, or even like Marx, identify Reality with History. History is real; but Reality is not History. The Law of Dharma, the law of our Being, progressively realises itself in History. "If love or non-violence be not the law of our being, the whole of my argument falls to pieces; and there is no escape from a periodical recrudescence of war, each suceeding one outdoing the preceding one in ferocity." * * * *"If love was not the law of life, life would not have persisted in the midst of death. Life is a perpetual triumph over the grave.* If there is a fundamental distinction between man and beast, it is the former's progressive

* Gandhiji: *Non-Violence in Peace and War.* (Nabajiban Press), p. 465.

recognition of the law and its application in practice to his own personal life. All the saints of the world, ancient and modern, were, each according to his light and capacity, a living illustration of that supreme Law or Being. That the brute in us seems so often to gain an easy triumph is true enough. That, however, does not disprove the law. It shows the difficulty of practice. How should it be otherwise with a Law which is as high as Truth itself?"* (*Non-violence in Peace and War*, p. 141.)

This passage and many others show that Gandhiji had a philosophy of History. He was not a mere humanist, a mere Utopian, dreaming of and haphazardly striving for an ideal world. He had found a real link between the ideal and the real. This is the Law of Dharma, which is also the law of our Being, of our History. Of course, his is not a clear cut philosophical system like that of Marx, or of Hegel. Gandhiji was not an academic thinker; nor could he have consistently given a mechanical formula for world-history. For he did not believe in the concepts of determinism and inevitability. But, in any case, he did uphold throughout his life and activity the idea of Progress in History. Unlike sceptics like Spengler, Gandhiji believed in the universal possibility of progress. But he had no faith in an historical determinism. Here he differs from the Marxist. His faith in progress was not blind *i.e.* he did not believe in the inevitability of progress in due course. The historical determinist believes that even if we let the present way of things go as it likes, we shall be moving forward. For the Marxist, progress means carrying the present forces, present values towards their logical, or rather mechanical end. Everything else that suggests a complete change-over of the present forces is reaction, retrogression. Gandhiji did not believe that history is always progressive. It may be that, in calling the present ways progressive we might be only justifying our own sense of values and prejudices. Impartially speaking, events of the world do not tell us that the present state of things will of itself lead us to progress. Quite possibly, and many a savant is feeling this necessity—a "transvaluation of values" may be necessary. We may have to accept newer values in individual and collective lives; and this new value should be in accordance with the law of our Being, the Law of Dharma, the Law of love. Gandhiji

* A similar idea is expressed more explicitly by Tolstoy in his reply to young Rolland's letter to him. "Let but man follow this line of reasoning," Tolstoy writes, "and life would appear before him in quite a different aspect as it had never done before. The creatures destroy one another, no doubt, but they also love one another and practise mutual aid. Life is not sustained by destruction but by Reciprocity of love amongst living beings and this is translated within my heart into Love. So far as I could survey the march of the world, I see that the progress of Humanity is due to this principle of Reciprocation. Our History is nothing but the progressive clearing up of the conception and application of this unique principle of the solidarity of all beings. This reasoning is corroborated by the experience of History as well as by personal realisation."

(Tolstoy's reply to the first letter of Rolland to Tolstoy: Translated by Dr. Kalidas Nag from original French and published in *The Modern Review*, Calcutta, January, 1927.)

never predicts that the world will inevitably accept his gospel of Non-violence. His faith is only that *if* the world turns towards him, he can help it. The West wants to eat the cake and have it too. Gandhiji emphasizes this 'if' as the only possible means of salvation.

The fundamental difference between the Gandhian way and the Marxist point of view consists in the former's faith in an absolute value. For Marxism, there is no absolute value; values change according to the economic and class structure of society.* There is no "ought" in Marxian ethics. Marx would call Gandhiji a "reformist", a "Utopian Socialist", in spite of all his pious wishes.

But was Gandhiji a mere humanist? Even a superficial study of his life and activities sufficiently shows that he was much more than a mere humanitarian. True, there have been movements of humantarianism; and no real love of humanity and its well-being can be completely free from the sentimental touch of humanitarianism. But Gandhiji had far surpassed this. He went to the fundamentals. He had something of the Kantian touch in him. Rather, it would not be wrong to say that it is the Kantian Ethics that approaches nearest to the Gandhian way. Kant's first categorical imperative shows us the way beyond mere sentimental humanitarianism. Kant's second categorical imperative, asking us to look upon every human being as an end-in-itself and not as a means to an end summarises perhaps the basic principle of the Gandhian way and can alone be the basic principle of any school that can legitimately claim the name of socialism. Kant's third categorical imperative tells us that man, in his highest moral stature, is self-legislative and autonomous. In the Gandhian terminology, the Law of Dharma is also the Law of our Being.

Was Gandhiji a Utopian? If our above discussion be true, Gandhiji had a definite "Weltanschauung" (*visva-drsti*), within which one discovers a link between the real and the ideal, the *means* of striving and the *end* to be attained. Unfortunately, the so-called rigid dialectics of the Marxian school betrays the absence of such a link. For, in spite of all apologies and references to the mysteriously-working dialectic process, it still remains unintelligible to rational thought, how violence can be an instrument in bringing about a non-violent state, how growing centralisation in the hands of the state can help the state "wither away", how a dictatorship can gradually evolve into a class-less society. Perhaps, more 'faith' is needed to accept the view of this school of thought, than to take up the most simple Gandhian thesis that 'means' and 'ends' are but reciprocal and correlative and so ought to be judged and evaluated by the same standard! Certainly, the Gandhian thesis is not more Utopian than the Marxian one ; only Gandhiji has not the audacity to pose and eulogise a counterfeit as Utopia consummated.

---

* See Howard Selsam's *Socialism and Ethics.*

To sum up: since he believed in History, Gandhiji was no individualist. No believer in History can be an individualist. On the other hand, no believer in Absolute Value can leave all Reality to the hands of History. While recognising the importance of the individual, as an end-in-itself, Gandhiji had a supremely social outlook. But socialism begins with the individual. He himself was socialist No. 1, in word, thought and deed. This is a new type of individualism and a new type of socialism. Such an individualism can be easily appreciated as a necessary corrective to the growing collective thought of the West.

III

As to its second most important constituent, *i.e.* what we have named, that approaches nearest to the Gandhian way. Kant's first categorical impera-of the Gandhian way; and we shall see why we call this "Ahiṁsā". "Greater Ahiṁsā." The doctrine of "Ahiṁsā" belongs to the hoary past of India, to the ***Mahābhārata,*** the ***Rāmāyana,*** the ***Gita*** and the ***Upanishads.*** Yet, Gandhiji's is a new interpretation of this tradition according to the changing circumstances. In the past, Ahiṁsā was a simple individual virtue. No doubt Buddhism associated much social service with individual attainment. But the Buddhist outlook was more humanitarian. Gandhiji opens up a new horizon.

It is a standing charge against Gandhiji that he misrepresents Hindu heroism by the doctrine of non-violence. His interpretation of the *Gitā* is criticised for similar distortion. It is not possible to enter here into a full evaluation of this charge. But it is to be noted that Gandhiji admits that Hinduism was never averse to war, just as he himself is. But he conceives of the teaching of Hinduism, or of the *Gita* as essentially dynamic and not as static dogma. The following passage may perhaps help to make the point clear: "I have admitted in my introduction to the *Gitā* known as Anāsakti Yoga that it is not a treatise on non-violence nor was it written to condemn war. Hinduism, as it is practised today or has even been known to have ever been practised, has certainly not condemned war as I do. What, however, I have done is to put a new but natural and logical interpretation upon the whole teaching of the *Gitā* and the spirit of Hinduism. Hinduism, not to speak of other religions, is ever evolving. It has no one scripture like the *Quran* or the *Bible*. Its scriptures are also evolving and suffering addition. The *Gitā* itself is an instance in point. It has given a new meaning to 'Karma', 'Sannyāsa', 'Yajna' etc. . . . . . Anyway, I must disclaim any intention of straining the meaning of Hinduism or the *Gita* to suit any preconceived notions of mine. My notions were an outcome of a study of the *Gitā Rāmāyana, Mahābhārata, Upanishads* etc. . . . . ." (*Non-violence in Peace and War,* p. 143.) The message of the *Gita* has a history of its own, evolving around a fundamental principle. The different interpretations

throughout the ages might be shown to be phases of the evolving message of this scripture according to the changing circumstances.* Gandhiji has more than once hinted at the possibility of such a reading of the *Gitā*. The Gandhian way, in its relation to Hindu tradition, should also be judged in this context.

Ahiṁsā, as the supreme moral law, as non-attachment, anāsakti can be traced to the traditional Indian wisdom. Much has been said about it. This is the real basis. But we shall here deal with the other aspect of this doctrine of Non-violence, which gives it its distinctive feature.

This aspect of the doctrine can be summed up by saying that Ahiṁsā is a great social experiment, unique in the history of the world. Gandhiji has often spoken of the science of Ahiṁsā. It is a science, meant for ushering in Rāma Rājya. Rāma-Rājya is the name of a society, culture and civilisation, based on the technology of the science of Ahiṁsā. From this point of view, his philosophy of education, philosophy of art, his economics of Khadi and decentralisation, his so-called 'bread-labour' theory,—all form integral parts of his doctrine of Non-violence.

This synthesis is possible, since, for Gandhiji, the term Ahiṁsā has a very wide connotation. Just as ' Truth ' does not mean mere conformity in speech, so also ' Ahiṁsā ' does not mean mere abstinence from physical injury. *That is too negative to be Gandhian.* Apart from the usual ethical connotation, 'Hiṁsā' or violence includes, in the Gandhian context, any type of exploitation or injustice in individual or social life. Thus violence may pertain to a means of production, a particular economic or class structure, a school of art or thought, a mode of education, and the like. Non-violence consists in putting an end to all types of exploitation from individual, social, political, economic and cultural life. Gandhiji discards the modern centralised industrial civilisation, precisely because its basis is rooted in exploitation or violence. His glorification of manual labour has a similar justification. Modern scientific technology would be admitted only in so far as it can work in harmony with the basic principle of non-violence, non-exploitation. Mere centralising of it in the hands of a ' State-God ' would not give us that Rāma-Rājya.

Take, as an illustration, his most misunderstood, the so-called, "bread-labour " theory. When Gandhiji asked a Rabindranath or a Raman to try their hands in spinning, naturally it created a sensation among the intelligentsia of our country. Many ridiculed the obstinacy of this old man. But few grasped the real significance of what he meant. Here Gandhiji,—at least in principle—is in the company of Marx and Rolland. Marx, Rolland and Gandhiji—all have been bitterly conscious of the evil effects of the existence

* The best and perhaps the only work in this direction has been done by Dr. Brojendranath Seal in a paper on the *Gita* in *The Modern Review*, July, 1930.

of an intellectual elite, as a separate class in society. An artificial gulf between the "elite" and the proletariat or the manual labourer opens the way for a type of exploitation, which usually escapes even the most acute social analysis. The elité lives upon the labour of the proletariat. Rolland, himself an artist of the highest order, had revolted against this artificial isolationism of the elité. Gandhiji's bread-labour theory takes its origin from this principle. It is meant to bridge the gulf between the intellectual and the manual labourer, so that each can be benefited by the other, without any chance of exploitation of the one by the other. The fundamental principle of the Basic System of Education is the same.

Gandhiji thought that it is manual labour that alone could eliminate to the maximum extent, all scope of exploitation from individual and collective life. In all this, Tolstoy's influence is obvious. Tolstoy's reply to young Rolland's appeal gives us the best formulation of the principle. Tolstoy wrote: " The shortest and simplest moral formula is to take the service of others as little as possible, and to serve others as much as possible, to demand the least and to give the utmost possible in our relation with others." . . . . . . " That science and art play a false rôle in our society is the result of the fact that the so-called civilised people, headed by the scholars and artists form a caste of their own, privileged like the priests. This caste has all the defects of other castes, lowering and degrading the very principles under which they organise themselves. Thus we get in place of true religion a false one, in place of true science a false one, and the same we find in Art. It has the fault of weighing heavily on the masses and even more, of depriving them of that very thing which one pretends to propagate among them. This consoling contradiction between the principles professed and their practice is the greatest weakness of the case."*

Such is the width and vision of Gandhiji's ' Ahiṁsā '. And the apparent crudity and medieval tinge of his ideas must be revised in the context of the type of society Gandhiji had been aiming at, *viz.*, Rāma Rājya.

Even as a moral preacher of Non-violence, Gandhiji has his own distinguishing features and stands out from the uncompromising moralists of the past and the present. Gandhiji was more conscious of the realities of human nature and society than any of them have been. That is why his main contribution to the art of ethical preaching lies in the limits that he would gladly admit into his scheme,—limits, through which one had to approximate gradually to the moral ideal. Grades are admitted into the scheme of non-violence; and one is not condemned simply because one has not attained the highest status. On the other hand, Gandhiji would not let us use the authority of the scriptures to justify any of our immoral acts ; nor would

* Tolstoy's reply to Rolland. See pp. 199, 203 of Dr. Aronson's *Romain Rolland.*

he let us preach non-violence from the platform, while resorting to violence in however remote a form, in individual and collective life. It is Russell, who in his essay on *Happiness in this Modern World,** warns us against the ethical and spiritual hypocrisy of the West, where the "righteous indignation". of Christ is quoted to justify wars between nation and nation!

An eminent thinker draws a distinction between Pure Non-Violence, Pure Violence and Coercion, which falls in between these two. According to this view, Gandhiji's non-violence is not pure non-violence; rather it can be put under the heading of "Coercion." Gandhiji's methods of Non-co-operation, Satyagraha or Fasting are evidently coercive weapons. But this is a complete misunderstanding of his ideas. Certainly, tht coercive element can be detected in all collective applications of non-violence. But individual attainment should always be in the direction of pure non-violence. Non-violence in individual life and its collective application are mutually complementary. It is only an individual of high moral excellence who can inspire a collective movement on non-violent lines. There is no contradiction between the two spheres of application; rather a progress from the one to the other is possible. Coercion is only a stage in the process; but in the collective sphere, it is always an unavoidable element. Gradual approximation to the ideal would reduce this element and would be marked by progress towards the attainment of pure non-violence by more and more individuals.†

IV

The above discussion gives us the scheme of the Gandhian message, as characterised by us. We are to look inward and to search our own hearts. We are asked to be more and more introvert, relying on inner faith and inspirations. But to be introvert does not mean neglecting one's external duties. The *Gita* says: "योगः कर्मसु कौशलम्" । Huxley so brilliantly points out in his *Perennial Philosophy* how the Jungian classification of 'introvert' and 'extrovert' is inadequate. Huxley adds that the *Gita's* classification of psychological types and processes is more scientific and adequate. Gandhiji's message is based on that pattern.

Gandhiji's philosophy of life is that of a supreme and integral artist. Life is not to be renounced. But we are to enjoy, realise and manifest the inner delight in external actions. The *Upanishads* proclaim: रसो वै सः This is no mere abstract delight; it is to be expressed in every moment of life. Every moment and aspect of life is to be reorganised on one basic principle, value and faith.

---

* Russel: *Sceptical Fossays.*

† Note also Prof. Arnold Toynbee's classification of Non-Violence in his *A Study of History,* Prof. Toynbee too betrays a similar misunderstanding of the article "Non-Violence in Evolution" in the volume *Non-Violence in Peace and War* (Navajivan Press.)

A faith in absolute value is necessary to avoid much of aggression and mental disintegration, characterising our civilisation. Aggression comes out of fear and distrust; peace comes out of faith. Writing on "The Concept of a Normal Mind", Dr. Ernest Jones of London concludes with this significant remark: "We reach the conclusion that the nearest attainable criterion of normality is fearlessness. The most normal person is, like Siegfried, 'angst frei', but we must be clear that we mean by this not merely manifest courage, but the absence of all the deep reactions that mask unconscious apprehensiveness. Where these are absent we have the willing or even joyful acceptance of life, with all its visitations and chances, that distinguishes the free personality of one who is master of himself."*

In the end, Gandhism seems to establish a new sense of values. This sense of values is neither that of a Utopian visionary nor that of a blind activist, neither individualistic nor merely humanitarian or altruistic. It is an integral way.

The Atom Bomb

Deba Prasad Dutta—*Second Year, Science*

A GREAT display of headlines on August 6, 1945 brought it home to all the world that applied science had ushered in a new age, the beginning of the atomic era. The bombs that fell on Hiroshima (Aug. 6), and Nagasaki (Aug. 9) were man's first attempt to utilise the basic power of the universe for his own purpose. Until this incident in history all the power-sources of mankind were ultimately derived from the sun. But now man started to use the power behind the sun. In its effects on future civilization this item of news overshadowed all other technical advances of this century.

It was John Dalton (1766-1844) a Manchester school-master who persuaded the scientific world that the apparently solid, liquid, or gaseous substances were built of minutest particles, the atoms; which were indivisible and indestructible by any process yet known. The history of the development of the atom-bomb may be said to have begun with the discovery of radio-activity by A. H. Becquerel in 1896, and the pioneer of this century in this subject is Lord Rutherford. The possibility of the development of atomic energy was first hinted at in scientific theory some forty years ago (1905) when Einstein wrote his famous equation in the Theory of Relativity.

* *The International Journal of Psycho Analysis*, Vol. XXIII, Part I.

In 1905 Einstein stated his theory of equivalence, $E=mc^2$ where E is the energy in ergs, m the mass and c the velocity of light. Calculations show that if 1 kilogram of matter is entirely converted into energy it becomes equivalent to 25,000,000,000. kilowatt-hours of energy, which is equal to all the electric power produced in the U. S. A. in two average months. This can be contrasted with the fact that the combustion of 1 kilogram pure coal yields only 8·5 kilowatt-hours of energy. The atomic theory was further advanced by Lord Rutherford and Neils Bohr. Then in 1929, E. O. Lawrence and Robert J. Van de Graaff invented atom-smashers. The researches of J. D. Cockroft and E. T. S. Walton also made further advances on the theory. In 1932 J. C. Chadwick discovered the 'neutron' and in the same year H. C. Urey, F. G. Brickwedde, and G. M. Murphy discovered the 'deutron'. With the help deutrons Irene Curie and F. Joliot made artificial radio-active substances. In that year Eurico Fermi, the great Italian scientist, found that neutrons were the most suitable things to bombard atoms and he prepared 'super-uranium' (atomic number 930) which was the first of the trans-uranic elements.

For the most part of this century it was common knowledge in Physics and Chemistry that the atom was not indivisible and it consisted of negatively charged electric particles called electrons revolving round a positively charged nucleus. The actual construction of the nucleus is not known. But we know that various electric particles shoot out from the nucleus whether they exist as such in the nucleus is another question. One of these particles is neutron which is characterised by being neutrally charged. It is, therefore, not particularly attracted or repelled by the electric charges of the atom and so it has a fair chance of penetrating deep into another atom.

The nucleii of most of the chemical elements are stable, but those of some of the very heavy atoms break down, discharging various electric particles. They are called radio-active elements. These particles are used by the scientists to bombard the atoms of more stable elements.

It is only in the case of very few atoms that the release of atomic energy in large quantities occurs, more energy being needed to split them than the energy derived from them after bombardment. Such useful elements are uranium, thorium etc.

Uranium, though slightly radio-active, is not particularly unstable, and it has eight isotopes. The isotope U235 reaches the crucial reaction of releasing atomic energy in considerable amount. When hit by a neutron it splits up into two rather large bits, the atoms of Barium (at. No. 56, at wt. 137) and Krypton (at. No. 36 at. wt. 83). In addition to this it evolves great energy and produces still more neutrons to split other U235 atoms. If one has a lump of U235 then the process will go on throughout the whole lump. The amount of energy released by each atom is considerable and there are innumerable atoms in a lump. Therefore the total amount of

energy released by a small lump is tremendous. It is this release of enormous energy in a minute lapse of time that constitutes the explosion of the atom bomb. The first atom bomb that was dropped on *Hiroshima* had energy equivalent to 20,000 tons of T. N. T. Subsequent researches have increased much more energy of the atom bomb. The secret of the preparation of the atom bomb was thus at last found out.

The first difficulty encountered in the preparation of the atom bomb was to get sufficient quantity of pure U235. U238, *i.e.* the ordinary uranium, is 140 times more common than U235; and uranium itself is a rare element. We can easily guess how very rare U235 is! The chemical properties of U235 and U238 are also very similar. This makes the purification of U235 extremely difficult. The difficulty of actually releasing atomic energy is increased by the fact that a small amount of U238 will be sufficient to stop the reaction, because it absorbs neutrons and does neither release much energy nor produce more neutrons to split other atoms.

But U238, when hit by a neutron, does not remain unaltered. It changes into an unstable isotope U239, which by emitting a beta-particle becomes a new element neptunium (at. No. 93). But being an unstable element it also by emitting an electron becomes transformed into plutonium (at. No. 94). The reaction is written thus:

$$_{92}U^{238} + {_0n^1} \rightarrow {_{92}U^{239}}$$
$$_{92}U^{239} \rightarrow {_{93}Np^{239}} + {_{-1}e^0}$$
$$_{93}Np^{239} \rightarrow {_{94}Nu^{239}} + {_{-1}e^0}$$

where Np is neptunium; Pu, plutonium; $_0n^1$ neutron, and $_{-1}e_0$, electron. In notation in nuclear chemistry the subscript represents the atomic number and the superscript the mass number. Plutonium also, like U235, sets up a chain of reactions when struck by a neutron. So it is equally suitable for the atom bomb. It is chemically different from uranium, so it can be easily separated from a mixed mass. So it is more convenient to use in the making of the atom bomb. Thanks to the tireless efforts of the scientists, a machine for disintegrating atoms has been invented.

The principles of this machine are quite simple. If a neutron hits a U235 atom then it releases a lot of energy and more neutrons. In a mixed mass of Uranium of U235 and U238, U235 is only 0·7%. So the neutrons have a fair chance of hitting U238, which finally changes into plutonium. The sole function of this machine is to control the process. It should be arranged that the neutron hits some uranium atom and does not wander away in space. So the uranium is spread over graphite which does not generally absorb neutrons. So the neutron will bump over graphite atoms until it strikes some uranium atom and sets up a chain of reactions, as aforesaid. If one atom of uranium is hit then the 'atomic pile', as the uranium pile is called, will grow richer. This action is controlled by introducing cadmium plates

that absorb neutrons, and prevents an atomic explosion in the laboratory. The machine has the capacity to release the generated heat at a pre-arranged rate. It has been calculated that 1/10 to 1% of the mass of uranium is actually transformed into energy.

The first atom bomb was exploded at 5-30 a.m. on July 16, 1945, at Alamogordo air base in New Mexico. The gigantic steel tower from which it was suspended was completely vapourised by the heat of the bomb. The bomb was dropped on Nagasaki at 12-01 p.m. Aug. 9 (Japan time), 1945, on Hiroshima by the B-29 Superfortress, "Enola Gay" piloted by Col. Paul W. Thibbets. The bomb entirely devasted 60% of the town, 60,000 people were killed, 100,000 injured, and 200,000 were rendered homeless. The third bomb was dropped on Nagasaki at 12-10 p.m. Aug. 9 (Japan time), 1945, by the B-29 Superfortress, "Great Artiste" piloted by Maj. A. W. Sweeney. Here 10,000 people were killed, 20,000 injured, and 90,000 made homeless. The fourth and fifth atom bombs were dropped as test-bombs on Bikini Atoll by the B-29 Superfortress, "Dave's Dream" in early 1946. The bombs were developed at Clinton Engineering Works which occupied an area of 59,000 acres at Oak Ridge, Tennessee. These bombs were developed under cover of secrecy which puts Aladin's Clock of Invisibility to shame.

Though man has mastered the greatest power of the universe still so far it has brought terror, devastation, and death in its wake. It fell upon mankind like the curse of God for its iniquities. There is no defence against this demon except the total abolition of war. But we hope that a day will come when atomic energy instead of terrorising man will serve him like the Genii of the Lamp. Man is apt to misuse the vast power he has suddently acquired but one day it will be used to further the progress of civilization and humanity. There is no reason to suppose why it should not be used like electricity which only a century ago was known in its deadly form, the lightning-bolt.

Isotope;—Two or more atoms of an element having the same atomic number and chemical properties but different atomic weights.

Pāharpur and its Remains

By

PROF. CHARU CHANDRA DAS GUPTA, M.A., P.R.S., Ph.D. (Cal.), Ph.D. (Cantab)

Pāhārpur is a small village in Rajshahi district in Bengal and, therefore, situated in the flat, alluvial plain of North Bengal which is not drained by any big and navigable river. It is three miles to the west of the railway station at Jamalganj on the main line from Calcutta to Siliguri on the East Indian Railway. There is an unmetalled road from the station to this village by which the ancient Buddhist temple here may be approached. (Plate I).

It was Buchanan Hamilton who, for the first time, described the ruins at Pāhārpur in the early part of the last century. He held that this ruin was the most remarkable of its kind in this part of Bengal. His theory that it was a Buddhist stūpa was accepted by Westmacott. Later Cunningham gave a short account of this monument. It was in 1922-23 that the University of Calcutta carried out excavation at this site; but, on account of financial stringency, the University could not carry out further digging at this site. In 1925-26 the exacavation at this site was resumed by the Indian Archæological Department, and this work went on till 1934. On account of continuous digging for a number of years a magnificent Buddhist temple surrounded on four sides by a monastery, and another Buddhist establishment at a place called Satyapir's Bhita situated at a distance of 300 yards from the eastern side of the monastery have come out.

There is no evidence to show that there was a religious establishment here till the Gupta age. This conclusion may be arrived at from a close study of the copper-plate grant of the year 159 found here. The purport of this grant is that a Brahmin named Nāthaśarmā and his wife approached the district officer of Puṇḍravardhana and the city council for the purpose of buying 1½ *kulyavāpa* of land situated in four villages with three *dīnāras*. The money which would be earned from this land would be spent in buying necessary articles such as sandal, incense and flower for the worship of the *arhats* and for the construction of a rest-house in the *vihāra* situated in Vaṭagohālī for the Jaina teacher Guhanandin. This grant was caused to be written on the seventh day of the month of Māgha in the year 159 which, if referred to the Gupta era, would correspond to c. 478 A.D. From the point of view of palæography also it belongs to the 5th century A.D. It is known from other epigraphical sources that North Bengal was under the regime

of the Gupta monarchs in the fifth century A.D. Among the places mentioned in this grant only Puṇḍravardhana and Vaṭagohālī may be identified, respectively with Mahāsthān and Goalbhita, a village adjacent to Pāhārpur. From this grant it is evident that there was a Jaina *vihāra* adjacent to Pāhārpur and that this region was quite well known in the Gupta age; but nothing is known about the Buddhist establishment here.

When the Pāla rulers began to rule, peace and tranquility prevailed throughout Bengal, and an uncommon development in architecture and sculpture took place in this age. The Pāla rulers were Buddhist by religion and in the time of Dharmapāla and Devapāla many Buddhist *vihāras* and temples were made in Bengal. At Pāhārpur some clay seals of Dharmapāladeva have been found. The inscription on these seals is as follows:—1. Śrī Somapure, 2. Śrī Dharmapāladeva, 3. Mahāvihārīy-ārya-bhikshu-saṁghasya, *i.e.*, of the community of the venerable monks belonging to the great *vihāra* at the famous Somapura (founded by) the illustrious Dharmapāladeva. Pāhārpur is the modern name of the ancient Somapura and Dharmapāladeva is none other than the second ruler of the Pāla Dynasty, who reigned from c. 769 to 815 A.D. It would, therefore, appear that the great *vihāra* at Sompura was founded in the latter part of the eighth century A.D.

In the latter half of the ninth century A.D. there was a great conflict between the rulers of the Pāla and the Gurjara-Pratīhāra dynasties. During his period Bhoja I and Mahendrapāla of the Gurjara-Pratīhāra dynasty caused great harm to the Pāla Empire. On account of this foreign invasion the Pāla Empire dwindled in briliance; but the glory of the Pāla Empire was revived when Mahīpāla I established the second empire. It has been recorded in the Tibetan work *Pag Sam Zon Zang* that Mahīpāla used to offer his homage at the great *vihāra* at Somapura. It is understood from an inscribed image of Buddha found at Bodh Gaya that a Buddhist ascetic named Vīryendrabhadra who hailed from the great *vihāra* at Somapura visited the Buddhist *vihāra* at Bodh Gaya and made a gift of the image of Buddha on which this inscription was engraved. This inscription is not dated; but, judged from the point of view of palæography, it should be ascribed to the 10th century A.D. That this religious establishment was a well-reputed institution of its kind even in the twelfth century A.D. is evident from the Nalanda inscription of Vipulaśrīmitra. The purport of this inscription is that Vipulaśrīmitra who lived in the great *vihāra* at Somapura for a long time caused a temple of Tārā to be constructed at Somapura, repaired four cells and presented a gold ornament for the embellishment of a Buddha image. Another stone pillar inscription of the twelfth century A.D. shows that the great *vihāra* at Somapura was very famous in that age. In this inscription it is stated that Daśabalagarbha caused the pillar to be made for the gratification of the three jewels (*triratna*) and for the desire of doing good to all good people.

REMAINS AT PAHARPUR
General view of the main temple after excavation

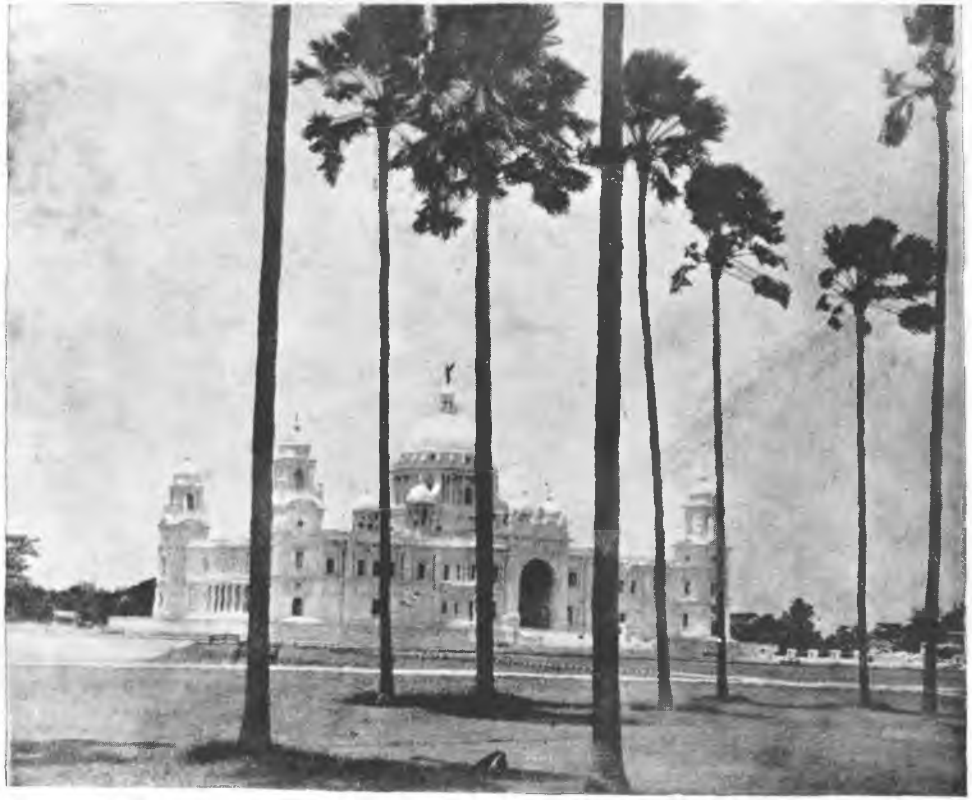

Victoria Memorial

[*Photo*: Sunil Ghosh,
Ex-student

a decadence of the Pāla power, and Bengal was successively invaded by the Chedi king Karṇa, the Chola king Rājendra I and the Kaivarta chief Divya. In the latter half of the eleventh century A. D. Rāmapāla again brought back the lost glory of the Pāla family.

In the last quarter of the eleventh century A. D. the Pāla dynasty succumbed to the more powerful Sena dynasty, the rulers of which were Brāhmanical by faith. In this period the great *vihāra* at Somapura was evidently neglected. In the thirteenth century the Mohammedans invaded Bengal; and it is quite probable that, on account of this invasion, the great *vihāra* at Somapura was greatly mutilated and then abandoned for ever.

There is no doubt that the main temple at Pāhārpur is one of the most magnificent and unique architectural specimens of ancient India. The general plan of the main temple is in the form of a cross having angles of projection between the arms of the cross and three raised terraces. It is planned in such a way that there is no scope for its expansion horizontally.

The basement wall is probably in the same condition as it was originally. In the lowest course of the basement wall have been fixed bas reliefs at most of the angles of projection and in specially built recesses in the middle of the wall. Above this course on the basement wall there is a cornice consisting of a half-round moulding and two plain mouldings. Above this cornice there is a row of terracotta plaques set in the recessed panels. Above this row of terracotta plaques there is another cornice consisting of nine mouldings. After this cornice the plain ashlar wall begins. There is another cornice consisting of nine mouldings. Above this cornice there is another row of terracotta plaques set in the recessed rectangular panels.

The main temple used to be approached by an entrance which is on the northern side of the monastery. The pilgrims used to ascend the first terrace by the main staircase. On the first terrace there is a passage for circumambulation. There were found two rows of terracotta plaques set in the recessed panels on the inner wall of the passage separated from each other by the projecting moulding.

There is a similar circumambulatory passage on the second terrace also. Unlike the first terrace no row of terracotta plaques is found here. There is a shrine with an antechamber at each cardinal point.

There is no sufficient evidence to reconstruct with precision the architectonic shape of this edifice above the second terrace. It seems highly plausible that the main place of worship was at the topmost part of the temple.

Like the main temple the monastery is also equally magnificent. No monastery has yet been found in India which is more extensive than this.

It measures 922′×919′, and has rows of cells on four sides forming, as it were, four lines of a rectangular object. At the middle of each side except the northern one there is a special block which consists of three cells. On the northern side this space is occupied by a hall. This serves, as it were, the main entrance to this monastery. On the outer side of the establishment there is a rampart wall which runs continuously on all sides. There are altogether 177 cells excluding those which are in the middle of each side except the north where is the hall. Out of these 177 cells 45 are on the north and 44 on each of the three other sides.

In the courtyard in front of rooms Nos. 49-53 the visitor comes across one of the most important structures, *viz.*, a miniature replica of the central temple in which the ground plan of the main temple with its triplicate projection between each arm of the cross is faithfully reproduced with the additional feature of ascending steps on the four sides. This model temple is bounded on all sides by a wall having two projections between each arm of the cross and an entrance on the eastern side only.

In front of rooms Nos. 76-78 there have been found the remains of a big hall which appears to have been a large rectangular structure. No trace of its enclosing wall on the northern side has been found. On its western side there is an open platform. That this hall was a perfect specimen of architecture from the point of view of sanitation is evident from the remains of drains on the eastern as well as on the western sides of this hall. Besides these drains there are also the remains of another drain in front of the open platform. To the west of this platform there are the remains of three wells. On two sides of these three wells, which are in a line, there are two rooms. It seems that the great hall, the open platform, the three wells and the two rooms on two sides of these wells belong to one individual establishment, most probably the dining section, the great hall serving as the dining hall, the two rooms as the kitchen, and the three wells for drinking purposes.

There are some structural remains outside the enclosure-wall in the south-eastern side of the monastery. There are the remains of an ancient bathing *ghat* here. In this part of Bengal a story is current regarding this *ghat*. It is as follows. There was a king named Mahīdalana who had a daughter called Sandhyāvatī. This royal princess became the mother of Satyapīra through immaculate conception. When her father heard this, he did not believe it. Satyapīra was born and gradually grew to be a great saint. Later on Satyapīra died in a terrible flood which swept the palace of his maternal grandfather in which he was residing. Sandhyāvatī, mother of Satyapīra, it is said, used to take her bath every day at this *ghat*.

There is another ruined structure which should be considered now. It is a mound known as Satyapīra's Bhita situated at a distance of 300 yards from the eastern side of the monastery. The original mound was not at

all high, the topmost point being only 6′ to 7′ high with a gradual slope towards the sides, especially in the northern and the southern sides.

When this mound was excavated, all the remains came out. The compound wall on all the three sides except the north has been found. The whole site is trapezoidal in shape; the southern boundary wall is about 140′ in length, the eastern boundary wall is over 250′ in length, and the western boundary wall is 300′ in length. The most important structure within the compound of this site is the main temple.

The approach to the area and to the main temple was on the south which is the narrowest side. In front of the main temple and at a distance of 130′ stood a building which served the purpose of an entrance hall in the later age.

The main temple consists of two parts, *viz.*, the main shrine or sanctum in the northern portion and a pillared hall on the south around which lay the circumambulatory passage. A number of circular terracotta plaques with the figure of eight-handed Tārā and the Buddhist creed inscribed on them have been found in the courtyard of the main temple. From the standpoint of palæography these belong to the eleventh century A. D. In the Nālāndā inscription of Vipulaśrīmitra it has been stated that Vipulaśrīmitra built a temple of Tārā with an attached court and a tank at Somapura identified with Pāhārpur. When the effigies of Tārā have been found in such a large number in Satyapīra's Bhita and at no other place in Pāhārpur and when there is the presence of the superstructure of a temple at this site, the irresistible conclusion is that this temple was the original temple of Tārā referred to in the above inscription. No trace of the tank has been found. The court which has been found here may be the same as mentioned in the above inscription.

The archæological excavations at Pāhārpur not only brought to light one of the most magnificent structures of ancient India but also many other objects of importance. Among these objects particular mention may be made of unique specimens of sculpture which fill up a great gap in the history of Bengal art. It seems that from the Maurya age evidence of the art of sculpture in Bengal has been found. Some terracotta figurines have been found at some sites in Bengal of which mention should be made of Gitagram. There is resemblance in modelling between the specimens found at Gitagram and those found at other sites whose date has been definitely proved to be Maurya. Some other terracotta figurines found here and at Mahāsthān have been ascribed to the Suṅga age. Two sculptures of Sūrya, one from Kumarpur and the other from Niyamatpur, both in the Rajshahi district, an image of Viṣṇu found at Kankrail in the Malda district and a colossal head found in the Dinajpur district betray Kushāna influence and it is, therefore, highly probable that they are to be ascribed to the Kushāṇa age. Further, certain sculptures, mentioned below, are to be as-

cribed to the Gupta age. These are an image of Buddha found at Bihrail in Rajshahi district, an image of Sūrya found at Deora in Dinajpur district and an image of Mañjuśrī found at Mahāsthān in Bogra district.

* * *

The sculptures found on the walls of the main temple at Pāhārpur are mainly of two types, *viz.*, stone sculptures and terracotta plaques. Except a few loose sculptures all the stone sculptures which number 63 are reliefs fixed on the basement wall of the temple. The beginning of the main temple at Pāhārpur should be ascribed to the age of Dharmapāla, the Pāla emperor; but it is important to note that all these sculptures fundamentally differ from those of the time of Dharmapāla. Regarding the age of the Pāhārpur sculpture Dr. Kramrisch has remarked, "The terracotta and stone-panels from Pāhārpur, North Bengal, belong to two traditions—the one, numerically in the minority, is an eastern and provincial version of contemporary sculpture in Madhyadeśa, but the other is an undiluted and indigenous and eastern Indian contribution. Significantly enough the latter is animate in scenes and figures. But when divinities are represented in *samapadasthānaka*, a hybrid compromise between the tradition of Gupta sculpture of Madhyadeśa and Bengali form is arrived at. From this cult the images of the Pāla and Sena schools take their beginning." That this statement of Dr. Kramrisch is true is understood from a study of the plasticity and modelling of three typical specimens found at Pāhārpur. If we compare the modelling of these specimens, we find a great deal of difference between them. In one figure we find one man and one woman in the erotic attitude. The modelling is highly reminiscent of Gupta sculpture. In another figure we find a male flute-player. The modelling of this figure is very much different from that of the first-mentioned figure. Unlike the modelling of the first figure the modelling of this figure consists in a coarse treatment of the body surface, the bulging eyes, the broad mouth and the peculiar dressing of the hair. It has really no extant predecessor in Bengal. It represents "an undiluted and indigenous eastern Indian contribution". In another figure there is neither that soft Gupta element which is observable in the first figure nor that coarse indigenous eastern Indian element which is found in the second figure; but there seems to be a mixture of the Gupta and the indigenous eastern Indian elements. It is from this type that, according to the opinion of Dr. Kramrisch, "the cult images of Pāla and Sena schools take their beginning". Secondly, the very fact that the Pāhārpur sculptures may be stylistically divided into three distinct groups leads us to the conclusion that they do not belong to the same age. Besides the evidence of plasticity, there are other reasons for holding this view. First, the epigraphic evidence, as has been shown before, seems to corroborate this view. Secondly, the size of the terracotta panels also leads us to the same conclusion. Their size is not uniform but various. So far as the age of the sculptures is concerned, they may be roughly classified

under three groups, the first belonging to the 6th century A. D., the second to the 7th century A. D. and the third to the 8th century A. D.

Among the sculptures we have some beautiful specimens representing Hindu, Buddhist and Jain pantheons. They are Brahmā, Śiva, Gaṇeśa, Yamunā, Balarāma, Indra, Agni, Yama, Bodhisattva, Padmapāṇi, Mañju-śrī, Jambhala and Tārā.

There are certain sculptures showing scenes from the *Rāmāyaṇa* and the *Mahābhārata*. It is well known that these two epics are the favourite subjects for representation in sculpture in India and the Far East.

There are some other sculptures representing episodes from the life of Kṛshṇa. One sculpture represents two standing figures—one male and the other female. This sculpture probably represents Rādhā and Kṛshṇa.

There is another group of interesting sculptures. Stories narrated in the *Pañchatantra* have been depicted on some of these plaques. In one such plaque is found a monkey sitting on a beam of wood and holding the wedge in its right hand. This at once reminds us of the story of *kilotpāṭī vānaraḥ* narrated in the *Pañchatantra*.

There is an important point about the main temple. It has already been stated that it has a peculiar architectonic form which was not found in India before its discovery; but we have found a number of architectural specimens in the Far East which are most probably derived from this prototype at Pāhārpur. Only recently a very similar structure has been found at Lauriya Nandangarh in Champāran district in Bihar. It is interesting to note that this is an earlier specimen. A similar architectural object of a later date has been recently found at Comilla in south-east Bengal. From these facts we can conclude that the architectural type which first originated in Bihar went to the Far East passing through Bengal. The main temple at Pāhārpur is, therefore, one of many interesting examples showing the relationship between India and the Far East.

Dusk and Dawn *

GAURIPRASAD GHOSH—*Ex-student*

HERE dusk is closing in. Lord of light, in what land, on which shore now breaks thy dawn?

Here in the dark the *rajanigandhā* throbs unseen like the maiden-bride lingering at the door of her bed-chamber;.........where blooms now the golden *champā* of the morn?

* A rendering into English prose of Tagore's *Sandhya O Probhat*.

Who wakes up and blows-out the candle lit at dusk and casts away the wreath of flowers woven at night?

One by one, here, the bolts are set up; there the casements are flung open. Here the boats lie anchored, the sailors merged in slumber; there the sails have caught the breeze.

They have set out from their inns, their faces turned to the east; morning light shines on their brows; their purses have not yet emptied For them the wistful yearning of dark eyes looks out in a steadfast gaze from the wayside windows. The pathway holds open before them the crimson note of welcome and says, "All is ready for you". Within their hearts a thousand trumpets burst forth in the rhythm of their blood.

Here in the grey light all have come across the farthest stretch of day-tide by the last ferry.

They spread their rags in the inn-yard; some are alone, the companions of some are tired; in the dark they cannot see what lies on the way before; only they are whispering of what was in the way behind; as they talk, their voices choke and they become speechless. Then, looking up from the yard, they find the stars have risen in the sky.

Lord of light, this dusk at thy left, that dawn at thy right,—do thou bring them together. Let the shadow of the one take the light of the other in its arms and enfold it in one tender caress; let the plaintive tune of the dying day bless the joyous morning notes, as it passes by.

In Memoriam

MRS. LILA MAJUMDAR

IN every generation there are born men who walk upon their country's soil, breathe its air, give obedience to its laws, but owe to it no allegiance, because they are truly denizens of an unreal world.

Such a man was the late Praphulla Chandra Ghosh.

I first saw him twenty years ago in one of the Post-graduate lecture-rooms of the Calcutta University, a heavy and gross-looking man, carelessly dressed in a plain close coat and dhoti, greying hair, sparse and unbrushed, and always with books in his hands.

I thought him a quiet man, unobtrusive and unimpressive, till he opened his lips to speak. Then he became a rare personality, a man with th

ability to mould minds. In an instant I realized that he did not belong to my country or to my generation, for out of his ordinary-looking throat spoke the voice of an Elizabethan Englishman.

A strong personality is like a diamond, hard and brilliant and with many facets. So was his indeed, a mind with many facets, but each illumined with the same white light of his seventeenth century intelligence. His broad appreciation of life, his wide ethics, his vigorous understanding not only of dainty things but of more pungent stuffs as well—all this was truly Elizabethan. He read Shakespeare to us always in the original, no expurgated versions for him, no hateful lady-like squeamishness. How we admired his invigorating mind. How truly he understood literature.

This above all else we learnt from him, that there are no caste distinctions in literature, that the literary mind is impregnated with a bravery which avoids nothing and condemns nothing, that prudery is a shameful weakness. Strange thoughts for a son of Bengal, born and bred on Bengal earth!

Some men live in the annals of the world for ever, but others, whose greatest gift is the gift of their personality are apt to pass into oblivion and truly perish with mortal death. Such a man was Praphulla Chandra Ghosh, never to be fully appreciated save by those who came into personal contact with him, most of all by his pupils who received at his hands the best he had to give.

No pen, brush, chisel or musical score will retain a fraction of his genius. Though he was far out of the ordinary, his extraordinariness had to be seen to be understood. Shakespeare and Chaucer will live for ever, but the man who gave them to us, who made their dead voices sing in our foreign ears, will pass away as other great scholars have passed away, as the greatest actors of the world whose greatest gift to mankind was also the gift of their personality, have passed away, leaving behind nothing more substantial than a memory.

I do not know which captivated the mind more, his deep erudition or his histrionic powers. He proved beyond doubt how marvellous a thing is the human voice. No one can describe the wealth of pain, grief, despair, tenderness, hope, malice and madness which poured from his throat.

With our George V ideas of the fitness of things, we had always been in the habit of considering the scholar and the actor as men of two different worlds; the one with a suggestion of the cloisters, the other of the stage; the one verging on the ascetic, the other on the indulgent. Praphulla Chandra Ghosh came into our lives with all such classifications levelled down to an Elizabethan plane of indiscrimination. Our old ideas were all upset. The scholar and the actor became one and the same person. With him we pursued the meaning of a word through volumes of reference, and decided upon the particular shade of an obscure colour, specified by an obsolete

adjective. With him we wept for Hecuba, though what was Hecuba to us that we should weep for her!

He would read a whole drama word-intact, from start to finish all at one sitting, and we would listen in breathless silence, both deaf to the ringing of bells and the passage of time. "Read" is too weak a word. He would assume each character in turn, and burn with frenzy and drown with sorrow, rave with the king and clown with the knave. He would do more than assume each character, he would become that character. Before our very eyes he would turn into Desdemona who was so lovely fair that the sense ached at her. Costume and stage sets were unnecessary, beauty itself was unimportant. With our own eyes we saw our portly professor become Ophelia in her bewildered agony.

Scholarliness is slowly becoming a thing of the past. Now some men cherish only such things as add to the material comforts and give pleasure to the physical senses alone, and the rest spend their lives keeping body and soul together. Few love scholarship for its own sake and not as a means to an end. Praphulla Chandra was one of the last of the passing generation of gentlemen, who loved words and had thoughts which are of no practical use to anyone on earth, but which reconcile men to the tragedy of birth.

He held no court, formed no school, compiled no voluminous dictionary nor otherwise perpetuated his mind's wealth. To those who had the good fortune to know him he was an experience to be remembered. He practised no graces; he was not socially popular even among those who marvelled at his powers.

My knowledge of him was limited to my studentship. It was on rare occasions that I met him otherwise, and on such rare occasions never heard him make clever witty remarks or unforgettable gestures. But always in the lecture rooms, he was a man apart. I have always considered that the best way to estimate a man is to see him as he is by himself, and not where past history and circumstance can plead for him. I have always had the vaguest ideas about the personal life he must have led, the domestic environment in which he lived, the everyday things he must have liked or disliked. Such things satisfy the curiosity of the seeker, but are of no real importance, just as the fact that Shakespeare once poached rabbits does not add to or subtract one iota from the perfection of *Hamlet*.

In a sense a scholar's life is a tremendous waste, because when his knowledge assumes its highest perfection it is usually time for him to depart, and no volume on earth can perpetuate the immensity of his erudition. With the departure of our revered professor the world is so much the poorer.

After the passage of a decade no one will be able to gauge the depth of this loss, save those only who heard the beauty of his voice. His pro-

আবির্ভাব
৩রা মার্চ, ১৮৮৩

তিরোভাব
২৭শে মার্চ, ১৯৪৮

Prof. P. C. GHOSH

Born 3 March, 1883; Student, Presidency College, 1898-1903; M.A. 1903; Griffith Prizeman 1905; P. R. Studentship 1907.

Temporary Lecturer, Presidency College 1904; Professor, Ripon College 1905-6; Temporary Professor, Presidency College 1906-7; Deputy Magistrate 1907-8; Professor, Presidency College 1908-1939; Emeritus Professor 1939. Lecturer, University of Calcutta 1912-38; Professor, University of Calcutta 1938; Fellow, University of Calcutta; Member of the Syndicate 1937. Died 27 March, 1948.

nunciation of English words was wellnigh perfect. Whenever I heard him read I realized that reading was one of the highest arts and that good enunciation had a science of its own. The rounding off of his final consonants, the purity of his vowels, and the beautiful timing of his speech, all of which completed the cadence of his elocution, were a lesson in themselves.

Now more than ever rises the question of the worthwhileness of the English language, in relation to our students. Now more than ever we must realize that a beautiful thing is always a beautiful thing, that Knowledge and Art owe no subjection to any man-made political boundaries, that a scholar's allegiance is only to the Muses.

Such a man was the late Professor Praphulla Chandra Ghosh, a man of letters in the truest sense of the term, who over and over again had made me wonder which world was more true, the real or the unreal.

Professor Praphulla Chandra Ghosh

Dr. Srikumar Banerjee

It was just a year ago that Professor Praphulla Chandra Ghosh passed away to his eternal rest. The dim light that had settled upon his soul for the last few years of his life at last deepened into the impenetrable darkness of death. Indeed the closing years of Prof. Ghosh's life present a spectacle of an overwhelmingly tragic and pathetic interest. That a life so full of overflowing vitality, an intellect so keen and radiant, a temper testifying in such an abundant measure to the joy and zest of existence, a humour so rich and genial and occasionally so trenchant in its criticism and understanding of life should have suffered such a melancholy eclipse, such a sudden and irremediable overclouding is one of those dark, inscrutable paradoxes through which we seek in vain to discover the light of reason. The appalling change might very well fall, on its own lower, domestic plane, into the pattern of a Shakespearean tragedy. It appears almost like a mocking irony of fate that the man who was perhaps the keenest interpreter and expounder in the East of the dark, tortuous workings of the Shakespearean mind in its conception of the abysmal whirl of deranged faculties should himself be caught up within the circle of flame and singe his soul beyond cure. Yet such is life, and in a moment without any previous warning, the lights in our soul are blotted out and we are left to wander in the blinding mists and fogs flowing in from the contiguous realm of chaos and spiritual anarchy.

Let us draw the curtain over what is so poignantly sad to contempla and turn our eyes to the brighter phase, the luminous activity of Pro Ghosh's career that made him the radiant source of light and heat i our drab colourless educational system of today. His was a vivid colou ful personality which the dull, routine-bound life of the teaching professio as it has come to develop in our country could not dim or obscure. Wit him teaching was not at all a profession, but an inspired and inspirin vocation of life. He was the last of that glorious fraternity—now alas ex tinct with us—, who found an immense, unquenchable ardour in the imparting of instruction, a rare felicity and satisfaction of mind in a contact with their pupils. For Praphulla Chandra the atmosphere of the class-room, usually so chill and depressing, was a-glow with the spirit of excitement and exaltation. His mind glowed and expanded under its stimulus and it gave out its very best, the choicest flavour of its taste of life and literature in his class lectures. He was not the type of teacher who could settle down in the solitude of his study and confide his best and most original ideas to the custody of pen and paper. The immediate contact with his pupils, the spell of the spoken word, the looks of expectancy that were focussed on his face—these were wanted to touch the vital chords in his mind and release the springs of creative inspiration. There are teachers who devote the best part of their mind and equipment to research-work; their pupils have the benefit of only the dregs of their mind and drink of the flavourless residue of the cup. That was not the ideal of Praphulla Chandra: he would take it to be a defrauding of his pupils, an attempt to feed them on lean and watery diet. He would withhold nothing from them: all the rich researches of his mind were thrown open to them. Every single lecture provided a feast, a perfection of epicureanism, nay a surfeit which only the most gifted among the students could taste with relish and digest with ease. Many a researcher pampers himself at the cost of his students; the glory that wreathes his head is perhaps appropriated out of the warmth and glow of the class-room, and is a diversion of energy that might have been better applied to improve the quality of teaching. Praphulla Chandra denied himself the glory of a researcher, so that his pupils might not be stinted of their nourishment. Many a gem of original thought, many embryonic suggestions that would have grown into full-fledged research-work, stray sparks that required but the breath of persistence to kindle into a steady flame must have found at once their cradle and their bier in the spoken words, haunting perhaps the memory of some of his pupils today but irrecoverably lost to the wider world of scholarship for want of timely record and preservation!

II

Never have I seen a teacher going about his job with a more inexhaustible fund of idealism and gusto than Professor Praphulla Chandra.

The bell inviting him to the class-room touched a deeper chord in his nature than what is associated with the mere sense of duty: it awakened the artist, the intellectual epicure that lay deep-rooted in his constitution. Never was there a more marked transformation than what appeared in his demeanour and bearing when the call of duty came to him. I have seen him talking for hours together with his usual animated vivacity in the Professors' Common Room or lounging half-dosing in his easy chair. As soon as the bell rang, he woke up with a start, and appeared altogether a new man. The creases in his face had straightened out, and the face itself wore a new sensitiveness of expression, a keen intentness of purpose: the eyes beamed with a rapt beatitude, a glitter of excitement and expectancy. He marched to the class-room, "with sudden brightness attired". Once in the class-room Praphulla Chandra forgot himself and the sense of time. His exuberance of enthusiasm overflowed the rigid limitations of the time-table and made deep inroads upon the period of his successor. His self-forgetfulness may well have reached the point of an actual illusion. The drab realities of the class-room were transformed in his imagination into the wonder-land of the Shakespearean drama which he trod as naturally as if he were an actor rather than a mere expounder. He had very often to be reminded that he had transgressed his limit and then the spell broke with a snap, and out he stepped from the magic circle with the brooding, bemused face of one who had been wandering in strange lands. With the average, even the able teacher, the inexorable tyranny of routine is apt to dull the edge of interest and subdue the native elasticity of the mind. Praphulla Chandra conquered this all-devouring dragon of routine. For him the six working days of the week did not provide a sufficiently expansive time-space. He requisitioned the Sundays also, the universal days of rest, into his service. His Sunday lectures, which were as widely attended as an ordinary working-day lecture, continued for four hours at a stretch, during which neither his own spirit nor the receptivity and interest of his pupils flagged for a moment. It was a wonderful achievement unparallelled in the history of teaching. Never did a teacher make such an inordinate demand on his pupils and never was the demand met with a more ungrudging response. During this period the whole of a drama was read from beginning to end, and the listeners saw the entire action unfolding itself before their eyes, the interest rising from scene to scene till it gripped their mind with an overwhelming culmination of effect. Thus to the three Aristotelian unities of the drama he added the fourth unity of an unbroken dramatic exposition in the class-room. The present scholastic method that cuts up a drama into small fragments in lectures resumed after fairly long intervals is hardly suited for conveying that unity of impression which it is the task of the dramatist to create and that of the expounder to recapture. Praphulla Chandra, with his inborn dramatic sense, could never bring himself to

acquiesce in this formal arrangement that was like a porous vessel through which the dramatic essence tended to escape. He took himself as seriously as the dramatist and attempted to convey the dramatic effect, entire and unimpaired, in a single sitting. Who can say whether this over-strain continued from week to week had originated the germs of the malady that darkened the closing chapter of his life!

III

As a student of literature, Praphulla Chandra had his own unique and characteristic preferences and exclusions. His temperament strongly reacted to what he read and added an individual flavour to the subjects of his study. He had a special liking for that kind of literature which is soaked in the sap of life. He tasted with a rare unction and relish even those slight, usually neglected morsels on which the richness of life had left its stamp. It was this predominant interest in the raciness of life as reflected in literature that made him a connoisseur par excellence of the drama, particularly the Shakespearean drama. The comedies of Shakespeare evoked the humorist in him and roused him to a mood of transcendent appreciation. The humour of a Falstaff appealed with double sway through the added vivacity that Praphulla Chandra's own humorous outlook on life lent to it. The Elizabethan dramatists, as a race, found in him a kindred soul. In non-dramatic literature, Chaucer was his favourite and generations of students have been initiated into his sly and delicate humour through Praphulla Chandra's deft handling of a trait encrusted with the rust of antiquity. His breath blew away the rust and the metal hidden beneath shone forth. His mind found a congenial pasturage in the seventeenth century humorists, whose quaint rambling thoughts and antique turns of phrase so exactly fitted in with his own temperament. He revelled in Lamb, as was naturally to be expected, hunting out with true scholarly relish his most obscure allusions and tasting with unction the reminiscent flavour of his style. The flatness and vulgarity of much of modern literature repelled his fastidious taste, and the bounds of his sympathy in respect to the moderns were limited to Carlyle and Stevenson.

The one blind spot in his sensitive appreciation of literature and catholicity of taste was his rather neutral attitude to Romantic poetry. Whatever was crabbed, bizarre, twisted and oblique in thought and expression, sharp and pungent to the palate or breathing of a broad, unsophisticated humanism he enjoyed with a hearty smack, an almost epicurean relish. Literature seasoned with the salt of humour and commonsense had a special appeal to him. But strangely enough the rapt felicities, the imaginative fervours and emotional riot of romantic poetry left him chill and rather sceptical. A too rich accumulation of beauty repelled him as an over-spiced dish. Perhaps he had inherited both his strong and weak points, his unrivalled love of

Elizabethan drama and his insensitiveness to Romanticism from his great teacher, the late Mr. H. M. Percival, who revelled in the entire range of English literature only to fight shy of Shelley. Perhaps both in the master and the pupil a passion for exactness of sense, a meticulous precision in interpretation found itself occasionally baffled in the vague mysticism of Shelley's poetry, which demands more an intuitive sympathy than a rigorous expounding and analytical faculty for its proper appreciation. Another reason for Praphulla Chandra's lack of enthusiasm was the delicate exclusiveness of his taste. A temple visited by throngs of undiscerning pilgrims, gods obscured by the incense of extravagant adoration, an attitude of mind that tended to soften into sloppy sentimentalism, a choral psalm-singing in which the individual accents were drowned in the general hub-bub—all this militated against the native refinement and integrity of his mind. Romantic poetry, like the triumphal chariot of Bacchus described in Keats' *Endymion*, has been followed by a tumultuous throng of worshippers and Praphulla Chandra proudly stood away from this jostling, beauty-intoxicated crowd. He would build for himself a chapel for private worship high on the inaccessible peaks of literature and there commune with his gods in a select, choice company. Like Shakespeare, the special god of his worship, he had a rooted distrust of the crude, coarse ways of democracy and shunned a mob, even when entrenched amidst academic and aristocratic circles.

Another rare accomplishment of Prof. Ghosh that deserves honourable mention is his proficiency as a linguist. He had a working knowledge of several European languages, both ancient and modern, and utilised his knowledge in the teaching of English literature. The wide range of his interests and linguistic equipment imparted a special charm and insight to his teaching of the translations of Greek and Latin classics and of such English authors as had a predominantly classical bias. Praphulla Chandra's first love had been Philology ; and from this vantage-ground of an adequate philological mastery he surveyed the field of English literature with an intimate understanding of its verbal niceties and an appreciation of its international affiliations to which few among his fellow-teachers had any access. Now that he is gone from our midst, there is no one else who can follow his path, and the wider vistas that he had opened up are in danger of being closed again and the study of literature tends to relapse into its rut of a narrow one-sidedness.

IV

Such was Praphulla Chandra, as a scholar and a teacher. As a man he had equally uncontestable claims to greatness. Behind a rather gruff exterior he carried a heart overflowing with love and tenderness. A great bereavement sustained early in life in the death of his only son had created in him a mood of philosophical detachment to life and had released the flow of love in his heart from the narrow limitations of family demands. Never have I

seen an appeal to his kindly feelings go without a response. Open-handed, almost indiscriminate in his charities, he offered his bounty to everyone who sought his help. The number of poor students that he housed and fed and nourished with more than paternal affection in his long career as a teacher forms an immortal monument to his high-souled liberality. The present writer owes to him a debt he can never repay, having been indebted for his first admission into the staff of Presidency College to his kindly initiative. Many of his friends and ex-pupils treasure in their heart a grateful remembrance of services rendered by and benefits received from him. Above all, there was such a sweet grace in the way in which he conferred his benefits, such a readiness and spontaneity of will that the giver figured more largely in the mind than the gift itself. His reverence for his father, the bated breath with which he waited on his least wishes, the profound humility of his bearing when talking with him furnish a model in these days of lax family ties and discipline. Taken in all his aspects, in his great merits and slight failings, Praphulla Chandra impress one as a unique and unforgettable personality, scarred indeed and roughly indented by the blows of Fate but rising superior in his innate dignity to all force of external circumstances.

Praphulla Chandra was in sober verity and not merely in a rhetorical way of speaking the last of the giants. We, men of a lesser build, who have been left behind to work in the field which he strode like a colossus must bow our head in profound homage in an awe-struck recognition of his greatness.]

Address

[In 1939, Professor P. C. Ghosh retired after an unbroken period of service extending over thirty-one years and was appointed Emeritus Professor. Presidency College has had many great teachers but few so great as he. His many students in all parts of India expressed a desire to commemorate the occasion of his retirement in a befitting manner. With this end in view a Farewell Committee was formed which raised subscriptions and drew up a programme. Out of the funds collected a bust of Professor P. C. Ghosh was made and placed on the second floor of the main building. The principal subscribers were three princes of the Nepal royal family and Sri Bimal Chandra Sinha and Sri Jagadish Chandra Sinha.

A farewell meeting was held at the Physics Theatre on the 9th December, 1939. It was one of the most memorable meetings ever held in the College. The Physics Theatre was packed to suffocation; and yet there were many who for want of accommodation had to hang about in the corridors. The audience

was representative of all shades of public life in Calcutta and were drawn from three generations of pupils. Principal B. M. Sen presided over the meeting. The following address printed on silk and enclosed in a silver casket was presented to Professor Ghosh, and speeches were made by Sir Jadu Nath Sarkar, Professor Ghosh's teacher, Mr. J. M. Bottomley (then D. P. I.) and Professor H. K. Banerji on behalf of his colleagues, and by Sir Mohammed Azizul Huq (then Vice-Chancellor, Calcutta University), Dr. Syama Prasad Mookerjee, Sri Charu Chandra Biswas (then Judge, High Court), Janab Humayun Kabir and Professor Hiren Mukherji on behalf of his pupils. After Professor Ghosh's reply, the meeting dispersed late in the evening.]

To

PRAPHULLA CHANDRA GHOSH,
Emeritus Professor,
Presidency College.

SIR,

Partings are painful. But the present occasion is not only painful but overwhelming. For in your case, Sir, we feel that a Power is passing from Presidency College.

For more than thirty years you have been at this College: one of the greatest teachers it has had in its annals. For these thirty long years you have done and been so much for this College that you have seemed to epitomise in your person all its glory and greatness. People no longer think of you as an individual member of the staff, you have become an institution.

To all associated with this College the thought of the blank after you must be overwhelming. How can it be filled? It needs an effort to think of Presidency College without Praphulla Chandra Ghosh.

Your lectures have been an experience in the lives of generations of students. In their combination of scholarship and inspiringness they have been unique. Your pupils have often wondered which to admire most—your lovely English, or your marvellous readings, or that rare insight that brought life even into a comma of Shakespeare's, or that multifarious learning that roamed at ease over literatures, and languages, and histories, classical and modern. Your profession was also the passion of your life; you threw your whole being into your work making it its own reward. And your enthusiasm infected your pupils. They shared your absorption in your work, and rich is their memory of classes where the hours flitted by while teacher and students sat equally immersed in the subject before them.

Your very personality was an asset for the College. There was strength for an institution in a presence that commanded spontaneous respect. A man of fearless independence of character, you ever held your head high. But those who knew you only as a towering figure at your post knew you only in part. It was finer still to know you outside your work and discover your warm human soul, so genial and so generous.

The charity of your soul will be, to your pupils, a most precious memory. In their need they have found you the kindest of helpers, and hundreds will ever remember with gratitude the parental interest with which you have guided their studies or helped them to a career.

As you go into retirement, our best wishes accompany you for your health and long life and prosperity. But this College, Sir, cannot really spare you. It has comfort in the knowledge that it has still got you as Emeritus Professor, on whose leisure it may yet dare to make demands.

We remain,
SIR,
Your affectionate pupils.

Presidency College,
CALCUTTA
9th December, 1939.

Professor P. C. Ghosh died on the 27th March, 1948. The bier was followed by a large number of his pupils and wreaths were placed by Principal Mahalanobis on behalf of the College. A memorial meeting was held on the 30th March, 1948 in the Physics Theatre. Speeches were delivered by Dr. J. C. Sinha, Professor Somnath Maitra and Principal P. C. Mahalanobis. Resolutions were passed expressing the sense of grief and loss felt by members of the College, and a message of condolence was sent to the bereaved family.

College Union Council, 1947-48

Sitting (L to R): Ashis Kumar Chakravarty (Gen. Secy.); Prof. Janardan Chakravarty (President, Social Service Section); Principal Jyotirmoy Ghosh (President, *ex-officio*); Prof. Sushobhan Chandra Sarkar (Dean); Prof. Nirmal Sen (President, Drama Section); Dilip Bhowal (Vice-President).

Standing (L to R): Nirmal Mitra (Secy., Jr. Common Room); Anil Saha (Secy., Debate Section); Sukomal Das Gupta [illegible]

Festival Cricket Match, 1948
Between
Past and Present Students

Book Reviews

PLAN FOR EDUCATION. By F. G. Pearce. Oxford University Press. Price Rs. 3/-.

This book which purports to be a descriptive and critical commentary of the Report of the Central Advisory Board of Education on Post-War Educational Development in India, otherwise known as the Sargent Plan, might perhaps have been more aptly described as 'SARGENT PLAN MADE EASY'. To call it a critical commentary is a misnomer, for the book consists almost entirely of a description and elaboration of the main features of the Plan. The little commentary that one finds towards the end of the book is concerned with replying to some criticisms made in the dissenting notes of a few members of the Board or published in some educational journals by critics whom the author has chosen to keep anonymous. The author has set himself the limited task of explaining the main features and implications of the Sargent Plan to the lay reader and has done it with admirable lucidity in about two-thirds of the length of the original Report. He has not taxed the reader with long tables of figures which interest only the experts, but has more than made up for this omission by enlisting the help of Mr. C. H. G. Moorhouse whose brush adds a touch of vividness to our knowledge, which figures in cold print could hardly have achieved. One of the great merits of the Sargent Report is the lucidity of its presentation (which, by the way, is rather remarkable in what is obviously a co-operative production), but it is to the credit of Mr. Pearce that he has achieved even greater clarity by concentrating upon the main idea and avoiding long arguments and figures which lead up to that idea.

This is not the place to enter into a long discussion of the Sargent Plan which more competent hands have done before now. The Plan does not pretend to make any profound contribution to educational theory or practice. "The object of the Board" as Dr. Sargent himself said elsewhere, "was a strictly practical one, *viz.*, to indicate in broad outline the minimum educational requirements of this country, to show how long it would take to satisfy them, and roughly what it would cost". It avowedly makes use of the labours of several committees set up by the C. A. B. from 1935 onwards and working intermittently for several years. Nevertheless, the Sargent Plan is a great landmark because it is the first comprehensive attempt to envisage education in all its aspects on a country-wide basis with a view to implement a programme intended to educate the entire people for citizenship as well as for their functions in the social economy for which their natural abilities would best fit them. It is the first time that official approval was given to 'Basic Education' centred round creative or productive activity, which experience of all countries has shown to be a better method of imparting education than a training of the intellect or memory through books. It gives the weight of its authority to the obvious but forgotten truth that the quality of teaching cannot improve unless teachers are adequately paid. It emphasises the obligation of the State to make primary education (6-14) free and compulsory, draws up a blue-print for training teachers in order that the basic primary schools may be staffed with properly qualified teachers within the shortest possible time, and suggests a way out of the enormous wastage involved in following the one-way track in education: from primary and middle schools to the high schools, from high schools to the University and from the University to—unemployment. All this is well known and would hardly bear repetition. I would merely draw attention to one particular recommendation of the Sargent Plan which is the only point on which the author disagrees. Although the Sargent Plan suggests a

break at eleven in order that specially intelligent boys (about 20%) may be transferred to Academic or Technical high schools, it is very definite in its insistence on keeping the remaining 80% in senior basic schools till the full 8-year course is completed. According to it, " education which lasts only for five years and ends about the age of 11 cannot be regarded as an adequate preparation either for life or for livelihood ". In the view of the author, the fact that the peasant may require the services of his child to balance his budget is a strong argument and he is prepared to compromise with a 5-year course till the peasant is convinced from his own experience that he can improve his economic position without depriving his child of education. The answer to this argument will be found at pages 3 and 8 of the Sargent Report. But it cannot be denied that the Sargent Plan has, by dividing primary education into junior basic and senior basic, lent itself to this kind of mutilation of the purposes of the framers of the Plan. The present reviewer recalls the conversation he had with Dr. Zakir Hossain on this point when he came down to Calcutta towards the beginning of last year. Although Dr. Zakir Hossain had himself agreed at first to a division of basic education into two stages, his apprehension was that the break at 11 might be a terminus instead of being merely a junction where students of varying capacities would be switched off into different directions. The comment of even an ardent supporter of the Sargent Plan like Mr. Pearce shows that Dr. Zakir Hossain's instinct was right.

The book can be recommended to all who want to grasp the fundamental principles of the Sargent Plan. There are a few typographical errors which should be corrected in the next edition. The word 'proportion' at page 16 (col. 1, line 16) is obviously a misprint for 'proposition'. Again figure 8 at page 40 (col. 1, line 5) should obviously be 6. The price of the book is somewhat high when it is remembered that one can purchase the Sargent Report for As. -/12/- only.

SAIBALKUMAR GUPTA.

GERARD MANLEY HOPKINS: THE MAN AND THE POET. By K. R. Srinivasa Iyengar. Oxford University Press, 1948, Rs. 12-8.

A competent book. The author, Dr. K. R. Srinivasa Iyengar, now Professor of English in the Andhra University, Waltair, has already made his mark in the field of 'Indo-Anglian' literature by his *Lytton Strachey, On Beauty* and other writings. The book under review is his most considerable work so far. For those who know their Hopkins, there is not much here that is outstandingly new, though they will of course appreciate the many good things said about Hopkins in course of the book and will possibly be interested in the references to the philosophies of St. Bonaventure and Duns Scotus in chapters iii & x (wishing, however, at the same time, that they were not so second-hand as they are). For those who have yet to know their Hopkins, the book would be a very helpful guide indeed, at once handy and adequate, to the life and work of the poet in all their phases and aspects and provide welcome assistance in the understanding of his difficult poetry. The book consists of eighteen chapters, of which fourteen study the life and poetry of Hopkins alongside and in relation to each other. The poems, particularly, are studied in detail and an honest, and one should add, successful attempt is made to tackle their difficulties and extract their significance and beauty; in each case, analysis and criticism are illustrated with plenty of quotations. We are, however,

not quite convinced by the interpretation the author suggests of that much-discussed line in *The Windhover*: 'My heart in hiding stirred for a bird'. But Gerard Hopkins was not a poet merely; the publication of his correspondence by Professor Abbott in 1935-38 showed him to have been a prose-writer of outstanding merit. In the many extracts he has provided from Hopkins's letters and in a couple of chapters on Hopkins's correspondents Dr. Iyengar well brings out the interest and importance of the poet's prose. He shows goods sense in dissenting from Herbert Read's rash verdict that Robert Bridges was not worthy of Hopkins's friendship. The weakest part of the book is the last chapter, which, despite a fine concluding remark, is markedly perfunctory in its treatment of Hopkins's criticisms and of his influence on contemporary English poets.

No study of Hopkins's work can be complete without a reference to his metrical and linguistic experiments. Much of the arresting quality of his poetry is due to its form alone; the content by itself, in abstraction from the form, not being without its analogues in earlier literature, would hardly suffice to give it half its importance in the history of modern English poetry. Dr. Iyengar devotes two chapters to this aspect of Hopkins's achievement; both are marked by the same competence as the rest of the work. He does not quite succeed, however, in convincing the reader, as he should have done, of the organic necessity of Hopkins's metrical innovations; and, unconsciously perhaps, he does grave wrong to Hopkins by remarking that 'Sprung Rhythm constitutes no more than the mechanics of his most characteristic poetry'. You almost suggest that a poem is false to itself when you say that its form is no more than its mechanics. There are other lapses. The phrase 'linkéd sweetness long drawn out', which the author applies to *Felix Randal*, is an unfortunate quotation to apply to Hopkins's poetry; it might suggest altogether wrong affiliations. Certain verses of Hopkins have been scanned by Dr. Iyengar, not always however with a happy effect. The way he divides the feet often interferes with natural breath-groups. That could hardly have been Hopkins's intention. A simple recognition of counterpointing, recognised and emphasised by Hopkins himself, would avoid all that; as it is, Dr. Iyengar is much too anxious to secure an invariably falling rhythm by making every foot begin with a stress. All that Hopkins did for the liberation of English verse-rhythms is practically undone if fetish is made of a particular rhythmic pattern so much that it cuts across natural breath-groups. Alliteration, one of the bases of Hopkins's rhythms, is described by Dr. Iyengar as one of the restraining elements in poetry, along with metre and rhyme. There is much to be said, no doubt, for a concept of poetry as a 'fine mitigated fury', but it is doubtful whether alliteration, such as Hopkins's, is exactly a mitigating element. There is a rhythmic spontaneity about Hopkins's alliterations which hardly suggests the kind of conscious attempt implied by Dr. Iyengar's remarks. Charles Williams was perhaps nearer the mark when he wrote in connexion with Hopkins's word-combinations: 'Each is thought and spoken all at once; and this is largely (as it seems) the cause and (as it is) the effect of their alliteration'. Dr. Iyengar occasionally censures Hopkins for some of his experiments, *e.g.*, his practice of starting a new line with the latter part of a broken word, the earlier part ending the previous line. Awkward at first *sight*, no doubt; but how it integrates verse with verse by drawing out the rhythmic movement of one line into the next! Nor is a rhyme like 'I am, and: diamond' such an 'aberration', perhaps, as Dr. Iyengar considers it to be; is there nothing to be said for its sheer unexpectedness, its dissonant assonance? At any rate, in the very fine poem where it occurs, it is far from being felt as an 'aberration':

'In a flash, at a trumpet crash,
I am all at once what Christ is, since he was what I am, and
This Jack, joke, poor potsherd, patch, matchwood, immortal diamond,
Is immortal diamond.'

The historical sanctions of Hopkins's prosody are far too important to pass over. There is the classical ancestry, for one thing (and Hopkins, by the way, was an excellent Greek scholar); equally, there is the native ancestry—the significant fact that Hopkins's stress-prosody was in a way a revival, after centuries, of the traditions of *Beowulf* and *Piers Plowman*. Dr. Iyengar, unfortunately, shows nothing like sureness in dealing with the subject. For the former, he contents himself with a vague reference to 'Latin and Greek lyrics'; for the latter, he relies in the main on a quotation from Herbert Read. Incidentally, Hopkins's indebtedness to Old English poetry does not seem to have been limited to stress-prosody and alliteration. Other features of Old English poetry—abundance of compound words, parallelisms, accumulation of epithets—repeat themselves in Hopkins's verse (compare, for the last two items, the first stanza of *The Wreck of the Deutschland* or the opening verse of *The Leaden Echo and the Golden Echo* or the last but one line of the extract quoted above, to name only a few examples; compound words are too familiar a feature of Hopkins's poetry to need illustration). Dr. Iyengar's treatment of Hopkins's diction is more satisfactory; and as a sample of his many good remarks about Hopkins, to which reference has been made above, the following may be quoted: 'Many of Hopkins's extraordinary combinations of words are flashes into the realm of meaning, iridescent thoughts, illuminations; music and meaning are jerked at us at once like thunder and lightning, and the tension of agreement in disagreement makes them assault us with a disturbing potency'.

Dr. Iyengar writes well, and one must have a good word for the phrasing of many of his critical judgments. We have, however, come across a few puzzling statements (apart from misprints and instances of carelessness), *e.g.*, the one on p. 102: 'his letters, his note-books, not to mention his poems, tantalize us by their capacity to reveal every contour of their author's personality' (if they can reveal *every* contour, how can they tantalize?). Or, take this statement on p. 168: 'the whole theme is galvanized into a stream of sound that keeps one's faculties fully engaged', or this other on p. 142: 'the heart-rending S. O. S. for the spiritual rain that should stir the Waste Land into fresh and fulsome (*sic*) life'. There would be no objection to sprung metaphors, any more than to Hopkins's sprung rhythms, provided that, in springing on each other, they did not break each other's back.

Dr. Iyengar's book would be better with an Index and fewer quotations from other critics. There is a useful select bibliography, which however omits one or two recent items like the works of W. H. Gardner and Dr. W. A. M. Peters. The Rev. Jerome D'Souza, S.J., Principal, Loyola College, Madras, and an old teacher of Dr. Iyengar's, contributes a well-written Foreword, a little too insistent, however, on the fact that Hopkins was a Jesuit priest.

The book is well printed on bad paper. The price is excessive for a demy-octavo monograph of xvi + 194 pages

T. N. S.

TEACHING—*A Quarterly Technical Journal for Teachers,* Vol. xx, No. 4, June, 1948, Oxford University Press.

Teaching, a quarterly journal for teachers, contains in its issue for June, 1948, a number of thoughtful articles on a most controversial subject, viz., the place

of English in free India's educational system. Sir Hari Singh Gour maintains that English must be India's *lingua franca*. At one time, he says, Hindusthani was suggested as such a language, but it was soon found that it was no language at all, but a blend of Hindi and Urdu. The Osmania University of Hyderabad imparted instruction in Urdu and set up a Translation Committee which had to coin 64,000 new words from Persian and Arabic. Hindi, he adds, is, in vocabulary, an even poorer language than Urdu and he draws the swift conclusion that neither Hindi, nor Urdu, nor indeed the "richer" languages of Tamil, Telegu, Bengali, Marathi or Oriya will "ever" be able to compete with the English language which has taken "deep root" in India.

Dr. W. M. Ryburn of Christian High School, Kharar, is equally emphatic in his opinion that English cannot be the *lingua franca*. . . . English will no longer be compulsory in schools . . . it will be in the same position as that occupied by French or German in English Schools.

Commonsense would, no doubt, support Dr. Ryburn's opinion, but the question bristles with peculiar difficulties in the case of India. As the Editor wisely remarks, all are agreed that the mother-tongue must be restored to its rightful place, ... but will this mean regional language universities? How will regional isolationism fit in with the declared policy of the Government for the unity of India? Is not language one of the strongest bonds that can unite a population so heterogenous as this country possesses?

Dr. S. C. Sen Gupta of our College says that English must, no doubt, surrender its primacy, but it must stay as a compulsory minor subject. If, in the future, any of our regional languages makes adequate progress, it will automatically be the most widely used language in India, as French was in Europe until recently.

We are in substantial agreement with Dr. Sen Gupta's opinion and many of our readers must have noticed that Pandit Nehru too, in a recent address, said that the national language must grow, it cannot be imposed by legislation. Our only objection is to the word "if". We do not like to exclaim,

> "O Time, thou must entangle this, not I,
> It is too hard a knot for me to untie."

It is clear, however, that English must continue to play an important role in our universities for a decade or more, and, that in the meanwhile, we must choose one Indian language as the medium of university instruction and *plan for* and perfect that language.

DILIPKUMAR SEN.

THE GREAT SENTINEL—A STUDY OF RABINDRANATH TAGORE. By Dr. S. C. Sen Gupta. A. Mukherjee & Co., Calcutta, 1948. Price Rs. 6. Pp. 243.

In the space of 238 pages Dr. Sen Gupta has given us a study of Rabindranath Tagore, not so much for the Bengali reader as for the non-Bengali, though the Bengali reader is not altogether left out. Of the twelve chapters which form the book, the first two dwell on the salient points of the events in the poet's life, two on his philosophy of life and its expression through analogies and apologues drawn from nature and from Indian myths and legends and ancient tales, three on his poems, two on his dramas, two on fiction, and then the author concludes.

The author has been a well-known writer both in English and Bengali, and both on English and Bengali literary men, and he has been noted for discrimination

and lucidity of his style and expression—a reputation which he sustains Even for him it has been no ordinary task to write on Rabindranath and to present him within the compass of a volume like this But the author's treatment and his manner of writing carries the reader to the journey's end, and without a jolt, whatever may be the reader s disagreements in matters of opinion The songs of love and of life in particular have been treated with a remarkable clarity of expression

A few of the disagreements may be stated here Was Sati's giving up of her life on hearing her husband, the Lord Shiva, abused by her father an act of 'suicide'? (Page 64) Literally so, it may be, but the association is entirely different Again, too much attention, one feels, is given to criticisms by Professors Rollo and Thompson, evidently to disabuse the non-Bengali readers of Tagore's works of the impressions they may have formed from their study under the guidance of these critics The author's difficulty (on p 211) in finding a suitable explanation for too much pre-occupation with marriage rituals in *Gorā,* is easily removable—the form of marriage and the particular ceremony to be observed in that connection had its importance in *Gorā,* because it amounted to a problem for the community in those days, and there Rabindranath responded to his environment

The limitation of range, set forth in the preface, bars out all discourse on Rabindranath s prose style, except prose satire (on p. 203), and his essays, and his *Chokher-Bāli* and *Shesher Kavitā* have not been included for treatment, presumably for want of their English translations But even selective criticism may not afford to go in for such important omissions—even for the non-Bengali reader Rabindranath's essays are too much a portion of his literary work to be so left out One misses even a casual reference to them If his songs were a contribution to the Swadeshi Movement in the first decade of this century, so were his essays, and one misses all reference to them One misses also on or about p 25 Mahatma Gandhi's standpoint *vis-a-vis* Rabindranath's, specially when the author has taken his title (cue?) from Gandhiji's caption of his rejoinder to Rabindranath's protest, "The Great Sentinel". If Rabindranath's objection in those days to Gandhian standpoint deserved a mention in some detail, Gandhiji's reply, stated in the context, would have made the content fuller. Objection has been made as to why a casual controversy should stamp itself on the personality of the poet One would like to add (p 39) that the Convocation address to the University of Calcutta in 1937—by the first non-official—was also the first to be delivered in Bengali, in consonance with his character, and that his momentous speech on his last birth day, declaring his disillusionment about the character of Englishmen in his own time, was too important an item of his life to be left out (p 40).

The printing and general get-up have been quite good, but apart from 'Druba' and 'Kemankari', the continued use of 'Satish' for 'Sachish' becomes a source of irritation.

Dr. Sen Gupta's assessment of the poet as "one of the greatest poets of all times and one of the most significant figures in the modern world" is sure of universal acceptance, he is more specific when he says "While science was proceeding to the splitting of the atom, he held forth the ideal of wholeness and completeness and preached the truth and value of undivided human personality, of the unity of Man, Nature and God To men of all countries and for men of all ages, he has sung, as no other poet has done, of the joy of life and of the wonder and beauty of the world, of humanity in God and of divinity in man

PRIYARANJAN SEN

Miscellaneous

OUR CONTRIBUTORS

Dr. Srikumar Banerjee, alumnus, 1910-12 (*English*)

Sri Saibalkumar Gupta, alumnus, 1918-23 (*English*)

Mrs. Lila Majumdar (*English*)

Sri Dilipkumar Ray, alumnus, 1913-18 (*Bengali*)

Sir Jadunath Sarkar, alumnus, 1889-92 (*English*)

Sri Priyaranjan Sen, alumnus, 1917-19 (*Bengali and English*).

We thank them warmly for their kind co-operation in our endeavour.

ACKNOWLEDGMENT

Mr. R. C. Ghosh, Bar-at-Law has offered 3½ p. c. Government Securities of the face value of Rs. 1,500 for the creation of a trust fund in memory of his father, the late Sir Charu Chandra Ghosh, a distinguished alumnus of the College, for the annual award of a book prize of Rs. 50 to the best English Honours student of the Presidency College. The offer has been thankfully accepted.

We extend our thanks to Sri Prahlad Chandra Pramanik of The Orient Book Company for his permission to use the blocks appearing on the frontispiece of this issue.

OUR CONTEMPORARIES

We acknowledge with thanks the receipt of the following periodicals since January, 1948:—

1. Journal of the College of Engineering and Technology, Jadavpur.
2. St. Xavier's College Magazine, Calcutta.
4. Indraprastha College Magazine, Delhi.
4. Serampore College Students' Chronicle.
5. The Kidderpore Academy Patrika.

ROLL OF HONOUR

DASGUPTA, SARADINDU: Flight-Lieutenant, R. I. A. F.—Killed in action in Kashmir, 22 March, 1948. (Alumnus, Presidency College, 1936-1938).

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15 Pramatha Nath Banerjee, B. A.
1915-16 Mohit Kumar Sen Gupta, B. A.
1916-17 Mohit Kumar Sen Gupta, B. A.
1917-18 Saroj Kumar Das, B. A.
1918-19 Amiya Kumar Sen, B. A.
1919-20 Mahmood Hassan, B. A.
1920-21 Phiroze E. Dustoor, B. A.
1921-22 Syama Prasad Mookerjee, B. A.
1921-22 Brajakanta Guha, B. A.
1922-23 Uma Prasad Mookerjee
1923-24 Subodh Chandra Sen Gupta
1924-25 Subodh Chandra Sen Gupta, B. A.
1925-26 Asit Krishna Mukherjee, B. A.
1926-27 Humayun Z. A. Kabir, B. A.
1927-28 Hirendra Nath Mukherjee, B. A.
1928-29 Sunit Kumar Indra, B. A.
1929-30 Taraknath Sen, B. A.
1930-31 Bhabatosh Datta, B. A.
1931-32 Ajit Nath Roy, B. A.
1932-33 Sachindra Kumar Majumdar, B. A.
1933-34 Nikhilnath Chakravarty, B. A.
1934-35 Ardhendu Baksi, B. A.
1935-36 Kalidas Lahiri, B. A.
1936-37 Asok Mitra, B. A.
1937-38 Bimal Chandra Sinha, B. A.
1938-39 Pratap Chandra Sen, B. A.
1938-39 Nirmal Chandra Sen Gupta, B.A.
1939-40 A. Q. M. Mahiuddin, B. A.
1940-41 Nanilal Banerjee, B. A.
1941-42 Arun Banerjee, B. A.
1942-47 No Publication due to Government Circular Regarding Paper Economy
1946-47 Sudhindranath Gupta, B. A.
1947-48 Subir Kumar Sen, B. A.

Printed by P. C. Chatterjee at the Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta.
Edited and published by Subir Kumar Sen, Presidency College, Calcutta.